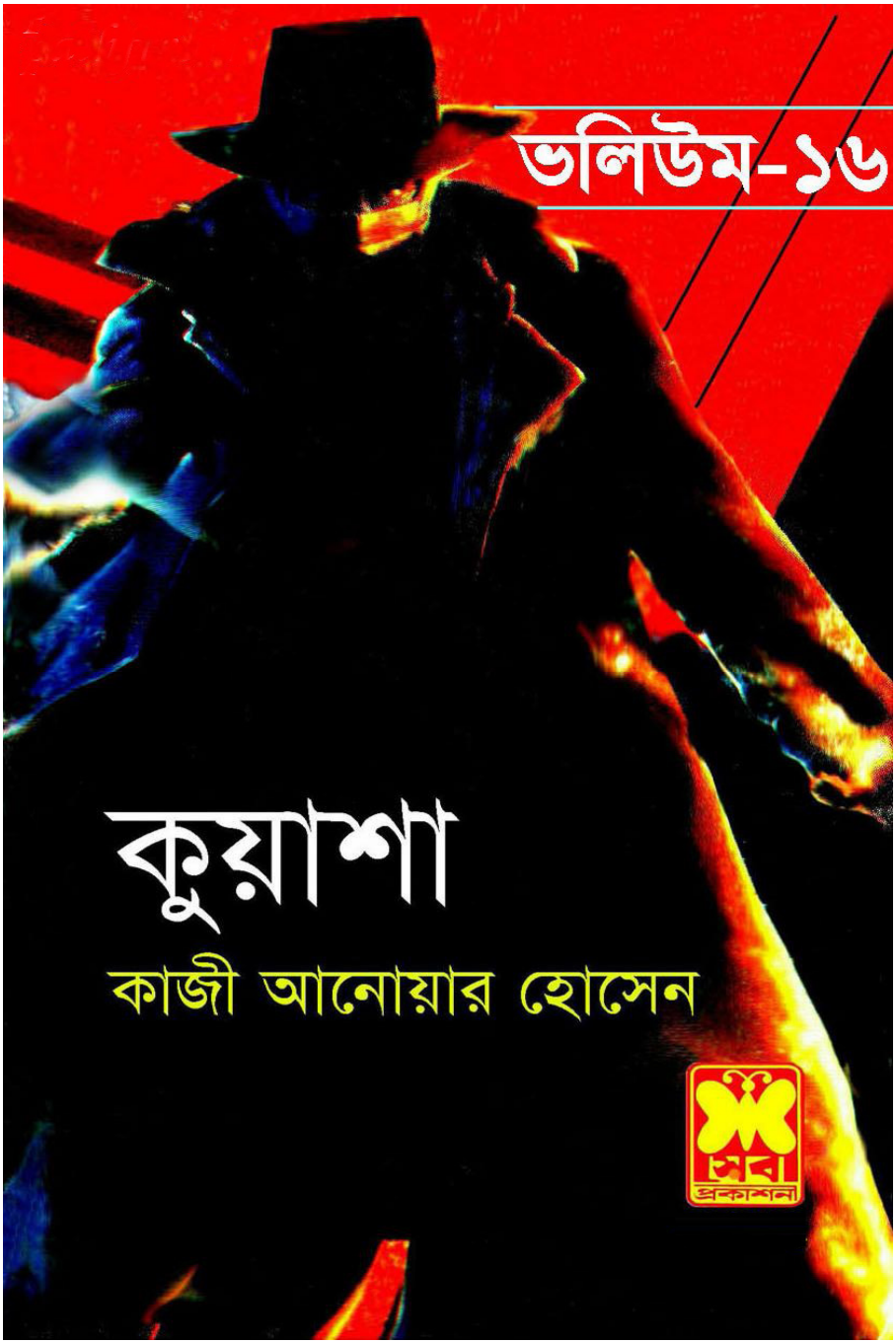
ভলিউম-১৬
কুয়াশা
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা
প্রকাশনী

ISBN 984-16-1106-6

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ : আগস্ট, ১৯৯৪

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : আলীম আজিজ

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন : ৮৩৪১৮৪
জি. পি. ও বক্স নং : ৮৫০

পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Volume- 16
KUASHA SERIES 46, 47, 48
By: Qazi Anwar Husain

আটাশ টাকা

কুয়াশা ৪৬ ৫—৫৫
কুয়াশা ৪৭ ৫৬—১০০
কুয়াশা ৪৮ ১০১—১৪৪

সেবা'র

আরও ক'টি সিরিজ

মাসুদ রানা

ওয়েস্টার্ন

সেবা রোমান্টিক

তিন গোয়েন্দা

রোমহর্ষক

গোয়েন্দা রাজু

কিশোর ক্লাসিক

কুয়াশা ৪৬

প্রথম প্রকাশ ঃ অক্টোবর, ১৯৭৫

এক

ঢাকা।

প্রফেসর ওয়াইয়ের কন্ট্রোল রুম। খেপে গেছে প্রফেসর ওয়াই। এইমাত্র সে একে একে শহীদ, মহুয়া, মি. সিম্পসন এবং কামাল ও ডি. কস্টাকে তার ম্যাটার ট্র্যান্সমিট করার যুগান্তকারী মেশিনের মাধ্যমে পাঠিয়ে দিয়েছে সারা দুনিয়ার বিভিন্ন দুর্গম জায়গায়।

শহীদ এবং মহুয়াকে পাঠানো হয়েছে ভারত মহাসাগরের ছোট্ট একটা দ্বীপে। যে দ্বীপে এর আগে কোনদিন কোন মানুষ পৌঁছোয়নি। যে দ্বীপে কোনদিন কোন জাহাজ ভেড়েনি, ভিড়বেও না। ওদের সাথে প্রফেসর ওয়াই দু'প্যাকেট শুকনো খাবার দিয়েছে। যাতে ওরা কয়েকদিন অন্তত খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে। এটা একধরনের নির্মম রসিকতা প্রফেসর ওয়াইয়ের। সে জানে শহীদ এবং মহুয়া শত চেষ্টা করলেও সেই জনমানবহীন দ্বীপ থেকে মুক্তি পাবে না কোনদিন। মি. সিম্পসনকে গরম পোশাকে সাজিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে সে গ্রীনল্যাণ্ডে। গ্রীনল্যাণ্ড, যেখানে বরফ ছাড়া চোখে পড়ে না কিছুই। শূন্য ডিগ্রীর নিচেই থাকে সদা সর্বদা সেখানে টেম্পারেচারের কাঁটা। আর কামাল এবং ডি. কস্টাকে পাঠিয়েছে সে হিমালয়ে, সর্বোচ্চ শৃঙ্গ এভারেস্টের একেবারে মাথায়। ওদেরকে অক্সিজেন সিলিণ্ডারে সজ্জিত করে পাঠালেও মাত্র আধঘণ্টা পর ফুরিয়ে যাবে ওদের অক্সিজেন। মরে যাবে ওরা দম বন্ধ হয়ে!

এবারে কুয়াশার পালা। করার কিছু নেই কুয়াশার। প্রফেসর ওয়াইকে সে আর সকলের চেয়ে ভাল করে চেনে। শহীদ, মি. সিম্পসন, ডি. কস্টা এবং মহুয়াকে সে ধরে এনেছে এখানে এখবর পাবার পরপরই স্ব-আবিষ্কৃত খুদে মারণাস্ত্রগুলো সাথে নিয়ে সোজা চলে এসেছে সে প্রফেসর ওয়াইয়ের কন্ট্রোল রুমে। শহীদদেরকে বাঁচাবার তাগিদেই কাজটা করে সে। কিন্তু কাজটা যে ভুল হয়েছে তা সে বুঝেছে অনেক পরে। লেজার গান, আলট্রাসনিক যন্ত্র, স্মোক বম বা অন্য কোন মারণাস্ত্র ব্যবহার করে প্রফেসর ওয়াইকে ঘায়েল করা সম্ভব নয় একথা কুয়াশার চেয়ে ভালভাবে আর কেউ জানে না। লেজার গান মারাত্মক একটা অস্ত্র। কিন্তু লেজার গান দিয়েও ঘায়েল করা মুশকিল অতিমানব প্রফেসর ওয়াইকে।

এটা প্রফেসর ওয়াইয়ের নিজস্ব কন্ট্রোল রুম। এখানে প্রফেসর ওয়াই রাজা। এই কন্ট্রোল রুমে কেউ ওর কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

অকারণে বাধা দিয়ে লাভ নেই। তাতে নিজের মৃত্যু ডেকে আনাই সার হবে। প্রফেসর পাগল হয়ে গেছে। তার পক্ষে সবই সম্ভব। ম্যাটার ট্র্যান্সমিট করার যন্ত্রের দিকে পা বাড়াল কুয়াশা। ঘড়ি দেখল। প্রফেসর তাকে মহাশূন্যে পাঠাবে ঘোষণা করেছে।

কেবিনে ঢুকে দাঁড়াল কুয়াশা। অকস্মাৎ নীল অত্যুজ্জ্বল আলোয় ধাঁধিয়ে গেল চোখ।

তারপর আর কিছু মনে নেই কুয়াশার।

ফুড়ুৎ-ফুড়ুৎ! চড়ুই পাখিরা এক ডাল থেকে আরেক ডালে গিয়ে বসছে। ট্রিক-ট্রিক, কুহু-কুহু, কঁ-কঁ—অনেক রকম পাখির ডাক কানে আসছে কুয়াশার। কলকল পাহাড়ী নদীর ধেয়ে আসার শব্দ আসছে কাছে পিঠে কোথাও থেকে। নিজের দিকে তাকাল কুয়াশা।

মখমলের মত মসৃণ কালো আলখাল্লায় ঢাকা তার ঋজু বিশাল শরীর। আলখাল্লার গোপন পকেটগুলোয় হাত চলে গেল। আছে, যা যা ছিল সবই আছে।

চারদিকে গভীর অরণ্য। এ কোথায় দাঁড়িয়ে আছে সে? প্রফেসর ওয়াইয়ের ম্যাটার ট্র্যান্সমিট করার কেবিনে প্রবেশ করার পর ডিজইন্টিগ্রেটেড অবস্থায় কতক্ষণ ছিল সে? কয়েক মিনিট, না কয়েক হাজার বছর?

বাঁ হাতটা চোখের সামনে তুলল কুয়াশা। রিস্টওয়াচের কাঁটায় চোখ রাখল।

রবিবার। হ্যাঁ, রবিবারেই প্রফেসর ওয়াইয়ের কন্ট্রোল রুমে ঢুকেছিল সে। তিন তারিখ—ঠিকই আছে। মাসটাও আগস্ট। রিস্টওয়াচের কাঁটা দেখে হিসেব করল কুয়াশা, ষোলো মিনিট পঞ্চান্ন সেকেণ্ড কেটে গেছে প্রফেসর ওয়াইয়ের কেবিনে ঢোকার পর।

পনেরো সেকেণ্ড হয় এই অপরিচিত জায়গায় এসে পৌঁছেছে সে। মাত্র পনেরো সেকেণ্ড হয়েছে ডিজইন্টিগ্রেটেড অবস্থা থেকে অর্থাৎ গোটা দেহটা বিচ্ছিন্ন হয়ে শত-সহস্র-লক্ষ কোটি অণুতে পরিণত হবার পর আবার এই জায়গায় অণুগুলো একত্রিত হয়েছে এবং তার ফলে তার দেহ পূর্বের আকার আকৃতি ফিরে পেয়েছে।

তার মানে মধ্যবর্তী ষোলো মিনিট চল্লিশ সেকেণ্ডের হিসেব পাওয়া যাচ্ছে না। ষোলো মিনিট চল্লিশ সেকেণ্ডে কতটা দূরত্ব অতিক্রম করা সম্ভব?

ম্যাটারকে অণুতে পরিণত করে আলোর গতিতে যে-কোন দূরত্বে নিক্ষেপ করতে পারে প্রফেসর ওয়াইয়ের ম্যাটার ট্র্যান্সমিশন যন্ত্র।

ষোলো মিনিট চল্লিশ সেকেণ্ডে আঠারো কোটি ষাট লক্ষ মাইল দূরত্ব অতিক্রম করেছে সে আলোর গতিতে। দ্রুত হিসেব করে ফেলল কুয়াশা। পরমুহূর্তে তার মনে পড়ল—পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব নয় কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল।

ভুরু কুঁচকে উঠল কুয়াশার। পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব যা তার দ্বিগুণ দূরত্ব অতিক্রম করেছে সে।

চঞ্চল দৃষ্টিতে চারদিকে আবার তাকাল কুয়াশা। এ কোথায় তাকে পাঠিয়েছে পাগলটা? পরিচিত সব পাখিদেরকে দেখা যাচ্ছে, আম, জাম, বট—পরিচিত সব গাছ আশেপাশে। তবে কি ধাপ্পা মেরেছিল প্রফেসর ওয়াই? অহেতুক ভয় দেখিয়েছিল?

প্রফেসর ওয়াই বলেছিল, 'আপনাকে আমি ডক্টর কূটজের মহাশূন্যযানে পাঠাব। কূটজের মহাশূন্যযানে আমার রিসিভিং সেট আছে লুকানো। তার মহাশূন্যযানটা কোন গ্রহে আছড়ে পড়ে ধ্বংস হয়ে গেছে, যতদূর জানি। আপনি মহাশূন্যের সেই গ্রহে গিয়ে উপস্থিত হবেন। আর কোনদিন ফিরতে পারবেন না এই পৃথিবীতে।'

এটা কি তবে পৃথিবী নয়?

অসম্ভব, এটা পৃথিবী না হয়ে যায় না। কিন্তু হিসেব মিলছে না তাতেও। তবে কি প্রফেসর ওয়াই তাকে অণুতে পরিণত করে পৃথিবীর চারদিকে কয়েক বার চক্কর খাইয়ে আবার পৃথিবীরই কোথাও নামিয়ে এনেছে? নাকি সোজা গিয়ে সূর্যের সাথে ধাক্কা খেয়ে অজ্ঞাত কারণে ফিরে এসেছে সে পৃথিবীতেই?

কিন্তু আর একটা সম্ভাবনার কথাও উঁকি দিল কুয়াশার মনে।

টুইন আর্থ!

টুইন আর্থের গল্প পৃথিবীতে বহুকাল আগে থেকেই প্রচলিত। এর স্বপক্ষে মজবুত কোন প্রমাণ নেই। কিন্তু এর বিরুদ্ধেও আজ অবধি কেউ কোন প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি।

টুইন আর্থ সম্পর্কে ব্যাখ্যাটা এই রকম ঃ পৃথিবী থেকে সূর্য যত দূরে, সূর্যের অপর দিকে সূর্য থেকে ঠিক তত দূরে আমাদের পৃথিবীর মতই সমগতিসম্পন্ন কোন গ্রহ থাকা খুবই সম্ভব। যদি থাকে তাহলে সেই গ্রহকে কোনদিনই আমরা দেখতে পাব না। কারণ পৃথিবী যে গতিতে সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরছে, সেই গ্রহটিও একই গতিতে সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরছে। অর্থাৎ পৃথিবী আর সেই গ্রহের মাঝখানে প্রকাণ্ড একটা পাঁচিলের মত সব সময়ই রয়েছে সূর্য। ফলে সেই গ্রহের বাসিন্দা পৃথিবীকে, পৃথিবীর বাসিন্দা সেই গ্রহকে কোনদিন দেখতে পাচ্ছে না। টুইন আর্থ যদি থাকে তাহলে তাতে প্রাণী আছে এটাও ধরে নেয়া যায়। কারণ টুইন আর্থ যেহেতু সূর্যের কাছ থেকে পৃথিবীর সমান দূরত্বে অবস্থিত এবং তার আকার আকৃতিও পৃথিবীর মত, সেহেতু তার আবহাওয়াও পুরোপুরি পৃথিবীর মতই হবার কথা।

চঞ্চল হয়ে উঠল হঠাৎ কুয়াশা। তীক্ষ্ণ চোখে এদিক ওদিক তাকাল সে। প্রফেসর ওয়াইয়ের রিসিভিং সেট কোথায়? তার কথা মত, ডক্টর কূটজের স্পেসক্রাফটে ছিল রিসিভিং সেটটা। কোথায় সেই স্পেসক্রাফট্?

খানিক খোঁজাখুঁজির পরই একটা ঝোপের ভিতর পাওয়া গেল রিসিভিং সেট। কিন্তু আবার একটা প্রশ্ন দেখা দিল কুয়াশার মনে। এই রিসিভিং সেট যে ডক্টর কূটজের মহাশূন্যযানে ছিল তার প্রমাণ কি?

কুয়াশা লক্ষ করল আশপাশে গাছপালা এবং ঝোপঝাড়ের পাতা আর শাখা-প্রশাখা শুকনো, কেউ যেন আগুন দিয়ে ঝলসে দিয়ে গেছে। পা বাড়াল কুয়াশা। খানিক দূরে যেতেই চোখে পড়ল আগুনে পুড়ে কয়লা হয়ে গেছে চারদিকের গাছগুলো।

আরও পঁচিশ ত্রিশ গজ এগোবার পর থমকে দাঁড়াল কুয়াশা। আর এগোবার দরকার নেই। পুড়ে কালো হয়ে গেছে চারদিকের বনভূমি। মাঝখানে দুমড়েমুচড়ে

পড়ে রয়েছে একটা ধাতব পদার্থের লম্বা রকেট।

ডক্টর কূটজের স্পেসক্রাফট ধ্বংস হয়ে গেছে তাহলে। সবচেয়ে আগে যে প্রশ্নটা দেখা দিল কুয়াশার মনে—এটা যদি অন্য কোন গ্রহ বা টুইন আর্থ হয়, তাহলে পৃথিবীতে ফিরবে সে কিভাবে?

চেষ্টা করে মৃদু হাসল কুয়াশা। হয়তো অকারণেই সে দুশ্চিন্তা করছে। হয়তো ডক্টর কূটজের স্পেসক্রাফট পৃথিবীরই কোন জায়গায় ধ্বংস হয়ে গেছে। প্রফেসর ওয়াই এ সম্পর্কে হয়তো খবর রাখেনি। এটা হয়তো পৃথিবীরই কোন জায়গা।

ঘুরে দাঁড়াল কুয়াশা। বেরুতে হবে এই জঙ্গল থেকে। প্রমাণ চাই, এটা পৃথিবী কিনা।

চারদিকে গভীর বনভূমি। কোথাও কেউ নেই, কিছু নেই। কান পাতল কুয়াশা। পাখিদের কলরব আর খরস্রোতা নদীর কুলকুল শব্দ ছাড়া শুনতে পাওয়া যাচ্ছে না কিছু।

লম্বা পা ফেলে বনভূমির ভিতর দিয়ে হাঁটতে শুরু করল কুয়াশা। চঞ্চল দৃষ্টিতে গাছপালাগুলো দেখে নিচ্ছে সে। পাতার ফাঁক দিয়ে গলে পড়ছে সূর্য কিরণ, টুকরো হয়ে ছড়িয়ে রয়েছে ঘাসের উপরে।

ফাঁকা জায়গায় পৌছল কুয়াশা মিনিট সাতেক পর। ছোট একটা উপত্যকার উপর রয়েছে সে। ঢালু হয়ে নেমে গেছে মাটি সমতলভূমির দিকে। দূরে দেখা যাচ্ছে ছোট একটা গ্রাম। বেড়ার ছোট ছোট ঘর বাড়ি। আরও দূরে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে সুদীর্ঘ পাঁচিলের মত পাহাড়শ্রেণী। পাহাড়ের উপর মেঘ দেখা যাচ্ছে। মেঘের উপর সূর্য।

স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলল কুয়াশা। মুচকি একটু হাসল আপন মনে। প্রফেসর ওয়াই মিছে ভয় দেখিয়েছিল। পৃথিবীরই কোন জায়গা এটা। মহাশূন্যের কোন অপরিচিত গ্রহ নয়।

আবার হাসল কুয়াশা প্রফেসর ওয়াইয়ের কথা মনে পড়তে। কিন্তু প্রশ্ন হলো—পৃথিবীর এই জায়গাটার নাম কি? এটা কি আফ্রিকা? না, ইউরোপ? এশিয়া হলেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

উপত্যকা থেকে সমতলভূমির দিকে নামতে শুরু করল কুয়াশা। দূরের ওই গ্রামটায় পৌছুলেই সব রহস্যের সমাধান হয়ে যাবে।

উপত্যকা জুড়ে গাছপালা। নামার সময় হরিণ এবং খরগোশ দেখল কুয়াশা। মাইল দুয়েক অতিক্রম করার পর গ্রামে ঢুকল সে। দূর থেকেই একটা ব্যাপার লক্ষ করে অবাক হয়েছিল কুয়াশা। গ্রাম যখন, লোকজন না থেকেই পারে না। কিন্তু কাউকে দেখতে পাচ্ছিল না সে। গ্রামের ভিতর ঢুকে রীতিমত বিস্ময় বোধ করল। গা ঘেঁষাঘেঁষি করে এবং ছাড়াছাড়িভাবে বেশ অনেকগুলো বেড়ার ঘর দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু পথে বা বাড়িতে উঠানে কিংবা ঘরগুলোর সামনে প্রাণের সামান্যতম চিহ্ন পর্যন্ত নেই।

এ কেমন ব্যাপার?

একটা তিনচালার দিকে এগোল কুয়াশা। বিদ্যুৎবেগে বেরিয়ে এল ঘরের ভিতর

থেকে একটা শিয়াল। কুয়াশাকে ঘাড় ফিরিয়ে একবার দেখল কি দেখল না। তীর বেগে অদৃশ্য হয়ে গেল বাড়ির পিছন দিকের বাগানে।

একমুহূর্ত থমকে দাঁড়িয়ে আবার পা বাড়াল কুয়াশা। একটু চিন্তিত মনে হচ্ছে তাকে। শিয়ালের মুখে একটা মানুষের প্রায়-মাংসহীন হাত ছিল, লক্ষ করতে ভুল করেনি সে। হাতটা পচে গলে গেছে, তাও দেখে নিয়েছে সে এক পলকের ভিতর।

লম্বা লম্বা পা ফেলে ঘরের দরজা পেরিয়ে ভিতরে ঢুকল কুয়াশা। তীব্র দুর্গন্ধে কুঁচকে উঠল নাক। রুমাল বের করে নাকে চেপে ধরল কুয়াশা।

অস্তগামী সূর্যের শেষ কিরণ ঘরের ভিতর প্রবেশ করেছে। ঘরটা বেড়ার হলেও ভিতরে দামী আসবাবপত্রের অভাব নেই। একদিকের প্রায় দশহাত দেয়াল জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা অদ্ভুত যন্ত্র। জিনিসটা দেখতে হুবহু টেলিভিশনের মত। পাশেই একটা ছোট্ট টেবিলের উপর ছোট একটা যন্ত্র। ওয়্যারলেস ওটা, অনুমান করল কুয়াশা। সোফা সেট, ফোমের বিছানা, রিফ্রিজারেটর—সবই আছে।

ঘরের মেঝেতে পড়ে রয়েছে তিনটে কঙ্কাল। দুটো কঙ্কাল শুকনো, খটখটে। অপর কঙ্কালটার হাড়ের সাথে এখনও পচা, গলা কিছু মাংস লেগে রয়েছে। একটা হাত নেই এই কঙ্কালটার।

তীক্ষ্ণ চোখে কঙ্কালগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল কুয়াশা। তার দৃষ্টিশক্তি অসাধারণ বলেই কয়েকটা বিদঘুটে ব্যাপার সেই মুহূর্তে নজর পড়ল তার। তিনটে কঙ্কালেরই হাতের আঙুল একটা করে বেশি। অর্থাৎ প্রতিটি হাতের আঙুল পাঁচটা নয় ছয়টা। শুধু তাই নয়, সন্দেহ হতে পাঁজরগুলোও গুণল সে। মানুষের পাঁজর মোট বিশটা থাকে। ডান পাশে দশটা বাঁ পাশে দশটা। কিন্তু কঙ্কাল তিনটেরই পাঁজরের সংখ্যা সাধারণ মানুষের তুলনায় দুটো করে বেশি। এগারো দু'গুণে বাইশটা করে পাঁজর প্রত্যেক কঙ্কালের।

ভুরু কুঁচকে বেরিয়ে এল কুয়াশা ঘরের বাইরে। সূর্য অস্ত যাচ্ছে। আলখাল্লার পকেট থেকে রঙিন কাঁচ লাগানো একটা চশমা বের করে জ্বলন্ত লাল সূর্যের দিকে তাকাল সে।

কয়েক মুহূর্ত পর চশমাটা চোখ থেকে নামিয়ে পকেটে রেখে দিল আবার। গ্রামের চারদিকে ঘুরল সে। কেউ নেই। অনেকগুলো ঘরে ঢুকল নাকে রুমাল চাপা দিয়ে। কোন কোন ঘরের ভিতর পাওয়া গেল আরও কঙ্কাল, কোন কোন ঘরে পাওয়া গেল না। কিন্তু সব বাড়িতেই প্রকাণ্ড টেলিভিশন এবং ওয়্যারলেস সেট দেখল কুয়াশা। হিসেব কষার যন্ত্র, শক্তিশালী বিনকিউলার, অত্যাধুনিক টেপ-রেকর্ডার, পানি বিশুদ্ধকরণ যন্ত্র, গোলাকার থার্মোফ্লাস্ক, যান্ত্রিক চেয়ার, রিভলভিং খাট, গ্যাস লাইন, ইলেকট্রিসিটি, ইন্টারকম ইত্যাদি হরেক রকম জিনিস প্রায় সব ঘরেই দেখল কুয়াশা। সবই পৃথিবীর তুলনায় আধুনিক।

খটখটে কঙ্কাল রাস্তার উপরও পড়ে থাকতে দেখল কুয়াশা। গ্রামটা ছোট হলেও রাস্তাগুলো পাকা। রাস্তার মোড়ে মোড়ে দুটো করে কল। কৌতূহল জাগল।

কল দুটোর মুখ খুলে দিতেই একটা দিয়ে সাদা ঘন তরল পদার্থ এবং অপরটি

দিয়ে পানি বেরিয়ে আসতে লাগল মোটা ধারায়। সাদা তরল পদার্থটা হলো দুধ। ঘরগুলোর দেয়াল এবং চাল বেড়া বলে মনে হলেও কুয়াশার চোখে ওগুলো অস্বাভাবিক উজ্জ্বল ঠেকল। পরীক্ষা করে নিশ্চিত হলো সে। বরমার বেড়া নয়, ওগুলো কৃত্রিম তন্তু দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। প্লাস্টিকের ছাদও দেখল কুয়াশা। মজবুত এবং হালকা। গ্রামের পশ্চিম দিকে চারতলা বাড়িও রয়েছে অনেক।

গ্রামের শেষ সীমায় পৌঁছে কুয়াশা গোলাকার কয়েকটা বড়সড় যন্ত্র দেখতে পেল। ধারে কাছে এখানেও কেউ নেই। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে যন্ত্রগুলো। ছোটখাট মটরগাড়ির মত আকার সেগুলোর, পুরোপুরি গোলাকার। কিন্তু চাকা দুটো করে চারটে নয়, ছয়টা করে বারোটা।

এরকম আকৃতির যানবাহন এর আগে দেখেনি কুয়াশা। জিনিসটার বহির্ভাগ ইস্পাতের তৈরি। খুবই মসৃণ। দরজাটা পেটের কাছে। একটা যন্ত্রের দরজা খুলে ভিতরে মাথা গলিয়ে দিল কুয়াশা।

স্পীডোমিটারের ডায়াল, ফুয়েল ইণ্ডিকেটর, গিয়ার, স্টিয়ারিং হুইল দেখে বুঝতে অসুবিধে হলো না, যন্ত্রটা আসলে এক ধরনের গাড়ি। কিন্তু সামনের দিকের রাস্তা দেখার জন্য উইণ্ডস্ক্রীন বা ওই জাতীয় কিছু নেই ভিতরে। তার বদলে আছে টিভির বড়সড় পর্দা। গাড়ির চারপাশের সবকিছুই দেখা যায় সেই স্ক্রীনে।

নতুন ধরনের এই যন্ত্রের ভিতর উঠে বসল এবার কুয়াশা। স্টিয়ারিং হুইলে হাত রাখল সে। ফাঁকা রাস্তা। সতর্ক অর্থাৎ টাইট হয়ে বসে স্টার্ট দিল কুয়াশা গাড়িতে। সূর্য তখন অস্ত যাচ্ছে।

মৃদু একটা গুঞ্জন ধ্বনি কানে এল।

গিয়ার দিতেই আঁতকে উঠল কুয়াশা। যাদুর মত ক্রিয়াকাণ্ড ঘটতে শুরু করল। এক ধাক্কায় বিশগজ এগিয়ে গেল গাড়িটা। প্রতি সেকেণ্ডে বাড়ছে স্পীড। স্পীডোমিটারের দিকে চোখ পড়তে কুয়াশা দেখল অপরিচিত ভাষায় লেখা অঙ্কের প্রথম ঘরটা মাত্র ছুঁয়েছে কাঁটা। ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইলের মত বেগে ছুটতে শুরু করেছে গাড়ি প্রাথমিক পর্যায়েই, অনুমান করল কুয়াশা। স্পীডোমিটারের প্রথম অঙ্কটা তাহলে পঞ্চাশ মাইলের সমর্থক, ধরে নেয়া যায়। গুণে দেখল কুয়াশা, এক ইঞ্চি পর পর আট ইঞ্চির মধ্যে আটটা সংখ্যা লেখা। তার মানে চারশো মাইল গতিবেগে চলতে পারে এই গাড়ি।

এটা পৃথিবী নয়, অন্য একটা গ্রহ, সে ব্যাপারে সব সন্দেহের অবসান ঘটছে ধীরে ধীরে। টুইন আর্থের ব্যাপারটা হয়তো দিবালোকের মতই সত্য। এই গ্রহের মানুষ পৃথিবীর মানুষের মতই দেখতে, প্রমাণ এসেছে ইতিমধ্যে তার হাতে। এবং যান্ত্রিক সভ্যতায় এরা পৃথিবীর চেয়ে অনেক অনেক বেশি উন্নত।

এই গাড়িটার কথাই ধরা যাক। তিনশো মাইল স্পীডে ছুটছে এখন। অথচ বিশেষ কোন শব্দ হচ্ছে না, ঝাঁকুনিও লাগছে না। জানালা নেই, দরজাও বন্ধ। এয়ারটাইট বলা চলে। তবে চাকার সাথে অতিরিক্ত যন্ত্র সংযুক্ত করা আছে, অক্সিজেন তৈরি হবার মেশিনটা চালু রাখার জন্য। শুধু তাই নয়, পানিতেও এটা চলতে পারে। তবে পানিতে এর স্পীড অর্ধেকের মত। সামনে ব্যারিকেড বা উঁচু

কোন বাধা থাকলে তা টপকে যাবার ক্ষমতাও এই গাড়ির আছে। অর্থাৎ উড়তেও পারে। কিন্তু মাত্র দশ হাত উপরে ওঠার ক্ষমতা এর। এদিকে উড়ন্ত অবস্থায় এর স্পীড দ্বিগুণ প্রায়। সবকিছু দেখেশুনে অবাক হয়ে গেল কুয়াশা।

এদের যান্ত্রিক সভ্যতা সত্যি বিস্ময়কর। টিভির স্ক্রীনগুলো রাস্তার মোড়ে মোড়ে ঝুলছে। ট্রাফিক কন্ট্রোল করার ব্যবস্থা অত্যাধুনিক। রাস্তা সম্পূর্ণ ফাঁকা এবং নির্জন হলেও মোড়ে মোড়ে ক্যামেরা সিগন্যাল রোড ম্যাপের লিউমিনাস প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ডায়াল দেখে কুয়াশা বুঝতে পারল সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে ট্রাফিক কন্ট্রোল করা হয় এখানে এবং এই সব রাস্তায় এক সময় সদাসর্বদা দ্রুতগতিসম্পন্ন যানবাহনের ভীড় লেগে থাকত।

যান্ত্রিক সভ্যতা ছাড়াও অন্যান্য বিভিন্ন দিকে এরা যথেষ্ট উন্নতি করেছে বোঝা যাচ্ছে। ছেড়ে আসা গ্রামে এমন অনেক জিনিস দেখেছে কুয়াশা যে-সব জিনিস পৃথিবীতে নেই বা থাকলেও তা এখানকার মত অত্যাধুনিক নয়।

গাড়ি চালাতে এতটুকু অসুবিধে হচ্ছে না কুয়াশার। একাধিক টেলিভিশনের পর্দায় ফুটে রয়েছে গাড়ির বাইরের চারদিকের দৃশ্য। দ্রুত, ঘণ্টায় তিনশো বিশ মাইল স্পীডে ছুটছে গাড়িটা। প্রশস্ত, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাস্তা। যানবাহন এবং জনমানবহীন, ফাঁকা।

কত কথা ভাবছে কুয়াশা। প্রফেসর ওয়াই, শহীদ, মহুয়া, ডি. কস্টা, কামাল এবং মি. সিম্পসন এখন কোথায়? এখনও কি বেঁচে আছে তারা? প্রফেসর ওয়াই···অস্বাভাবিক গম্ভীর হয়ে গেল কুয়াশা। প্রফেসরকে নিয়ে মহা ফ্যাসাদে পড়েছে সে। দৈত্যটাকে ধ্বংস করা যে সম্ভব নয় তা নয়। ইচ্ছে করলে সে পারে, পারে ধুলোর সাথে মিশিয়ে দিতে, টুকরো টুকরো করে বাতিল আবর্জনায় পরিণত করতে। কিন্তু প্রফেসরকে ধ্বংস করার কথা ভাবলেই অন্তরের অন্তস্তলে ব্যথা অনুভব করে সে। প্রফেসরের নীতি, আদর্শ এবং উদ্দেশ্য ক্ষতিকর, বিপজ্জনক। সমর্থন করা যায় না তাকে। কিন্তু সাধারণ আর দশটা মানুষের মস্তিষ্কের সাথে প্রফেসরের মস্তিষ্কের তুলনাই হয় না। যে-কোন সমস্যায়, যে-কোন কাজে, যে-কোন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বা সফল হবার মত মেধা এবং বুদ্ধি মজুদ আছে প্রফেসরের ব্রেনে। এমন যান্ত্রিক নির্ভুলতা, নিপুণতা এবং ক্ষমতা কোন মানুষের মধ্যে নেই। এত বড়, এমন অভূতপূর্ব এবং যুগান্তকারী একটা বিস্ময়কে ধ্বংস করা বড় কঠিন। সৃষ্টির সেরা মানুষ, সেই মানব সমাজের হাজার রকম উপকারে, হাজার রকম সমস্যার সমাধানে প্রফেসরের এই অদ্বিতীয় ব্রেনকে কাজে লাগাবার ইচ্ছা বহুদিন ধরে পোষণ করছে কুয়াশা। কিন্তু প্রফেসর বড় বেশি ক্ষমতা পেয়ে গেছে। যার ফলে কুয়াশার আদেশ, নির্দেশ পালন করতে সম্মত নয় সে।

কিন্তু কুয়াশা এখনও আশা রাখে, একদিন প্রফেসরকে পোষ মানাতে পারবে সে। একদিন প্রফেসরকে দিয়ে নিজের মনমতো কাজ করাতে সক্ষম হবে।

কিন্তু শহীদ এবং মহুয়াদেরকে প্রফেসর কি সত্যি মেরে ফেলেছে ইতিমধ্যে? ভারত মহাসাগরের ছোট্ট দ্বীপে পাঠানো হয়েছে শহীদ ও মহুয়াকে। কুয়াশা জানে,

প্রফেসরের একদল রোবট ভারত মহাসাগরের একটা দ্বীপে পরীক্ষামূলকভাবে শহর গড়ে তোলার কাজে ব্যস্ত। শহীদ ও মহুয়া কি সেই রোবটগুলোর খপ্পরে গিয়ে পড়েছে? তা যদি হয়···শিউরে উঠল কুয়াশা। প্রফেসর রোবটগুলোকে তৈরি করেছে সাধারণ মানুষের মুণ্ডু কেটে ফেলে তার জায়গায় যান্ত্রিক ব্রেনবিশিষ্ট মাথা বসিয়ে দিয়ে। রোবটে পরিণত করার উদ্দেশ্যেই কি ওদেরকে ভারত মহাসাগরের সেই দ্বীপে পাঠিয়েছে প্রফেসর?

মি. সিম্পসন, ড়ি. কস্টা, কামাল···কিন্তু এসব সমস্যা পৃথিবীর সমস্যা। আপাতত থাক। ইচ্ছা থাকলেও এখনই এসব সমস্যার সমাধান সম্ভব নয় তার পক্ষে। এখনকার সমস্যা, এখানকার সমস্যা···এই অপরিচিত গ্রহের মানুষ সম্পর্কে।

ফেলে আসা গ্রামটার ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠল কুয়াশার। বেশ বড়সড় একটা গ্রাম কিন্তু জীবিত নেই কেউ। দেখে মনে হয়, মহামারী লেগেছিল। সেই মহামারীতে শেষ হয়ে গেছে সবাই।

কিন্তু একটা ব্যাপার খুবই রহস্যময়। গ্রামের কোথাও পনেরো ষোলো বছরের কম বয়সের ছেলেমেয়ে একটাও চোখে পড়েনি তার। কোথায় তারা? মহামারীর ভয়ে ছেলেমেয়েদের কি অন্যত্র পাঠিয়ে দিয়েছিল গ্রামবাসীরা?

আর—ওই ঘা। যে লাশগুলোকে কুকুর শিয়ালরা এখনও খেয়ে শেষ করতে পারেনি সেগুলোর ত্বকে গোলাপী রঙের কুৎসিত একরকমের ঘা দেখছে সে, এ রোগের সাথে পরিচয় নেই তার। ছোট ছোট ঘামাচির মত ফুটে রয়েছে ঘা গুলো, ভিতরে পুঁজ, গোলাপী রঙের। খুব ঘন ঘন, গা ঘেঁষাঘেঁষি করে ফুসকুড়ির মত ফোটে, গোড়ার দিকের চামড়া কালচে রঙের। পিচ্ছিল হলুদ রসে ঘায়ের সবটুকু ভেজা ভেজা। এই কুৎসিত ঘা হয়তো মহামারী আকারে দেখা দেয়ায় সবাই মরে গেছে। ভাবল কুয়াশা।

রাস্তার দু'পাশে ধানীজমি। যান্ত্রিক পদ্ধতিতে চাষবাস করা হয়। খেতের একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত দেখা যায় না। তেপান্তরের মত ধু-ধু মাঠের কোথাও জনমানবের ছায়া পর্যন্ত নেই। কোথাও কোথাও দেখা যাচ্ছে দু'একটা কৃত্রিম তন্তুর তৈরি একচালা, বড় বড় ধান আর গম কাটার যন্ত্র, বীজ বপনের মেশিন, নলকূপ, পাওয়ার পাম্প। কিন্তু সবই স্থির, অচল। প্রাণের সাড়া নেই কোথাও।

সূর্য নেই তখন আকাশে। কুয়াশা টিভির পর্দায় চোখ রেখে দেখল সন্ধ্যার ম্লানিমা সামনের রাস্তার কোথাও পরিলক্ষিত হচ্ছে না। লাইটপোস্টগুলো শুভ্র আলোয় ভাসিয়ে দিচ্ছে চারদিক। আরও দূরে, চোখ ধাঁধানো আলোকসজ্জার আভাস দেখা যাচ্ছে।

প্রকাণ্ড একটা তোরণ দেখতে পাচ্ছে কুয়াশা। তোরণের মাথায় কি যেন লেখা রয়েছে। আরও কাছাকাছি পৌঁছুতে কুয়াশার দু'চোখে বিস্ময় ফুটে উঠল। তোরণের মাথায় অপরিচিত ভাষার পাশাপাশি স্থান লাভ করেছে বাংলা ভাষা। বড় বড় বাংলা অক্ষরে লেখা রয়েছে :

প্রাদেশিক রাজধানী ; বিরা টশহর এলা হীকাণ্ড।
স্বাগতম।

আলোকমালায় সজ্জিত আকাশচুম্বী তোরণটা। তবে আলোর খেলা এবং যাদু আসলে তোরণের ওপারে, শহরের ভিতর।

দূর থেকেই মুগ্ধ হলো কুয়াশা শহরের চেহারা দেখে। এত বড় শহর, নিশ্চয়ই মানুষ না থেকে পারে না, তাদের সাথে কথা বলার সৌভাগ্য হবে তার খানিক পরেই।

রোমাঞ্চ অনুভব করল কুয়াশা। এদিকে গর্বে ফুলে উঠেছে তার বুক। মাতৃভাষা স্থান পেয়েছে এই গ্রহের ভাষার পাশাপাশি। সত্যি, বড় আনন্দ লাগছে।

কিন্তু এরা বাংলাভাষা শিখল কিভাবে? ডক্টর কূটজে বাংলা জানতেন, তবে কি তিনিই শিখিয়েছেন এদেরকে?

এখানে তিনি বেঁচে আছেন নাকি?

আশায় ভরে উঠল কুয়াশার বুক। ডক্টর কূটজে বেঁচে থাকলে চিন্তার কিছু নেই। এখান থেকে পৃথিবীতে ফেরা তাহলে অসম্ভব হবে না। দু'জনে মিলে একটা মহাকাশযান তৈরি করে ফেলতে কতক্ষণ!

দুই

শহরের ভিতর ঢুকে গাড়ি দাঁড় করাল কুয়াশা। টিভির পর্দায় চোখ রেখে গাড়ির চারদিক দেখে নিল সে। রঙচঙে আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে যাবার মত অবস্থা। প্রশস্ত রাস্তার দুপাশে ফুটপাথ। ফুটপাথের সাথে বড় বড় দোকানপাট। অধিকাংশ দোকানপাট বন্ধ।

রাস্তার দুপাশে মাথা আকাশে ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে অসংখ্য স্কাইস্ক্রেপার। বিশ, পঁচিশ, চল্লিশ তলা উঁচু এক একটা বিল্ডিং। প্রতিটা বিল্ডিংয়ের গায়ে অসংখ্য নিওন সাইন, কোনটা লাল, কোনটা নীল, কোনটা সবুজ, কোনটা জ্বলছে আর নিভছে ঘনঘন, কোনটা পাক খাচ্ছে, ছুটছে এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে। নিওন সাইনগুলো এক একটা এক এক কোম্পানীর বিজ্ঞাপন, বুঝতে পারল কুয়াশা।

দোকানপাটগুলো গ্রাউণ্ড ফ্লোরে। কিন্তু খরিদ্দার নেই একজনও। সবচেয়ে অবাক কাণ্ড, দোকানের ভিতর সেলস্‌ম্যানও নেই। নির্জন পড়ে আছে সুসজ্জিত হাজার রকম জিনিসপত্রে ঠাসা দোকানগুলো।

আজ রবিবার, এই গ্রহের মানুষও কি রবিবার দিনটা ছুটির দিন হিসেবে পালন করে? বোঝা যাচ্ছে বাণিজ্যিক এলাকা এটা। কোম্পানীগুলোর অফিস সব বন্ধ। কিন্তু যে শো-রুমগুলো খোলা রয়েছে সেগুলোতে লোক নেই কেন?

লোক হয়তো দরকার হয় না, কুয়াশা ভাবল। যার যা দরকার নিয়ে যাবার সময় মূল্য দিয়ে চলে যায়। এই গ্রহের মানুষরা হয়তো পরস্পরকে ঠকাতে জানে না, তারা হয়তো অসৎ হতে জানে না।

আবার গাড়ি ছাড়ল কুয়াশা। এবার ধীরগতিতে। শহরের আবাসিক এলাকাটা দেখতে হবে। সন্ধান চাই মানুষের।

মাইল তিনেক অতিক্রম করে আবার গাড়ি থামাল কুয়াশা। গাড়ি থেকে নামল সে। পথে একাধিক করুণ দৃশ্য চোখে পড়েছে তার। দুশ্চিন্তার রেখা ফুটে উঠেছে কুয়াশার কপালে। মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে এখানেও আকাশ ছোঁয়া অ্যাপার্টমেন্ট হাউস। রাস্তার এখানে সেখানে স্যুট-কোট পরা লোকজন শুয়ে রয়েছে। কাউকে স্পর্শ না করেই কুয়াশা বুঝতে পেরেছে, ওরা কেউ বেঁচে নেই। লম্বা হয়ে পড়ে আছে লাশ, মৃত মানুষ।

একতলা দোতলা বাড়িও দেখা যাচ্ছে। কোন বাড়িতে আলো জ্বলছে, কোন বাড়ি সম্পূর্ণ অন্ধকারে ঢাকা।

এক পা, দু'পা করে রাস্তার মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল কুয়াশা। সুবেশী একজন লোক উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে। চোখ দুটো খোলা তার। কিন্তু মণি দুটো স্থির, অচঞ্চল।

মৃতদেহটা স্পর্শ করে দেখার দরকার হলো না। বোঝা যাচ্ছে, মারা গেছে অনেক আগে। লোকটার পরনের কাপড় দামী এবং নতুন। কিন্তু অনেক জায়গায় ছেঁড়া। কুয়াশার মনে হলো জোর করে টেনে ছিঁড়েছে কেউ ট্রাউজার আর শার্ট কয়েক জায়গায়। আবার লোকটার মুখের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল সে। মারা গেলেও লোকটার চোখের দৃষ্টিতে ফুটে রয়েছে ভীষণ আতঙ্ক। মুখের ভাঁজ দেখে বোঝা যাচ্ছে অসহনীয় কষ্ট পেতে পেতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে এই লোক। পা এবং হাত দুটো, মুখ, নাক, কপাল এবং ছেঁড়া কাপড়ের ফাঁক দিয়ে বুক, পেট উরুর যে অংশগুলো দেখা যাচ্ছে—সব গোলাপী রঙের ঘায়ে ঢাকা পড়ে গেছে। কদাকার কুৎসিত।

দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল কুয়াশা। কান পাতল। কোথাও কোন শব্দ নেই। নিশ্চুপ, নিস্তব্ধ চারদিক।

গা ছমছম করে উঠল কুয়াশার। শহর বটে, কিন্তু ভৌতিক শহর। মহামারী উজাড় করে দিয়েছে শহরটাকে। এগিয়ে আসছে চারদিক থেকে একটা কায়াহীন আতঙ্ক।

এ কোথায় এসে পড়েছে সে। এখান থেকে মুক্তির উপায় কি! কেউ একজনও কি জীবিত নেই এত বড় শহরে? এই ঘা,—নিশ্চয়ই কোন ভয়ঙ্কর ভাইরাস এর জন্য দায়ী। কিন্তু এত উন্নত একটা জাতি, ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেল কেন? গ্রামকে গ্রাম, শহরকে শহর উজাড় হয় কি করে?

ভাইরাস, তা সে যতই ভয়ঙ্কর হোক, তাকে ধ্বংস করার ওষুধ আবিষ্কার করা একেবারেই কি অসম্ভব?

নানান কথা ভাবতে লাগল কুয়াশা। ভাইরাসে আক্রান্ত হলো কিভাবে এরা? এরা কি জীবাণু যুদ্ধের শিকার? এই গ্রহেরই অন্য কোন জাতি এদেরকে ধ্বংস করার জন্য জীবাণু ছড়িয়ে দিয়েছে চারদিকে…?

গম্ভীর হয়ে উঠল কুয়াশা। এই সাংঘাতিক ঘা-এর জীবাণু বাতাসের সাথে উড়ে বেড়াচ্ছে। শ্বাস গ্রহণের সাথে তার শরীরেও প্রবেশ করছে অচেনা, ভয়ঙ্কর জীবাণু।

সে-ও যে-কোন মুহূর্তে আক্রান্ত হতে পারে ভাইরাসে, ঘা ফুটে উঠতে পারে তার শরীরেও।

চঞ্চল দৃষ্টিতে এদিকে ওদিকে তাকাল কুয়াশা। ল্যাবরেটরি নিশ্চয়ই আছে এত বড় শহরে। কিন্তু কোথায়, কোন্ দিকে? কে বলে দেবে তাকে?

খুক করে কাশল সে। একবার ভাবল, চেঁচিয়ে ডাকে কাউকে। তার সাড়া পেয়ে কেউ হয়তো আশপাশের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতেও পারে। হয়তো মহামারীর ভয়ে সবাই দরজা জানালা বন্ধ করে দিয়ে বসে আছে।

হঠাৎ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল কুয়াশার দৃষ্টি। দ্রুত এ-বাড়ি, সে-বাড়ি, এ-বিল্ডিং, সে-বিল্ডিংয়ের জানালা খুলে যাচ্ছে।

কুয়াশা উপর দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে রইল। সাত-আটতলা উঁচু অবধি ফ্লাটের জানালা খুলে গেছে। উঁকি মেরে দেখছে তাকে লোকজন। কোন জানালায় একজন, কোন জানালায় দু'জন। তারা সবাই কুয়াশাকেই দেখছে।

রহস্যময় ব্যাপার! জানল কিভাবে এরা কুয়াশা এখানে আছে। মনে পড়ল কুয়াশার, কেশেছিল খানিক আগে সে খুক করে। কাশির শব্দ অত উঁচু অবধি গেল কিভাবে?

তবে কি এখানকার মানুষের শ্রবণশক্তি পৃথিবীর মানুষের তুলনায় বেশি? ইথারের মৃদুতম কম্পনও কি এদের কানে আঘাত হানতে সক্ষম?

নিশ্চয়ই তাই।

যেমন দ্রুত খুলে গিয়েছিল তেমনি দ্রুত একে একে আবার বন্ধ হয়ে যাচ্ছে জানালাগুলো। আজব ব্যাপার সন্দেহ নেই। কিন্তু কুয়াশা আশ্চর্য হলো না। এখানকার মানুষ মৃত্যুভয়ে জর্জরিত। মহামারীর প্রতিষেধক আবিষ্কার করতে পারেনি এরা। প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কা সকলের, এই বুঝি ভাইরাস আক্রমণ করল। চোখের সামনে মারা গেছে এদের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পরিচিত-অপরিচিত গোটা শহরের অসংখ্য নাগরিক—বেঁচে আছে মুষ্টিমেয় তারা ক'জন, ফলে যে-যার কামরায় দরজা জানালা বন্ধ করে দিয়ে আতঙ্কের প্রহর গুণছে।

দীর্ঘ পদক্ষেপে রাস্তাটা পেরিয়ে একটা অ্যাপার্টমেন্ট হাউসের খোলা গেটের দিকে এগিয়ে চলল কুয়াশা। সময় নষ্ট করা উচিত হবে না। রোগের সাথে আপোস নেই। রোগও কারও সাথে আপোস করে না। চেষ্টা করে দেখতে হবে এই রোগের ওষুধ আবিষ্কার করা যায় কি না। চেষ্টা করতে গেলে চাই ল্যাবরেটরি। ল্যাবরেটরি না পেলে কোন কাজই হবে না।

গেট অতিক্রম করে ভিতরে ঢুকতে গিয়ে বাধা পেল কুয়াশা। একি! কে অমন চেঁচাচ্ছে!

থমকে দাঁড়াল কুয়াশা! গায়ের লোম খাড়া হয়ে যাচ্ছে তার, টের পাচ্ছে সে। এ ঠিক চিৎকার নয়, আর্তনাদ। অ্যাপার্টমেন্ট হাউসের তিন কিংবা চারতলার কোন ফ্ল্যাট থেকে ভেসে আসছে। কোন লোকের গলা দিয়ে এমন ভয়ঙ্কর আর্তচিৎকার বেরুতে পারে, কানে না শুনলে বিশ্বাস করা যায় না। অসহনীয়, সহ্যের অতীত

কোন ব্যথা বা যন্ত্রণা বা জ্বালায় উন্মাদ হয়ে গেছে যেন লোকটা।

এগিয়ে আসছে ভীতিকর চিৎকারের শব্দ।

'ঠাস!'

ভুরু কুঁচকে উঠল কুয়াশার। একি! গুলির শব্দ হলো কেন? থেমে গেছে গুলির শব্দের পরপরই সেই ভীতিকর বিকট আর্তনাদ। খট-খট, খট-খট, খট-খট! ভারি জুতো পায়ে দিয়ে কেউ নামছে সিঁড়ি দিয়ে। কুয়াশা অ্যাপার্টমেন্ট হাউসের গেটের কাছে দাঁড়িয়ে চেয়ে রয়েছে সিঁড়ির দিকে। এক মুহূর্ত পরই সে দেখল একজন লোককে। প্রকাণ্ড, দশাসই চেহারার লোকটা ধীরস্থির ভঙ্গিতে নামে আসছে সিঁড়ি বেয়ে। পরনে ট্রাউজার এবং শার্ট। মাথাটা নত।

কুয়াশাকে লোকটা দেখেও দেখল না। পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে দেখে কুয়াশা খুক করে কাশল। কিন্তু লোকটা থামল না বা ঘাড় ফিরিয়ে তাকালও না।

ইতস্তত না করে পরিষ্কার বাংলায় কথা বলে উঠল কুয়াশা, 'মাফ করবেন, আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই।'

লোকটা যেমন হাঁটছিল তেমনি হাঁটতে লাগল। কুয়াশার কথা যেন তার কানে যায়নি। কুয়াশা পিছু নিল লোকটার। আবার বলল, 'একটু দাঁড়াবেন কি!'

বৃথা চেষ্টা, লোকটা ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল না পর্যন্ত। কুয়াশা লোকটার পাশে চলে গেল। পাশাপাশি হাঁটছে সে।

'কানে কম শোনেন নাকি? আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন না? কাজ হলো না। লোকটা নির্বিকার।'

'কী আশ্চর্য!'

কুয়াশা হাত বাড়াল। লোকটার কাঁধে রাখল সে হাতটা। তারপর চেপে ধরল সেই হাত দিয়ে চওড়া কাঁধটা। বলল, 'দাঁড়ান।'

লোকটা ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল কুয়াশার দিকে। তারপর ডান হাতটা তুলে কুয়াশার হাতটা এক ঝটকায় কাঁধ থেকে নামিয়ে দিল।

'কি হবে প্রশ্ন করে? কি জানতে চান? জেনে কি লাভ? বিরক্ত করবেন না, নিজের চরকায় তেল দিন গিয়ে।'

লোকটা শুদ্ধ বাংলায় কথাগুলো বলে আবার হাঁটতে শুরু করল। কুয়াশা নাছোড়বান্দা। হাঁটতে লাগল সে লোকটার সাথে সাথে। জানতে চাইল, 'আমি আপনাদের এখানকার মানুষ নই। কিছুই জানি না এখানকার অবস্থা সম্পর্কে। তাই কৌতূহল। একটু আগে একজন চিৎকার করছিল—কেন বলুন তো? তারপর গুলির শব্দ হলো—কে কাকে গুলি করল বলতে পারেন?

'পাগল নাকি আপনি? এখানকার অবস্থা জানেন না কথাটার অর্থ কি? আনতারার সব জায়গার অবস্থাই তো এই! গুলি আমি করেছি, আমার ভাইকে।'

'কেন?'

লোকটা রেগে উঠল, 'কী জ্বালা! আপনি দেখছি পাগলই! জিজ্ঞেস করছেন, কেন! জানেন না বুঝি! ওর অমন কষ্ট সহ্য করতে পারিনি বলে গুলি করেছি। এবার

কেটে পড়ুন। আর একটাও কথা শুনতে চাই না আমি আপনার।'

কিছু বলতে যাচ্ছিল কুয়াশা, হঠাৎ তার দৃষ্টি গিয়ে পড়ল পঁচিশ গজ দূরের আকাশচুম্বী একটা বাড়ির পাঁচতলার ব্যালকনিতে। ব্যালকনির রেলিঙের উপর ওঠার চেষ্টা করছে একটি মেয়ে। বাড়িটার উপরতলা থেকে একটি পুরুষ কণ্ঠের চিৎকার ভেসে আসছে। সেই চিৎকারের শব্দ কানে যেতেই কুয়াশার দৃষ্টি ওদিকে গিয়ে পড়েছে।

আঁতকে উঠল কুয়াশা। মেয়েটা মরতে চায় নাকি! লাফ মারবে বলে মনে হচ্ছে পাঁচতলা থেকে।

ছুটল কুয়াশা। লাফই মেরেছে মেয়েটা। সবেগে নেমে আসছে দেহটা নিচের ফুটপাতে!

কেউ যেন পিছন থেকে জড়িয়ে ধরল কুয়াশাকে। থমকে দাঁড়িয়েছে কুয়াশা। ইন্দ্রিয়গুলো সতর্ক, সাবধান হয়ে উঠল সাথে সাথে। কেউ ধরেনি পিছন থেকে কুয়াশাকে। সে নিজেই দাঁড়িয়ে পড়েছে আচমকা।

আশপাশের বাড়ি থেকে একটা নয়, দুটো নয়, অনেক নারী-পুরুষের বিকট আর্তনাদের শব্দ কুয়াশার কানের পর্দায় আঘাত হানতে শুরু করেছে।

মৃত্যু যন্ত্রণায় অস্থির, সহ্যের অতীত কষ্ট হলেই মানুষ অমন বিকট স্বরে চিৎকার করতে পারে। গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠল কুয়াশার। একি রহস্য!

দুর্জয় মনোবলের অধিকারী কুয়াশাও কেমন যেন আতঙ্কিত হয়ে উঠছে। এ কোথায় পাঠিয়েছে তাকে প্রফেসর ওয়াই। এমন ভৌতিক পরিবেশ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কোথাও থাকতে পারে তা কল্পনা করাও কষ্টকর।

বাড়ছে, চিৎকারগুলো চারদিক থেকে বেড়ে উঠছে। কানে আঙুল দিল কুয়াশা। সহ্য করতে পারছে না সে মানুষের এমন অসহায় আর্তনাদ। তার বিশাল বুক কানায় কানায় ভরে উঠেছে, উথলে পড়ছে সমবেদনা, সহানুভূতি—কিন্তু কি করবে সে এদের জন্য! কিভাবে কি করলে এদেরকে এই কষ্ট থেকে মুক্তি দেয়া সম্ভব?

দিশেহারা হয়ে পড়ছে কুয়াশা। পৃথিবীতে এমন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়নি সে কখনও। প্রতিটি বাড়ি থেকে একাধিক নারী-পুরুষ অস্থির যন্ত্রণায় ছটফট করছে।

দরজা জানালা ঠোকাঠুকির শব্দ হচ্ছে। কুয়াশা দেখল দলে দলে মানুষ বেরিয়ে আসছে রাস্তায়। ভীত-সন্ত্রস্ত সবাই। কেউ কারও সাথে কথা বলছে না, কেউ কারও দিকে তাকাচ্ছে না। দ্রুত, চঞ্চল পায়ে যে যেদিকে পারছে পালাচ্ছে।

মর্মর মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল কুয়াশা। জীবনে এই প্রথম, সাময়িকভাবে হলেও, উপস্থিত বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছে সে।

কাছেই খটাং করে শব্দ হলো একটা। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল কুয়াশা। দরজা খুলে বেরিয়ে এল একজন লোক।

হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল কুয়াশার। চোখের সামনে যা ঘটেছে তা চিরকাল স্মরণ থাকবে তার। মানুষটা লাফাচ্ছে। সবেমাত্র ডাঙায় তোলা শিঙি মাছের মত। চোখে না দেখলে এরকম দৃশ্য কল্পনা করা অসম্ভব। লাফাচ্ছে বলা ঠিক হবে না

লোকটা আসলে গোলাকার ফুটবলের মত ড্রপ খেতে খেতে রাস্তায় বেরিয়ে এল। চেয়ে আছে কুয়াশা। কিন্তু মানুষটা মেয়ে না পুরুষ বুঝতে পারছে না সে। মানুষটার হাত দুটো কোথায়, পা দুটো কোথায় দেখতে পাচ্ছে না সে। বিদ্যুৎ গতিতে হাত-পা গুটিয়ে দেহটা শূন্যে উঠছে, আবার ড্রপ খাচ্ছে ফুটপাতে, আবার শূন্যে উঠছে—এইভাবে চলেছে সারাক্ষণ। সেই সাথে কান-ফাটানো চিৎকার বেরিয়ে আসছে মানুষটার গলা দিয়ে। চারদিকের হাজারো নারী-পুরুষের চিৎকারের সাথে সেই চিৎকারটা মিশে যাচ্ছে, চেনা যাচ্ছে না আলাদাভাবে।

চোখের কোণে পানি জমে উঠল কুয়াশার। মৃত্যুও এর চেয়ে ভাল। এই কষ্ট শত্রুর জন্যও কেউ কামনা করতে পারে না।

পা বাড়াল কুয়াশা। আলখাল্লার পকেট থেকে বড়সড় একটা হাইপডারমিক সিরিঞ্জ বেরিয়ে এসেছে তার হাতে। পেশীবহুল দীর্ঘ ডান হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে কুয়াশা বিদ্যুৎগতিসম্পন্ন মানুষটাকে ধরতে চেষ্টা করল। মুহূর্তের জন্য মানুষটা ধরা পড়ল কুয়াশার হাতে। নিজের শরীরের সাথে তাকে চেপে ধরতে গেল কুয়াশা। কিন্তু ব্যর্থ হলো সে। তড়াক করে লাফিয়ে হাতছাড়া হয়ে গেল মানুষটা।

সম্ভব নয় এভাবে। আবার পা বাড়াল কুয়াশা। এবার বাড়িয়ে দিয়েছে সে মানুষটার দিকে সিরিঞ্জ ধরা বাঁ হাতটা! কাছাকাছি পৌঁছে কুয়াশা সবেগে অস্থির মানুষটার শরীরে প্রবেশ করিয়ে দিল সিরিঞ্জের সুচ।

সিরিঞ্জের সবটুকু ওষুধ প্রবেশ করল মানুষটার দেহে। এক পা পিছিয়ে এল কুয়াশা। এক মিনিট। তারপরই স্থির হয়ে গেল দেহটা।

পুরুষ মানুষই। পরনে কিছু নেই, সম্পূর্ণ উদোম। স্থির, অচঞ্চল হয়ে পড়ে আছে ফুটপাতের উপর হাত-পা ছড়িয়ে। কুয়াশার ব্যথা উপশমকারী ওষুধের প্রভাবে সব ব্যথা থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে সে।

লোকটা হাঁপাচ্ছে চোখ বন্ধ করে। পাশে গিয়ে বসল কুয়াশা। সারা শরীরে ঘা দগদগ করছে দেখল সে। কয়েক মুহূর্ত পর মাথাটা ঘুরে উঠল তার।

একী সাংঘাতিক ঘা! কুয়াশার চোখের সামনে ঘা বাড়ছে। উরুর ঘা বাড়তে বাড়তে তলপেটের উপর দিয়ে বুকের দিকে এগিয়ে আসছে। মুখ ভর্তি ঘা, মুখ থেকে ছড়িয়ে পড়ছে গলায়, গলা থেকে কাঁধে, কাঁধ থেকে হাতে।

দেখতে দেখতে সব শরীর ছেয়ে যাচ্ছে, ঢাকা পড়ে যাচ্ছে, গোলাপী ঘায়ে। আতঙ্কিত দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে কুয়াশা। আশ্চর্য! কয়েক মিনিটেই সর্বশরীর ছেয়ে গেল লোকটার দগদগে ঘায়ে।

হঠাৎ কুয়াশা সংবিৎ ফিরে পেল। দেখল আর নিঃশ্বাস ফেলছে না, ঘায়ের আক্রমণে নিহত হয়েছে লোকটা।

উঠে দাঁড়াল কুয়াশা। চারদিকের আর্তচিৎকার বয়ে বেড়াচ্ছে বাতাস। রাস্তায় এখনও মানুষ দেখা যাচ্ছে। দ্রুত, মাথা নিচু করে, পালাচ্ছে ভীত নারী-পুরুষ।

আবার বসল কুয়াশা। মৃত মানুষটার শরীরে একটা সিরিঞ্জের সুচ ঢুকিয়ে রক্তের নমুনা সংগ্রহ করল সে। চিনতে হবে এই ঘায়ের ভাইরাসকে।

উঠে দাঁড়িয়ে কুয়াশা দেখল দু'জন লোক পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। সরাসরি প্রশ্ন

করল এবার কুয়াশা, 'ল্যাবরেটরি কোন্ পথে, বলতে পারেন? আমি নতুন এখানে।'

থামল না লোক দু'জন। তবে একজন বলল, 'কোন লাভ নেই।'

কিন্তু দ্বিতীয় লোকটা বলে উঠল, 'সোজা চলে যান, চৌমাথায় গিয়ে ডান দিকে মোড় নেবেন, খানিকদূরে গেলেই হলুদ বিল্ডিংটা চোখে পড়বে। ওটাই।'

কিন্তু প্রথম লোকটা বিরক্তির সাথে বলল, 'দূর! ওটা না, ওর পাশের বিল্ডিংটা ল্যাবরেটরি।'

'হবেও বা।' বলল দ্বিতীয় লোকটা।

কুয়াশা ল্যাবরেটরির সন্ধানে পা বাড়াল। রাস্তার উপর লাশের সংখ্যা বাড়ছে। কয়েক পা এগিয়েই দাঁড়াল কুয়াশা। আর একজন লোক ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে প্রচণ্ড ব্যথায় লাফাচ্ছে অস্থিরভাবে।

একশো গজ অতিক্রম করতে দশবার থামতে হলো কুয়াশাকে। দশজন লোককে ব্যথা উপশমকারী ওষুধ দিল সে। কিন্তু ব্যথা থেকে তারা মুক্তি পেলেও তাদের কাউকেই বাঁচাতে পারল না। ঘায়ে ছেয়ে গেল তাদের সকলের দেহ, মারা গেল সবাই সাথে সাথে।

তারপর কুয়াশা হঠাৎ দেখল, ওষুধ নেই আর। সব শেষ হয়ে গেছে।

প্রকাণ্ড থাবা বসিয়েছে মহামারী। একটা উন্নত জাতি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। মেনে নিতে পারছে না কুয়াশা এদের এই পরাজয়! এরা এই ভাইরাসের প্রতিষেধক আবিষ্কার করতে পারেনি কেন? এরা কি বিজ্ঞানের এই দিকটায় খুব বেশি উন্নতি করতে পারেনি?

সে যাই হোক, কুয়াশা স্বয়ং চেষ্টা করে দেখবে একবার। দেখা যাক সফলতা আসে কিনা!

তিন

এক পলকে সব আশার আলো দপ করে নিভে গেল। ল্যাবরেটরির সন্ধান ঠিকই পেল কুয়াশা কিন্তু অক্ষত অবস্থায় নয়। ল্যাবরেটরির ভিতরে পড়ে আছে চার-পাঁচটা ভাইরাসে আক্রান্ত মৃত মানুষের লাশ। ছোট বড় কাঁচের জার, টিউব মাইক্রোসকোপ সব ভেঙেচুরে একাকার হয়ে পড়ে আছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। মেঝেতে নানা রঙের কেমিক্যালসের বন্যা।

ভাইরাসে আক্রান্ত লোকগুলো তীব্র যন্ত্রণায় দাপাদাপি করার সময় ধাক্কা লেগে সব পড়ে গিয়ে ভেঙে গেছে। বেরিয়ে পড়ল কুয়াশা। সময় নষ্ট করা মানে নিজের মৃত্যুকে ডেকে আনা। যে-কোন মুহূর্তে ঘা ফুটে উঠতে পারে তার শরীরেও। একবার আক্রান্ত হলে আর রক্ষা নেই। আক্রান্ত হবার আগেই এই ভাইরাসের প্রতিষেধক আবিষ্কার করতে হবে।

গাড়িটার কাছে ফিরে এল কুয়াশা। নিস্তব্ধ, নিশ্চুপ চারদিক। আগের মতই ভৌতিক পরিবেশ ফিরে এসেছে। কিন্তু এখন রাস্তায় লাশের সংখ্যা অগুনতি।

জীবিত মানুষগুলো এই এলাকা ছেড়ে অন্য এলাকায় চলে গেছে। কাউকে গাড়ি ব্যবহার করতে দেখেনি সে। তার মানে, মহামারী এই পাড়ায় দেখা দেয়ায় জীবিত মানুষগুলো কাছে পিঠের কোন পাড়ায় চলে গেছে।

গাড়ি ছুটছে। অচেনা পথ। গন্তব্য অজ্ঞাত। তবু ফুল স্পীডে ছুটছে কুয়াশার গাড়ি।

মিনিট সাতেক পর আবার থামল কুয়াশা। নতুন শহর এটা। খাঁ খাঁ করছে চারদিক। সবই আছে, নেই কেবল প্রাণ।

আবার ছুটল গাড়ি।

এরপর যে শহরটায় প্রবেশ করল কুয়াশা, সেটা আকারে ছোট হলেও জীবিত মানুষের দেখা পাওয়া গেল রাস্তাঘাটে।

চৌমাথার কাছে গাড়ি থামিয়ে লাফ দিয়ে নামল কুয়াশা। আগুন জ্বলছে একটা তিনতলা বাড়ির নিচতলায়।

গাড়ি থেকে নেমে বোকা বনে গেল কুয়াশা। এ কেমন আচরণ এখানকার মানুষদের? গাড়ি-ঘোড়া সবই চলছে, ফুটপাত দিয়ে। সুবেশী সুদর্শন এবং দীর্ঘদেহী নারী পুরুষ যাচ্ছে আসছে। কিন্তু কেউ দেখেও যেন দেখছে না বাড়িটার দাউ দাউ আগুন। যে যার পথে হাঁটছে সবাই, কেউ দাঁড়াচ্ছে না একবার, কারও মধ্যে এতটুকু চাঞ্চল্য নেই। বাড়িটার উপরতলা থেকে প্রাণভয়ে অস্থির নারী-পুরুষের চিৎকারও কি কানে ঢুকছে না কারও?

রাস্তার চৌমাথায় দাঁড়িয়ে বজ্রকণ্ঠে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করল কুয়াশা। 'আগুন ধরে গেছে বাড়িটায়! আপনারা সবাই দেখেও দেখছেন না কেন? বাড়ির ভিতর আটকা পড়েছে মানুষ, ওরা পুড়ে মরবে, ওদেরকে বাঁচাতে চেষ্টা করি, চলুন!'

সবাই যেন একযোগে কুয়াশাকে ব্যঙ্গ করার পরিকল্পনা এঁটেছে। কেউ কান দিল না কুয়াশার কথায়। যেন শুনতেই পায়নি তার কথা।

লোকজনের মুখের দিকে তাকিয়ে স্তম্ভিত না হয়ে পারল না কুয়াশা। সবাই ভাবলেশহীন। সহ্য হলো না কুয়াশার, লাফ দিয়ে একদল লোকের সামনে গিয়ে পড়ল সে। খপ করে ধরল সামনে যাকে পেল তার একটা হাত। অন্যান্যরা ফিরেও তাকাল না, পাশ ঘেঁষে চলে গেল যন্ত্রের মত নির্বিকারভাবে।

'কি ব্যাপার? আপনারা বেঁচে আছেন, না, মরে ভূত হয়ে গেছেন? বাড়িটায় আগুন লেগেছে...'

'কি করব?' লোকটা নিরাসক্ত গলায় কথাটা বলল।

'আগুন নেভাবেন। ফায়ার ব্রিগেডে খবর দেবেন।' কুয়াশা ধমকে উঠে বলল।

লোকটা ছাড়িয়ে নিল হাতটা। বলল, 'আপনার দেখি মাথা বিগড়ে গেছে! আগুন জ্বালিয়েছে ও বাড়ির মানুষরা নিজেরাই!'

'কেন?'

'মরবার জন্যে, আবার কেন!'

'মরবার জন্যে?'

বাঁকা সুরে লোকটা বলল, 'জ্বী-হ্যাঁ—মরার জন্যে। ওরা বাঁচতে চায় না। ঘা ফুটবে এই ভয়ে, তাছাড়া···দূর, সরেন, পথ ছেড়ে দিন আমার, আপনি পাগল, আপনার সাথে পাগলামি করতে রাজি নই আমি···।'

বাড়িটার দোতলায় ছড়িয়ে পড়ছে আগুন। বুঝতে পারছে কুয়াশা, কারও কাছ থেকে সাহায্য পাবার কোন আশা নেই। বাড়িটার ভিতর থেকে নারীপুরুষের সম্মিলিত চিৎকার ভেসে আসছে। এই দৃশ্য কোন মানুষের পক্ষে চুপচাপ দাঁড়িয়ে দেখা সম্ভব নয়। দৌড়ুতে শুরু করল কুয়াশা। বাড়িটার গেটের কাছে গিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল পিছন দিকে সে। কী অবাক কাণ্ড! রাস্তায় এত মানুষ, কেউ এদিকে তাকাচ্ছে না পর্যন্ত।

গেট পেরিয়ে সিঁড়িটা দেখতে পেল কুয়াশা। নিচের তালাটা দখল করে নিয়েছে আগুন। কামরাগুলোর ভিতর নৃত্য করছে লেলিহান অগ্নিশিখা। মাংসপোড়ার উৎকট গন্ধে দম বন্ধ হবার উপক্রম। কেউ বেঁচে নেই নিচের তলায়। সিঁড়িতেও ধরেছে আগুন। তা সত্ত্বেও পা বাড়াল কুয়াশা সেদিকে।

হাই জাম্প দেবার কায়দায় লাফ দিয়ে সিঁড়ির আটটা ধাপ টপকে নবম ধাপে গিয়ে পড়ল কুয়াশা। নয় এবং দশ নম্বর ধাপে আগুন নেই। উপরের পাঁচটা ধাপে আগুন ধরেছে, নিচের সবক'টা ধাপেই আগুন। আবার লাফ দিল কুয়াশা। তারপর আবার। দোতলার করিডরে উঠে এল সে লাফ দিয়ে আগুন টপকাতে টপকাতে।

করিডরের দক্ষিণ প্রান্তের একটা বড় হলরুমের ভিতর জ্বলছে আগুন। ভিতর থেকে চিৎকার ভেসে আসছে। স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কুয়াশা কয়েক মুহূর্ত। করিডরে চার-পাঁচজন লোক বসে রয়েছে চেয়ারে। আগুনের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সবাই। কারও মধ্যে কোন উদ্বেগ, আতঙ্ক বা চাঞ্চল্য নেই। আগুনের রক্তিম শিখা যেন ওদেরকে সম্মোহিত করেছে। ইচ্ছে করলে এখনও এরা প্রাণ বাঁচাতে পারে। কিন্তু প্রাণ বাঁচাবার উৎসাহ বা আগ্রহ এদের মধ্যে একেবারেই নেই।

কুয়াশা জ্বলন্ত হলরুমের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ধোঁয়া এবং আগুনের শিখায় কামরার ভিতরটা ঢাকা পড়ে গেছে। তবে ভিতরে যে জীবন্ত মানুষ আছে তাতে কোন সন্দেহ নাই। চিৎকার ভেসে আসছে ভিতর থেকে। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল কুয়াশা পিছন দিকে। লোকগুলো চেয়ারে সোজা হয়ে বসেছে। কপালে ভাঁজ ফুটে উঠেছে তাদের।

যে-কোন কারণেই হোক, অসন্তুষ্ট দেখাচ্ছে তাদেরকে।

কুয়াশা লাফ দিয়ে জ্বলন্ত কামরার ভিতর ঢুকল। আগুন এবং ধোঁয়ার মধ্যে হারিয়ে গেল সে।

কামরাটা বিরাট। কুয়াশা আতঙ্ক অনুভব করছিল। কামরার ভিতর অনেক লোকজন আটকা পড়ে গেছে! কিন্তু মাত্র দু'জনকে দেখল সে। একটি যুবতী মেয়ে এবং একজন প্রৌঢ় লোক। দুজনেই ফুটবলের মত কামরার মেঝেতে ড্রপ খাচ্ছে,

ভাইরাসে আক্রান্ত তারা। দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য যন্ত্রণায় কাতর নারী এবং পুরুষটির শরীরে আগুন ধরে গেছে। মেঝেতে আর একজনকে দেখল কুয়াশা। ইতিমধ্যেই আগুনের কবলে পুড়ে পুড়ে কয়লা হয়ে গেছে লোকটা।

করণীয় কিছুই নেই দেখে করিডরে বেরিয়ে এল কুয়াশা তেমনি বসে আছে লোকগুলো। কুয়াশা তাদের সামনে দাঁড়াল। বলল, 'আপনারা কি মনে করে বসে আছেন?'

'জানি না।' অনিচ্ছাসত্ত্বেও উত্তর দিল একজন, অন্যদিকে তাকিয়ে।

'আগুন লাগল কিভাবে?'

দ্বিতীয় লোকটা উত্তর দিল, 'আমি লাগিয়েছি।'

'কেন?'

এবার চারজনই মুখ তুলে তাকাল কুয়াশার দিকে। একযোগে চারজনই বলে উঠল, 'এ কেমন প্রশ্ন? পাগল নাকি আপনি?'

হাসবে কি রাগবে বুঝতে পারল না কুয়াশা। কিন্তু সময় নষ্ট না করে আবার প্রশ্ন করল সে, 'আগুন ছড়িয়ে পড়ছে দ্রুত। দেরি করলে পুড়ে মরবেন সবাই। চলুন, নিচে নামার চেষ্টা করি।'

প্রথমজন বলল, 'নিচে নেমে কি হবে?'

কুয়াশা বলল, 'প্রাণটা রক্ষা পাবে। বেঁচে থাকবেন। এখানে এভাবে বসে থাকলে পুড়ে মরবেন, বুঝতে পারছেন না?'

তৃতীয় লোকটা তিক্ত হাসল। বলল, 'বেঁচে থাকব? ঠাট্টা করছেন, না? সাহস তো কম নয় আপনার! বেঁচে থাকার কোন উপায় আর নেই, এ কথা কে না জানে।'

কুয়াশা বলল, 'আপনাদের বক্তব্য ঠিক বুঝতে পারছি না আমি।'

'দরকার নেই বোঝার, নিজের চরকায় তেল দিন গিয়ে।'

কুয়াশা শান্ত গলাতেই বলল আবার, 'দেখুন, আপনাদের সমস্যা আমি বুঝতে পারছি না, কারণ, আমি আপনাদের গ্রহের মানুষ নই। আমি এসেছি পৃথিবী থেকে।'

'পৃথিবী থেকে!'

কুয়াশা বলল, 'হ্যাঁ। এসেই দেখি আপনাদের শহর, গ্রাম মহামারীতে জনশূন্য হয়ে গেছে—যাচ্ছে। কিন্তু···।'

'পৃথিবী থেকেই আসুন আর যেখান থেকেই আসুন, করার কিছু নেই আপনার। ডক্টর কূটজেই পারলেন না কোন ব্যবস্থা করতে আর আপনি কি করবেন।'

কুয়াশা বলল, 'ডক্টর কূটজে! কোথায় তিনি?'

'মারা গেছে। ঘায়ে।'

কুয়াশা বলল, 'ডক্টর কূটজে বুঝি ঘা-এর প্রতিষেধক আবিষ্কারের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন?'

'না। সসেমিরাদের ধ্বংস করার উপায় বের করার চেষ্টা করছিলেন তিনি।'

সময় নেই আর। করিডরেও হামলা চালিয়েছে আগুন। সিঁড়িটা সম্পূর্ণ অগ্নিকবলিত। এখন প্রাণ বাঁচাতে হলে দোতলা থেকে নিচে লাফিয়ে পড়তে হবে।

দ্রুত বলল কুয়াশা, 'এই ঘা-এর প্রতিষেধক আমি আবিষ্কার করতে পারব। আপনারা আমাকে সাহায্য করুন। আপনাদের ল্যাবরেটরি কোথায় দেখিয়ে দিন আমাকে। বিশ্বাস রাখুন আমার ওপর, আমি আপনাদের সব সমস্যার সমাধান করে দিতে চেষ্টা করব। পৃথিবীর একজন বিজ্ঞানী আমি, আমার ওপর আপনারা আস্থা রাখুন…'

'পাগল! কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় এই গ্রহকে, এই গ্রহের মানুষকে রক্ষা করা। স্যাটার্ন-এর অ্যাস্টারয়ড বিরাট বিপুল আকারে বিদ্যুৎবেগে ধেয়ে আসছে, সসেমিরাকে ধাক্কা দিয়ে সাথে নিয়ে চলে যাবে সৌরজগতের বাইরে, সীমাহীন মহাশূন্যে। সসেমিরা না থাকলে আনতারা কক্ষচ্যুত হবে, আকর্ষণের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাবে…দুত্তোরী ছাই! পুরানো কথা বলতে আর ভাল্লাগে না। যান, কেটে পড়ুন। পৃথিবীর মানুষ, পৃথিবীতে ফিরে যান। আমরা শেষ হয়ে গেছি, সসেমিরাও শেষ হয়ে যাচ্ছে। বলা যায় না, ওরা হয়তো বাঁচার একটা রাস্তা পেয়েও যেতে পারে। ওরা বাঁচলে আপনাদের বিপদ। ওরা পৃথিবীতেই যাবার পরিকল্পনা করছিল। আপনি বরং পৃথিবীতে গিয়ে প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা জোরদার করার চেষ্টা করুন। আমাদেরকে রক্ষা করার কথা ভুলে যান। আমরা খতম হয়ে গেছি।

কথা না বলে আচমকা কুয়াশা একজন লোককে ধরে শূন্যে তুলে ফেলল। রেলিঙের কাছে গিয়ে কুয়াশা তাকাল নিচের দিকে। বাড়িটার পিছন দিকের সুইমিং পুলটা দেখা যাচ্ছে। তবে প্রায় বিশ-পঁচিশ হাত দূরে সেটা। কুয়াশা লোকটাকে সজোরে ছুঁড়ে দিল সুইমিং পুলের দিকে।

একে একে বাকি তিনজনকেও নিক্ষেপ করল কুয়াশা একই জায়গায়। নিচের বাগানে নামল কুয়াশা লাফ দিয়ে।

সুইমিং পুল থেকে লোকগুলো সাঁতরে উঠে পড়েছে পাকা চত্বরে। চারজনই উঠে পড়েছে ইতিমধ্যেই। ভিজে কাপড়-চোপড় না খুলেই গেটের দিকে হাঁটছে তারা। কুয়াশা পিছন থেকে লোকগুলোর পাশে চলে গেল।

বলল, 'আপনারা আমার ওপর বিশ্বাস রাখুন। ল্যাবরেটরিটা দেখিয়ে দিন…।'

'এই বাড়িটার ওপর তলায় ছিল ল্যাবরেটরি। আমরা চিকিৎসক। গত তিনমাস ধরে চেষ্টা করেও কোন প্রতিষেধক আবিষ্কার করতে পারিনি। আমাদের অপর তিনজন সহকারী ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে আজ, তাই আগুন জ্বালিয়ে শেষ করে দিয়েছে ল্যাবরেটরি। ঘায়ের বীজাণু যাতে ল্যাবরেটরির বাইরে বেরুতে না পারে তার ব্যবস্থা করার জন্যই আগুন লাগাই আমরা। আপনি অপকার করেছেন আমাদেরকে মরতে না দিয়ে। এই শহরে ভাইরাস প্রথমবার আক্রমণ করেছিল মাস দুয়েক আগে। সবাই মারা গেছে তখন। এখন যাদেরকে দেখেছেন তারা সবাই অন্য শহর থেকে পালিয়ে এসেছে।'

কুয়াশা বলল, 'অন্য কোন্ শহরে ল্যাবরেটরি পাব বলতে পারেন?'

'রাজধানীতে যেতে পারেন। অনেক ল্যাবরেটরি পাবেন। কিন্তু লাভ নেই কোন। আপনি…।'

কুয়াশা হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। চোখের সামনে বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত ঘটনা ঘটল একটা। পাশের একটা গলি থেকে হলুদ ডোরা কাটা সাত হাত লম্বা হিংস্র একটা বাঘ বিকট গর্জন তুলে চারদিক কাঁপিয়ে একেবারে সামনে এসে পড়ল ওদের। কুয়াশার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিল যে চিকিৎসকটি, তার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়েছে বাঘটা। লোকটা পড়ে গেছে। বাঘটা লোকটার তলপেটের কাছে কামড়ে ধরেছে, তাকে তুলে নিয়ে ছুটছে তীরবেগে।

এমন অপ্রত্যাশিত দৃশ্য চোখের সামনে ঘটতে দেখে মুহূর্তের জন্য নিষ্ক্রিয় থাকলেও কুয়াশার শরীরে বিদ্যুৎ খেলে গেল পরমুহূর্তেই। টর্চের মত লম্বা একটা যন্ত্র বেরিয়ে এল পকেট থেকে তার হাতে। লেজার গান। টর্চের মুখটা পলায়নরত বাঘের দিকে ধরে বোতাম টিপল কুয়াশা।

বাঘের পিছনের অর্ধাংশ, রক্ত, মাংস, হাড়সহ বাষ্প হয়ে উড়ে গেল উপর দিকে। আক্রান্ত চিকিৎসক উঠে দাঁড়াল। রক্ত বেরুচ্ছে তার তলপেটের ক্ষতস্থান থেকে। কুয়াশা দেখল এমন ভয়ঙ্কর একটা ঘটনা লোকটার অপর তিনসঙ্গী বা অসংখ্য পথচারীদের কারও মনেই কোন রকম প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেনি। লোকটার সঙ্গী তিনজন হাঁটতে হাঁটতে অনেকটা এগিয়ে গেছে। পথচারীরাও কেউ দাঁড়ায়নি, যে-যার পথে ক্লান্ত শরীর টেনে নিয়ে চলছে। সবাই খুব বিমর্ষ, বিষণ্ণ। কারও মুখে হাসি নেই, কারও মধ্যে চাঞ্চল্য নেই, সকলের মধ্যেই প্রাণস্পন্দনের বিকট অভাব দেখা যাচ্ছে।

ডান হাতের কনুইয়ের পিছনদিকটা জ্বালা করে উঠল কুয়াশার। চমকে উঠল সে। হার্টবিট বেড়ে গেল সাথে সাথে। কনুইয়ের পিছন দিকটা চোখ দিয়ে দেখার আগে মনটাকে শক্ত করে নিল। ভাইরাস যদি আক্রমণ করে থাকে···

না, পিঁপড়ে কামড়েছে। ভাইরাসের আক্রমণ নয়। তবু ব্যস্ত হয়ে পড়ল কুয়াশা। ভাইরাসের আক্রমণ যে-কোন মুহূর্তে আসতে পারে।

গাড়ির কাছে ফিরে এল সে। রাজধানীতে যেতে হবে।

চার

লা ভেনজু। রাজধানী। বিরাট শহর। কয়েক লক্ষ অধিবাসী। লা ভেনজুকে যান্ত্রিক শহর বলা চলে। ঘণ্টাখানেক হলো পৌঁছেছে কুয়াশা এখানে। তার হাতের রিস্টওয়াচে এখন রাত সাড়ে এগারোটা।

রাজধানীতে ভাইরাস আক্রমণ চালিয়েছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। এখনও ভাইরাসে আক্রান্ত কোন মানুষকে দেখেনি কুয়াশা। তবে বিরাট শহর, কোথাও যদি ভাইরাস হামলা চালিয়েও থাকে, তা বোঝার কোন উপায় নেই।

ব্যস্তসমস্ত ভাবটা কিন্তু কোথাও দেখল না কুয়াশা। দোকানপাট খোলা, পথেঘাটে লোকজন রয়েছে, গাড়ি ঘোড়াও ছুটছে—কিন্তু সবই কেমন নির্জীব। কারও সুবিধে-অসুবিধের দিকে কেউ খেয়াল দিচ্ছে না। কেউই যেন নিজের উদ্দেশ্য বা গন্তব্য সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পোষণ করে না।

কয়েকটা সড়ক দুর্ঘটনা ঘটতে দেখল কুয়াশা। প্রথম দুর্ঘটনাটা ঘটাল একটা বড় আকারের গোলাকার গাড়ি। রাস্তা ছেড়ে সরাসরি ফুটপাতে উঠে গেল, উল্টে পড়ল সাত-আটজন লোকের উপরে। চিঁড়েচ্যাপ্টা হয়ে গেল কয়েকজন মানুষ। তিনজন লোকের নিম্নাঙ্গ চাপা পড়ল। ঊর্ধ্বাঙ্গ অক্ষত থাকলেও কেউ তাদেরকে সাহায্য করতে এগোল না।

মায়া-মমতা, সহানুভূতি, সমবেদনা—এসব যেন নেই এদের মধ্যে।

এক জায়গায় দলবদ্ধভাবে নেশা করে মাতাল হয়ে হাউ হাউ করে কাঁদছে একদল নারী-পুরুষ। তাদের কান্নার কারণ কি বোঝা গেল না। সবচেয়ে মজার ব্যাপার, এদেরকে কেউ কিছু জিজ্ঞেস করা তো দূরের কথা, কেউ ফিরেও তাকাল না।

কুয়াশা অসংখ্য লোকের সাথে আলাপ করবার চেষ্টা করল। কাজ হলো না। বাংলা, ইংরেজি এবং জার্মান ভাষা এরা প্রায় প্রত্যেকেই জানে কিন্তু কোন প্রশ্নেরই উত্তর দেবার মত আগ্রহ বা ধৈর্য কারও মধ্যেই নেই। কয়েকজনকে জোর করে ধরে দাঁড় করিয়ে প্রশ্ন করেও ফল পায়নি কুয়াশা। বেশিরভাগ লোকই একটা কথাই বলে, 'ধ্বংস অনিবার্য! খামোকা আলাপ করে কি লাভ হবে।'

ল্যাবরেটরির খোঁজ পেতে অবশ্য বিশেষ অসুবিধে হলো না। শ'খানেক লোককে প্রশ্ন করার পর একজন লোক দেখিয়ে দিল আঙুল দিয়ে—ওদিকে যান, পাবেন।

শেষ পর্যন্ত সন্ধান মিলল ল্যাবরেটরির। সুদৃশ্য দোতলা বিল্ডিং। প্রকাণ্ড গেট। সবুজ ঘাসে আচ্ছাদিত লন। মোজাইক করা সিঁড়ি। পরিষ্কার, ঝকঝক তকতক করছে চারদিক।

সিঁড়ির মাঝামাঝি উঠে মুখ তুলে তাকাল কুয়াশা। প্রৌঢ় তিনজন লোক ক্লান্ত শরীরে ধীরে ধীরে নিচে নামছে।

কুয়াশা নিশ্চিত হবার জন্যে প্রশ্ন করল, 'এটা ন্যাশনাল সায়েন্স ল্যাবরেটরির একটা শাখা, তাই না?'

'হ্যাঁ। আপনি···?'

কুয়শা বলল, 'আমাকে আপনারা চিনবেন না। আমি একটা ব্যাপারে ল্যাবরেটরিটা ব্যবহার করতে চাই। কার কাছ থেকে অনুমতি নিতে হবে?'

দ্বিতীয় প্রৌঢ় বলল, 'আপনি বিজ্ঞানী?'

কুয়াশা বলল, 'হ্যাঁ।'

প্রথম প্রৌঢ় প্রশ্ন করল, 'ল্যাবরেটরি ব্যবহার করবেন কি উদ্দেশ্যে? আমরাও বিজ্ঞানী, আমাদেরকে বলতে পারেন।'

কুয়াশা বলল, 'মহামারী আকারে যে ঘা দেখা দিয়েছে তার প্রতিষেধক আবিষ্কার করার চেষ্টা করব আমি।'

'ও, পাগল!' প্রথম লোকটা তার অপর দুই সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে সবজান্তার মত মাথা নাড়ল।

কুয়াশা বলল, 'পাগল হলাম কিভাবে? আপনারা এই ঘায়ের বিরুদ্ধে কোন ওষুধ আবিষ্কার করতে পারেননি বলে ধরে নিয়েছেন আর কেউ পারবে না? আপনারা চিকৎসাশাস্ত্রে মাত্র প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করেছেন পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের তুলনায়। আমি পৃথিবীর একজন বিজ্ঞানী।'

তিনজনই ভুরু কুঁচকে চেয়ে রইল কুয়াশার দিকে।

'আপনারা দয়া করে আমার সাথে আসুন। দেখুন আমি পারি কিনা।'

প্রথমজন বলল, 'আমাদের ক্ষমতানুযায়ী আমরা প্রাণপণ চেষ্টা করেছি। ঘায়ের জীবাণু নিয়ে গত পাঁচমাস ধরে আমরা এমন কোন এক্সপেরিমেন্ট নেই যা যাচাই করিনি। আটাশ জন বিজ্ঞানী ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে, এই হয়েছে ফল। এই খানিক আগে মারা গেল পাঁচজন। তাই, পরাজয় স্বীকার করে নিয়ে চলে যাচ্ছি আমরা। সকালে মহামান্য রাজার কাছে রিপোর্ট দেব—আমরা ব্যর্থ।'

কুয়াশা বলল, 'রিপোর্ট আপনারা দেবেন কাল সকালেই, ঠিক। কিন্তু সে রিপোর্ট হবে ব্যর্থতার নয়, সফলতার। আপনারা আসুন আমার সাথে। আপনারা থাকলে আমার কাজ সহজ হবে। আমার সহকারী হিসেবে আপনারা কাজ করবেন।'

শেষ পর্যন্ত রাজি হলো তারা।

সুসজ্জিত, স্বয়ংসম্পূর্ণ একটা ল্যাবরেটরি। সবরকমের কেমিক্যালস, গাছ-গাছড়ার রস, খনিজ পদার্থ, গ্যাস এবং অত্যাবশ্যকীয় যন্ত্রপাতি রয়েছে।

হেড অব দ্য ডিপার্টমেন্টের নাম ড. কায়মনো। অপর দুজন তার সহকারী—ড. যোজনা এবং ড. রেকা। ড. কায়মনোর কাছ থেকে চাবি চেয়ে নিয়ে ল্যাবরেটরির সবগুলো দরজা বন্ধ করে দিয়ে তালা লাগিয়ে দিল কুয়াশা। কায়মনো প্রশ্ন করতে কুয়াশা বলল, 'সফল হওয়া অবধি আমরা কেউ বাইরে বেরুব না। না হই, এখানেই মরব চারজন একসাথে। বাইরে ভাইরাস নিয়ে যেন বেরুতে না পারি সেজন্যেই দরজায় তালা লাগালাম। মনে রাখবেন, আমি যদি ভাইরাসে আক্রান্ত হই তাহলে আমাকেও বাইরে বেরুতে দেবেন না।

কাজ শুরু করল কুয়াশা। দ্রুত প্রশ্ন করে বড় বড় কাঁচের জার এবং পাত্রে সংরক্ষিত তরল পদার্থের নামগুলো জেনে নিল সে।

টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে বিভিন্ন ধর্মের এবং গুণের কেমিক্যালস নিয়ে পরীক্ষা চালাল কুয়াশা। ভাইরাসে আক্রান্ত একজন লোকের দেহ থেকে রক্তের নমুনা সংগ্রহ করে সিরিঞ্জটা পকেটে রেখে দিয়েছিল কুয়াশা। সিরিঞ্জটা বের করল সে। রক্তের নমুনা কাঁচের টিউবে প্রবেশ করাল। পকেট থেকে বের করল একটা রঙিন শিশি। শিশিটা খুলে বেগুনী রঙের তরল পদার্থ ঢালল একটি পাত্রে। আলখাল্লার বিভিন্ন পকেট থেকে বেরিয়ে এল আরও তিন-চারটে শিশি। পয়জন লেখা শিশিগুলো থেকে প্রয়োজন মাফিক তরল পদার্থ ঢেলে নিয়ে বিভিন্ন কেমিক্যালস-এর সাথে মিকশ্চার করতে লাগল।

অবাক চোখে দেখছে প্রৌঢ় তিনজন বিজ্ঞানী কুয়াশার কাজ।

মিনিটের পর মিনিট কেটে যাচ্ছে। নিস্তব্ধ পরিবেশ। বাইরের রাস্তায় ভাইরাসে আক্রান্ত মানুষের বিকট চিৎকার ঢুকছে না সাউণ্ডপ্রুফ দরজা ভেদ করে ল্যাবরেটরির ভিতর। মাঝেমধ্যে বিশেষ কোন নির্দিষ্ট যন্ত্র বা কেমিক্যালসের নাম উচ্চারণ করে হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে কুয়াশা। তিনজন প্রৌঢ় বিজ্ঞানী শশব্যস্ত হয়ে একযোগে হুকুম পালন করার জন্য সক্রিয় হয়ে উঠছে।

কেটে যাচ্ছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। রক্তের নমুনার সাথে রয়েছে ভাইরাস, ঘা-এর কঠিন-প্রাণ জীবাণু। এদেরকে সমূলে ধ্বংস করতে সক্ষম একটা ওষুধ আবিষ্কার করতে হবে। বিভিন্ন বিষাক্ত তরল পদার্থ মিশিয়ে সেই ওষুধ তৈরির একনিষ্ঠ সাধনাতেই মগ্ন কুয়াশা। কাজের প্রতি তার মনোযোগ আর একাগ্রতা দেখলে বুঝতে অসুবিধে হয় না, নিবেদিত প্রাণ তার। এই কাজেই সে উৎসর্গ করেছে নিজেকে।

টিউবের ভিতর রক্তের সাথে ঘা-এর জীবাণু সংখ্যায় লক্ষ কোটি, মাইক্রোসকোপে চোখ লাগিয়ে সেই জীবাণুগুলোকে দেখছে কুয়াশা, দেখছে নতুন করে সবেমাত্র তৈরি ওষুধের প্রভাবে জীবাণুগুলো মরছে কিনা।

মরছে না। গত তিন ঘণ্টায় সাতবার পরীক্ষা চালিয়েছে কুয়াশা। সাতবারই এসেছে ব্যর্থতা।

কিন্তু ব্যর্থতা মেনে নিতে রাজি নয় কুয়াশা। তাই তার কাজেরও বিরাম নেই. সন্দেহ নেই, এ বড় শক্ত জীবাণু। কোনভাবেই এদেরকে ধ্বংস করা যাচ্ছে না।

এই কাজে ঝুঁকির পরিমাণও কম নয়। মারাত্মক একটা বিষ প্রয়োগে এই জীবাণুগুলোকে ধ্বংস করা হয়তো কঠিন কিছু নয়। কিন্তু জীবাণুগুলোকে যে বিষ বা ওষুধ ধ্বংস করবে সেই বিষ বা ওষুধ যাতে মানুষের শরীরে কোনরকম ক্ষতিকর ক্রিয়া করতে না পারে সেদিকেও দৃষ্টি রাখতে হবে। যাতে সাপও মরে লাঠিও না ভাঙে তার ব্যবস্থা করতে হবে।

'রাত তো শেষ হয়ে এসেছে,' হঠাৎ নিস্তব্ধতা ভাঙল ড. কায়মনো।

রেকা হাই তুলল। ধৈর্য এবং উৎসাহ ফুরিয়ে গেছে তার। ক্লান্ত কণ্ঠে সে বলল, 'না, এ অসম্ভব! মি. কুয়াশা, অকারণে খাটছেন। পরাজয় স্বীকার করে নেয়াই ভাল।'

'শাটআপ!' গর্জে উঠল অকস্মাৎ কুয়াশা। অপ্রত্যাশিতভাবে বজ্র কণ্ঠের ধমক খেয়ে চমকে উঠে দু'পা পিছিয়ে গেল তিনজন।

কুয়াশা এখনও আশাবাদী। নিরাশ হতে জানে না সে। পরাজয় বা ব্যর্থতার সাথে পরিচিত নয় সে। ইচ্ছা থাকলে উপায় হবে না কেন? জীবাণু যখন আছে তখন তাকে ধ্বংস করার ওষুধও আছে। উপাদান রয়েছে, সেগুলো একত্রিত করে তৈরি করতে হবে ওষুধ। কাজে ভুল হয়, হবে। কিন্তু চেষ্টার ত্রুটি করলে চলবে না। আধঘণ্টা পর নতুন করে মাইক্রোসকোপে চোখ রাখল কুয়াশা। ডান হাত দিয়ে টিউবের ভিতর প্রবেশ করাল নতুন একটা মিকশ্চার।

দেড় মিনিট পর উন্মাদের মত উল্লাসে ফেটে পড়ল কুয়াশা।

'পেরেছি! পেরেছি! ভাইরাসগুলো মরে গেছে! মি. কায়মনো, আমি সফল হয়েছি। দেখুন, দেখুন—মাইক্রোসকোপে চোখ লাগিয়ে দেখুন আপনারা…!'

অধীর উত্তেজনায় কাঁপছে ড. কায়মনো। এগিয়ে গেল সে। কুয়াশার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। চোখ রাখল মাইক্রোসকোপে।

কয়েক মুহূর্ত পর মাথা তুলল ড. কায়মনো। মুগ্ধ বিস্ময়ে চেয়ে রইল সে কুয়াশার দিকে।

একে একে ড. রেকা এবং ড. যোজনাও দেখল, সত্যি মরে গেছে টিউবের ভাইরাসগুলো।

ড. কায়মনো কুয়াশার কাঁধে হাত রেখে বলে উঠল, 'মি. কুয়াশা, আপনি জানেন না, কি বিপদ থেকে আনতারার মানবজাতিকে আপনি রক্ষা করেছেন। সর্বকালের সেরা বিজ্ঞানী আপনি। আপনি আমাদের নমস্য। আমি আনতারার জাতীয় সায়েন্স ল্যাবরেটরির অধ্যক্ষ, আমি ব্যবস্থা করব যাতে আপনাকে আনতারার সরকার "লা সাফা" অর্থাৎ "সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ"—এই উপাধি গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন। এর আগে কেউ এই উপাধি পাননি।'

কিন্তু কুয়াশার কানে এসব কথা ঢুকছে না। এখনও অনেক কাজ বাকি। ধ্বংস হয়েছে ঠিকই টিউবের ভাইরাস, কিন্তু মানুষের শরীরে এই ওষুধ কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে কি না তা পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

এতক্ষণ নোট বইতে নানারকম আঁকিবুঁকি এঁকেছে কুয়াশা, অঙ্ক কষেছে, প্রয়োজনীয় তথ্য লিখে রেখেছে। সেগুলো গভীর মনোযোগের সাথে আবার পড়ছে সে।

খানিক পর মুখ তুলল কুয়াশা। বলল, 'আমি পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হতে চাই। যে ওষুধ আবিষ্কার করেছি সেটা মানুষের শরীরে ইঞ্জেক্ট করার পর কি প্রতিক্রিয়া হয়, শরীরের রক্তের সাথে মিশে যাওয়া জীবাণুদেরকে কি হারে, কত দ্রুত ধ্বংস করতে সক্ষম তা জানতে হবে আমাকে।'

'কি করতে চান তাহলে এখন?' ড. কায়মনো প্রশ্ন করল।

কুয়াশা ঘোষণা করল, 'বাইরে ভাইরাসে আক্রান্ত লাশ-এর শরীর থেকে ভাইরাস বের করে আমি আমার নিজের শরীরে গ্রহণ করব। ঘা ফুটবে, স্বভাবতই, আমার শরীরে। তারপর আমি আমার আবিষ্কৃত প্রতিষেধক গ্রহণ করব শরীরে। ফলাফল কি দাঁড়াবে জানা আছে আমার। ভাইরাসগুলো মারা যাবে, ঘা-ও সেরে যাবে সেই সাথে। চলুন, ড. কায়মনো, ভাইরাস নিয়ে আসি আমরা।'

দরজা খুলে বেরিয়ে গেল ওরা।

খানিক পরই ভাইরাস সংগ্রহ করে ফিরে এল ড. কায়মনো এবং কুয়াশা।

ড. যোজনা বলছিল ড. রেকার উদ্দেশ্যে, 'কিন্তু যাই বলো, এই ঘায়ের কবল থেকে আমরা সবাই বাঁচলেও যা মরলেও তাই। কি লাভ বেঁচে থেকে? ক'দিন? বিপদ কি একটা?'

কুয়াশা এবং ড. কায়মনো ভিতরে ঢুকতে ড. যোজনা চুপ করে গেল।

কুয়াশা ড. যোজনার শেষের কথাগুলো শুনেছে। সে বলল, 'সমস্যা আপনাদের অনেক, অনুমান করতে পারি আমি। কিন্তু সব সমস্যারই সমাধান আছে। ধীরে ধীরে, একটা একটা করে সব সমস্যারই সমাধান করা যেতে পারে। ধৈর্য হারালে কোন লাভ নেই। সমস্যাকে ভয় করলেও কোন লাভ নেই।'

'দরজাটায় তালা লাগিয়ে দিন ড. কায়মনো। শরীরে ভাইরাস গ্রহণের আগে আমি কয়েকটা কথা বলতে চাই। ভাইরাস গ্রহণের পরপরই আমি আমার আবিষ্কৃত ওষুধ গ্রহণ করব শরীরে। আমি শয়তান নই, সুতরাং আমার তৈরি প্রতিষেধকে ত্রুটি থাকতেও পারে। যদি কোনরকম ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটে থাকে, তাহলে হয়তো ভাইরাস ধ্বংস হবে না। ফলে ঘা বাড়তে থাকবে, তীব্র যন্ত্রণায় আমি ছটফট করব। স্মরণ রাখবেন, আমার যাই হোক, যত কষ্টই হোক,—কোন অবস্থাতেই এখান থেকে বেরিয়ে যেতে দেবেন না আমাকে। আমি চাইলেও না। দরকার হলে শারীরিক শক্তি ব্যবহার করে আমাকে বাধা দেবেন। আর একটা কথা। আমার তৈরি এই প্রতিষেধকে যদি কোন রকম গোলমাল থাকে তাহলে সামান্য হিসেবের ভুল বা রাসায়নিক দ্রব্যের পরিমাণ কমবেশি হবার দরুন বা রাসায়নিক পদার্থগুলো ভেজাল হওয়ার ফলেই গোলমাল ঘটে থাকবে। সেক্ষেত্রে সতর্ক ভাবে নতুন করে একই উপাদান মিশিয়ে তৈরি করতে হবে প্রতিষেধক, ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো সংশোধনের জন্য। এই কাজের দায়িত্ব রইল আপনাদের ওপর। আমি সুস্থির থাকতে যদি না পারি তাহলে আমার বদলে কাজটা আপনারা করবেন। আমার অনুরোধ, আপনারা আমার অবস্থা খারাপ দেখলে বিচলিত হবেন না, এখান থেকে পালাবার চেষ্টা করবেন না। আমার নোট বুকে প্রতিষেধক তৈরির ফর্মুলাটা রইল। এবার, হ্যাঁ, আমি ভাইরাস গ্রহণ করব।'

কুয়াশা সিরিঞ্জটা প্রবেশ করাল নিজের বাঁ বাহুতে। এতটুকু কাঁপছে না তার হাত। কয়েক সিসি ভাইরাস ধীরে ধীরে প্রবেশ করল কুয়াশার শরীরে, মিশে গেল সারা শরীরের রক্তের সাথে।

ড. কায়মনো, ড. যোজনা, ড. রেকা—কোটর ছেড়ে তিনজনেরই বেরিয়ে আসতে চাইছে তিনজোড়া চোখ। হাঁ হয়ে গেছে ওদের মুখ বোয়াল মাছের মত।

ড. কায়মনো ঢোক গিলল। হাত দুটো মুষ্টিবদ্ধ তাঁর। অধীর উত্তেজনায় শরীরের মাংসপেশীগুলো টানটান হয়ে গেছে।

শান্ত কুয়াশা। গভীর ধ্যানে নিমগ্ন যেন সে। সুদর্শন মুখের চেহারায় ফুটে উঠেছে অস্পষ্ট একটু হাসি-হাসি ভাব। কপালে মুক্তোর মত লেগে রয়েছে স্বেদবিন্দু। উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোয় দাঁড়িয়ে আছে সে। অচঞ্চল।

টেবিল থেকে দ্বিতীয় সিরিঞ্জটা তুলে নিল কুয়াশা। এটাতে রয়েছে তার আবিষ্কৃত ভাইরাসের প্রতিষেধক।

অটুট নিস্তব্ধতা ল্যাবরেটরির ভিতর।

প্রৌঢ় বিজ্ঞানী তিনজন ঝুঁকে পড়েছে কুয়াশার দিকে। দৃষ্টি এবং শ্রবণেন্দ্রিয় জাগ্রত। দম বন্ধ করে অপেক্ষা করছে তারা।

অপেক্ষার পালা শেষ হলো। কেউ যেন ফুটবলের মত ছুঁড়ে মারল কুয়াশাকে। ঘটনাটা ঘটল চোখের পলকে, এক সেকেণ্ডেরও কম সময়ের মধ্যে। কুয়াশা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে তাকে আর দেখা গেল না। সাত হাত দূরের দেয়ালে গিয়ে ধাক্কা খেলো কুয়াশা। দেয়াল থেকে পড়ল মেঝেতে, মেঝেতে ড্রপ খেয়ে উঠল উপর দিকে, সিলিং-এর প্রায় কাছাকাছি, সেখান থেকে আবার মেঝেতে নামল, ড্রপ খেয়ে তির্যকভাবে, তীরবেগে গিয়ে ধাক্কা খেলো বাঁ দিকে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড় করানো স্টীলের র‍্যাকের সাথে। হুড়মুড় করে র‍্যাক থেকে পড়ে গেল কাঁচের জার, নানা আকার এবং আকৃতির চিনেমাটির পাত্র, বোতল, শিশি। কাঁচের খণ্ডবিখণ্ড টুকরো ল্যাবরেটরির মেঝেতে ছড়িয়ে পড়ল। তরল পদার্থ ভাসিয়ে দিল চারদিক।

কুয়াশাকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না। অবিরাম বিদ্যুৎবেগে লাফাচ্ছে তার দেহটা। হাত-পা কোথায় তার, কি অবস্থায় রয়েছে বোঝার কোন উপায় নেই। দেহটা কুণ্ডলী পাকিয়ে সম্ভবত গোলাকার হয়ে উঠেছে, এর বেশি কিছু অনুমান করারও উপায় নেই।

পাঁচ

রাজধানীর কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত পার্লামেন্ট হাউস। দর্শনীয় স্থান। পৃথিবীর কোথাও এতবড় ভবন নেই, সুতরাং তুলনা দিয়ে এই প্রকাণ্ড ভবনের আকার এবং বৈশিষ্ট্য বোঝানো সম্ভব নয়। পার্লামেন্ট হাউস তিন ভাগে বিভক্ত। অ্যাসেম্বলি হল, রাজপ্রাসাদ এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের বাসভবন।

গ্রাউণ্ড ফ্লোরে অ্যাসেম্বলি হল। আসন সংখ্যা আড়াই হাজার। আরামদায়ক গদি আঁটা প্রতিটি আসনের সামনে একটি করে সুদৃশ্য মাঝারি আকারের টেবিল। টেবিলের উপর নানারকম যন্ত্রপাতির মধ্যে আছে ফোন, ইন্টারকম, ওয়্যারলেস সেট, একাধিক কলিংবেল, হিসেব কষার যন্ত্র, মাইক্রোফোনের মাউথপীস, টেপ রেকর্ডার, মিনি টিভি সেট, হেডফোন ইত্যাদি।

অ্যাসেম্বলি হলটা গোলাকার। মঞ্চটা এক প্রান্তে। মঞ্চের সর্বোচ্চ আসনটা সিংহাসন। সিংহাসনে রাজা বসেন। মঞ্চের ডানদিকে বাঁ দিকে দরজা আছে। এই দরজা দিয়ে রাজা নিজ প্রাসাদে যেতে পারেন, প্রাসাদ থেকে অ্যাসেম্বলি হলে আসতে পারেন।

রাজার নিচের আসনে বসেন প্রেসিডেন্ট। প্রেসিডেন্টের পাশেই ভাইস প্রেসিডেন্ট। এর নিচের আসনে বসেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রীর দুপাশে বসেন মন্ত্রীরা। তাদের নিচে প্রতিমন্ত্রীরা। আড়াইশো প্রদেশের প্রায় আড়াই হাজার প্রতিনিধি বসেন সাধারণ আসনে, মঞ্চের সামনে।

আনতারা পৃথিবীর মতই এককালে শত শত রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল। হাজার বছর ধরে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল রাষ্ট্রগুলো। দার্শনিক, পণ্ডিত, নেতৃবর্গ এবং মনীষীদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় প্রায় শতবর্ষ আগে আনতারার সকল জাতি মিলিত হয়ে একটি মাত্র রাষ্ট্র গঠন করেছে। সেই রাষ্ট্রের নাম, গ্রহের নামানুসারে, আনতারা।

আনতারায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত। রাজা আছেন কিন্তু তিনি শাসক নন। তিনি ন্যায় বিচার এবং অভিভাবকত্বের প্রতীক হিসেবে ক্ষমতায় আসীন। জনসাধারণের ভোটে নির্বাচিত হন প্রধানমন্ত্রী, প্রতিনিধি, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী এবং প্রেসিডেন্ট। জনতার রায়ই এখানে চূড়ান্ত।

পার্লামেন্টের অধিবেশন চলছে বর্তমানে। এখানকার অবস্থাও আনতারার অন্যান্য জায়গার মত। অনিয়ম, নৈরাশ্য, উদ্যমহীনতা বিরাজ করছে চারদিকে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে। প্রশাসনের অস্তিত্ব নেই বললেই চলে।

প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী এবং প্রতিমন্ত্রীরা কেউ উপস্থিত নেই অ্যাসেম্বলি হলে। বিশেষ ক্ষমতা বলে মহামান্য রাজাই এখন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয়েছেন। অধিবেশনের সভাপতিও তিনি।

প্রতিনিধিদের অনেক আসন শূন্য। বড় জোর হাজার খানেক প্রতিনিধি যার যার নির্দিষ্ট আসনে বসে আছে। বেশিরভাগই ঘুমাচ্ছে তারা, কেউ কেউ বই পড়ছে। অধিবেশনের কাজ চলছে ঢিমে তালে, বিশৃঙ্খলভাবে। কেউই বিশেষ মনোযোগ দিয়ে কিছু শুনছে না বা দেখছে না। সবাই ভীষণ বিমর্ষ, বিষণ্ণ।

মহামান্য রাজা স্বয়ং আধবোজা চোখে বসে আছেন সিংহাসনে হেলান দিয়ে। তাঁর সামনের গালিচা পাতা ফাঁকা জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে তথ্য দফতরের সেক্রেটারি। তার হাতে ধরা কাগজ দেখা যাচ্ছে। কাগজে লিপিবদ্ধ রিপোর্ট পড়ছে সেঃ

'গত চব্বিশ ঘণ্টায় তথ্য দফতর মাত্র পঁচাত্তরটি প্রদেশ থেকে খবরাখবর সংগ্রহ করতে পেরেছে। এতে দেখা যাচ্ছে, পঁচাত্তরটি প্রদেশে গত চব্বিশ ঘণ্টায় ঘায়ে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে তিন লাখ তিয়াত্তর হাজার নয়শো এগারো জন। বিষুদা প্রদেশের বারোটা গ্রাম, একটা শহর, যামদানী প্রদেশের চারটে গ্রাম, দুটো শহর, মালাকা প্রদেশের এগারোটা গ্রাম ছয়টা শহর সম্পূর্ণ জনশূন্য হয়ে গেছে ঘা-এর আক্রমণে। এই রোগের কবলে অর্ধেকেরও বেশি মারা গেছে যে-সব শহরে এবং গ্রামে সেগুলোর নাম···।'

প্রায় দশ মিনিট ধরে পড়ল সেক্রেটারি তার রিপোর্ট। রিপোর্ট পড়া শেষ করে বিনাবাক্যব্যয়ে নেমে গেল সে মঞ্চ থেকে। অপেক্ষারতদের আসন থেকে মঞ্চে উঠে এল আরেক দফতরের আর এক সেক্রেটারি। তার রিপোর্টে দেখা গেল গত চব্বিশ ঘণ্টায় গোটা দেশে আত্মহত্যা করেছে আশি হাজার লোক এটা আনুমানিক সংখ্যা, প্রকৃত সংখ্যা নাকি এর চেয়ে কয়েকগুণ বেশি হতে পারে।

এরপর একদল বিজ্ঞানী উঠল মঞ্চে। তারা তাদের রিপোর্টে জানাল—সসেমিরা থেকে সসেমরা আকুল আবেদন জানিয়ে বেতার সঙ্কেত পাঠাচ্ছে তাদেরকে বাঁচাবার জন্য। সসেমরা নিজেদের অপরাধ স্বীকার করছে বারবার। এবং তারা বন্দী সতেরোজন বিজ্ঞানীকে মুক্তি দিতে আগ্রহী বলে জানাচ্ছে।

সসেমিরা হলো আনতারার একমাত্র উপগ্রহ, পৃথিবীর যেমন চাঁদ। কিন্তু পৃথিবীর চাঁদে প্রাণের অস্তিত্ব না থাকলেও আনতারার সসেমিরায় সসেম নামের অস্বাভাবিক

মেধাবী এবং প্রতিভাবান একটা জাতি বাস করে।

বিজ্ঞানীদের রিপোর্টের শেষটা এরকম ঃ শনির বলয় দ্রুত ছুটে আসছে সসেমিরার দিকে। আমাদের হিসেব অনুযায়ী আগামীকাল বিকেলে সসেমিরাকে নিয়ে অসীম মহাশূন্যের পথে সৌরজগতের আকর্ষণ অগ্রাহ্য করে শনির এই বিচ্ছিন্ন বলয় ছুটে যাবে। ফলে আনতারা কক্ষচ্যুত হবে সাথে সাথে।

আইন মন্ত্রণালয়ের উচ্চপদস্থ একজন কর্মচারী মঞ্চে উপস্থিত হলো এরপর। তার সাথে বিভিন্ন প্রদেশ থেকে নির্বাচিত তিনজন প্রতিনিধি। একজন প্রতিনিধি একটা প্রস্তাব পাঠ করল।

প্রস্তাবটি এরকম ঃ প্রমাণ পাওয়া গেছে ঘায়ে আক্রান্ত কোন কোন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটতে অস্বাভাবিক বিলম্ব ঘটছে। ঘায়ে আক্রান্ত ব্যক্তির তীব্র, অসহনীয় যন্ত্রণা সম্পর্কে আমরা অবগত। দেখা গেছে কোন কোন ব্যক্তি ঘণ্টাধিক কালেরও বেশি সময় যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছে। এই অস্বাভাবিক কষ্ট সহ্য করা কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। ঘা একবার আক্রমণ করলে মৃত্যু অনিবার্য। একথা আমরা জানি। মৃত্যু যার অবধারিত সে যদি অকারণে কষ্ট ভোগ করতে থাকে তাহলে তার কষ্ট দূর করার উপায় বের করার চেষ্টা করা দরকার আমাদের, আমি তাই মনে করি। আমি প্রস্তাব করছি, ঘায়ে আক্রান্ত ব্যক্তিকে কষ্টের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য ঘা তার শরীরে দেখা দেয়া মাত্র তাকে দ্রুত এবং সহজপ্রাপ্য যেকোন অস্ত্রের সাহায্যে মেরে ফেলার। এতে করে আক্রান্ত ব্যক্তির উপকার করাই হবে…।

মৌখিক ভোট গ্রহণ করা হলো। বেশ কিছু প্রতিনিধি, যারা ঘুমায়নি, হাত তুলে প্রস্তাবের স্বপক্ষে মতামত জানাল। আইন মন্ত্রণালয়ের অফিসার লিখিত প্রস্তাবটা নিয়ে রাজার সামনে গেল।

রাজা অলস ভঙ্গিতে বসে ছিলেন। ধীরেসুস্থে সোজা হয়ে বসলেন তিনি। তারপর কলম তুলে নিয়ে সই করলেন কাগজের উপর।

পাশ হয়ে গেল আইন।

এরপর বিভিন্ন দফতরের অফিসাররা অস্তিত্বহীন-প্রায় প্রশাসনের করুণ চিত্র ফুটিয়ে তুলল তাদের রিপোর্টে। এদিকে, আচমকা, বিকট চিৎকার উঠল প্রতিনিধিদের মধ্য থেকে।

পাশাপাশি দুজন প্রতিনিধি আক্রান্ত হয়েছে ঘায়ে। গোলাপী ঘা ফুটে উঠেছে তাদের শরীরে, দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে শরীরের সর্বত্র। দুজনই যন্ত্রণায় জ্ঞানশূন্য হয়ে দিকবিদিক লাফাচ্ছে। পরপর গুলির শব্দ হলো কয়েকটা।

স্থির হয়ে গেল ঘায়ে আক্রান্ত প্রতিনিধি দুজন। একদল লোক ক্লান্ত পায়ে অকুস্থলের দিকে রওনা হলো। তারা ধরাধরি করে বাইরে নিয়ে চলে গেল লাশ দুটো।

এরপরই অ্যাসেম্বলি হলে প্রবেশ করল চারজন বিজ্ঞানী। তারা চারজনই সোজা মঞ্চে উঠল, উঠে রাজার সামনে দাঁড়াল।

বিজ্ঞানীদের নেতা বিরাট বপু দুলিয়ে শুরু করল ভাষণ। তার হাতে কোন কাগজপত্র নেই। রীতিমত উত্তেজিত সে। কাঁপা গলায় বলে চলেছে একটাই কথা।

'মহামান্য রাজা, প্রতিনিধি ভাইয়েরা, আমরা অবশেষে ভয়ঙ্কর গোলাপী ঘায়ের প্রতিষেধক আবিষ্কার করেছি···বিশ্বাস করুন আপনারা, বিশ্বাস করুন মহামান্য রাজা, আমরা অবশেষে ভয়ঙ্কর গোলাপী ঘায়ের প্রতিষেধক আবিষ্কার করতে পেরেছি। আপনারা প্রমাণ চান, প্রমাণ দেখাব। আশ্চর্য, কেউ শুনছেন না কেন আমার কথা! মহামান্য রাজা, বিশ্বাস করুন···।'

বস্তুতঃপক্ষে কেউই শুনছিল না বিজ্ঞানীদলের নেতার কথা। রাজা তখন ব্যস্ত অন্য কাজে। রাজপরিবারের বার্তাবাহক উপস্থিত হয়েছে মঞ্চে। রাজার পাশে দণ্ডায়মান দেহরক্ষীদের প্রধানের সাথে কথা বলছে সে।

খানিক পর প্রধান দেহরক্ষী রাজার উদ্দেশে সবিনয়ে বলল, 'মহামান্য, দুঃসংবাদ। সংবাদ এসেছে মহামান্য রাজকুমারী ওমেনা আক্রান্ত হয়েছেন ঘায়ে। কিন্তু রাজকুমারীর আবিষ্কৃত যন্ত্রণা উপশমকারী ওষুধের গুণে তিনি সুস্থির আছেন, তবে ঘা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে সারা শরীরে।'

রাজা বললেন, 'আমি আদেশ দিচ্ছি, রাজকুমারীকে মেরে ফেলা হোক!'

'না।'

বজ্রকণ্ঠে প্রতিবাদ জানাল রাজার আদেশের বিরুদ্ধে একটি গুরুগম্ভীর বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর।

এই প্রথম সজাগ হলো উপস্থিত সকলে। যারা ঘুমোচ্ছিল তাদের ঘুম ভেঙে গেল। যারা বই পড়ছিল তাদের হাত থেকে খসে পড়ে গেল বই। রাজার চোখ কপালে উঠল। কার এত বড় বুকের পাটা! তাঁর আদেশের বিরুদ্ধে কথা বলে!

প্রতিবাদ জানিয়েছে মঞ্চে উপস্থিত চারজন বিজ্ঞানীর সর্বকনিষ্ঠ ব্যক্তি। পরনে তার শার্ট, ট্রাউজার, কোট নয়। একটা কালো চাদরে শরীর ঢাকা তার, পা থেকে গলা অবধি। দীর্ঘদেহী, সুদর্শন এই বিজ্ঞানী দৃঢ় পদক্ষেপে রাজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। রাজা ভুরু কুঁচকে দেখছেন বিজ্ঞানীকে।

বিরাট হল ঘরের কোথাও কোন শব্দ নেই। সবাই তাকিয়ে আছে তরুণ বিজ্ঞানীর দিকে অবাক চোখে।

রাজার দেহরক্ষীরা সতর্ক হয়ে উঠেছে। প্রস্তুত তারা যে-কোন পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য।

তরুণ বিজ্ঞানীর চোখ দুটো অদ্ভুত সুন্দর। মায়াময়, যাদুকরী দৃষ্টি তার দুই চোখে।

রাজা গর্জে উঠলেন আচমকা, 'কে হে তুমি। আমার কথার ওপর কথা বলো? জানো, আমি বর্তমানে আনতারার সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী? আমার মুখের কথাই আইন! আমি হুকুম দিচ্ছি, রাজকুমারীকে মেরে ফেলা হবে।'

প্রতিনিধিদের তরফ থেকে আওয়াজ উঠল, 'মহামান্য রাজার কথাই ঠিক! তিনিই বর্তমানে দেশের শাসক। তাঁর কথাই আইন।'

'থামুন আপনারা সবাই,' ধমকে উঠল তরুণ বিজ্ঞানী। তারপর সে রাজার দিকে ফিরল, বলল, 'মহামান্য, আপনি ভুল করছেন। আনতারার কোন অধিবাসী এখন থেকে আর ঘায়ে আক্রান্ত হয়ে মারা যাবে না। আমি গোলাপী ঘায়ের

প্রতিষেধক আবিষ্কার করেছি। যেমন দ্রুত এই ঘা বাড়তে থাকে প্রতিষেধক শরীরে প্রবেশ করালে তেমনি দ্রুত এই ঘা শরীর থেকে মুছে যায়, অদৃশ্য হয়ে যায়। আপনি প্রমাণ চাইলে··· ।'

এমন সময় মঞ্চের একপাশের একটা দরজা সশব্দে খুলে গেল। অপূর্ব সুন্দরী চব্বিশ পঁচিশ বছরের একটি যুবতী মেয়ে চঞ্চল পদক্ষেপে মঞ্চে, রাজার পাশে এসে দাঁড়াল।

যুবতীর দিকে চেয়ে আছে সবাই। এমন রূপ বড় একটা দেখা যায় না। যুবতীর গাল বেয়ে নামছে নোনা জল।

রাজার উদ্দেশ্যে যুবতী বলে উঠল, 'বাবা! আর পারছি না। আপনি আমাকে মারার আদেশ দিন! আমার তৈরি ওষুধ খেয়ে যন্ত্রণা থেকে মুক্ত ছিলাম এতক্ষণ। কিন্তু ওষুধের প্রভাব কেটে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। বাবা, বড় কষ্ট হচ্ছে আমার···এই দেখুন, ঘা কিভাবে বাড়ছে··· ।'

রাজকুমারী তার বুকের কাপড় ফড় ফড় করে ছিঁড়ে ফেলল।

রাজকুমারীর বুক-পেট জুড়ে গোলাপী ঘা দগদগ করছে। ক্রমশ বেড়ে চলেছে সেই ঘা।

রাজা চোখ বন্ধ করলেন। রুদ্ধকণ্ঠে নির্দেশ দিলেন তিনি, 'প্রধান দেহরক্ষী! রাজকুমারীকে গুলি করো!'

'কেউ কাউকে গুলি কোরো না।' তরুণ বিজ্ঞানী প্রধান দেহরক্ষীর চোখে চোখ রেখে বলে উঠল মধুর, মিষ্টি স্বরে।

প্রধান দেহরক্ষীর হাত চলে গিয়েছিল হোলস্টার রাখা আগ্নেয়াস্ত্রের উপর। হঠাৎ সেই হাত ঝুলে পড়ল তার দেহের পাশে, যেন অবশ হয়ে গেছে আচমকা হাতটা।

মহা হইচই শুরু করেছে প্রতিনিধিদের দল। আসন ছেড়ে হাত-পা ছুঁড়ে মঞ্চের দিকে এগিয়ে আসছে কেউ কেউ। তরুণ বিজ্ঞানীর ধৃষ্টতা দেখে সবাই বিক্ষুব্ধ!

তরুণ বিজ্ঞানী ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল প্রতিনিধিদের দিকে। দুই হাত থামতে বলার ভঙ্গিতে শূন্যে তুলে রাখল সে। তার গম্ভীর কণ্ঠস্বর গমগম করে উঠল, 'থামো! যে যেখানে আছো সেখানে দাঁড়াও! এক পা-ও নোড়ো না কেউ! সাবধান! কথা বোলো না কেউ!'

যাদুর মত কাজ হলো। সবাই থমকে দাঁড়াল। সবাই স্তব্ধ হয়ে গেল।

অটুট নিস্তব্ধতা নেমে এসেছে চারদিকে। কারও নিঃশ্বাস পতনের শব্দও শোনা যাচ্ছে না।

সম্মোহিত নেত্রে সবাই চেয়ে আছে তরুণ বিজ্ঞানীর মায়াময় দুটি চোখের দিকে। কারও সাধ্য নেই সেই চোখের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবার।

রহস্যময় এক টুকরো হাসি ফুটল যেন তরুণ বিজ্ঞানীর মুখে। ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল সে। রাজকুমারী মুগ্ধ চোখে দেখছে। ভুলে গেছে সে তার যন্ত্রণার কথা। মনে নেই তার, মৃত্যু আর মাত্র কয়েক মুহূর্ত পরই তাকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে ইহজগত থেকে।

'রাজকুমারী! আমার কাছে এসো তুমি!' তরুণ বিজ্ঞানীর মধুর কণ্ঠস্বর।

সম্মোহিতা রাজকুমারী এক পা দু'পা করে এগিয়ে এল। বিজ্ঞানীর মুখোমুখি হলো। তরুণ বিজ্ঞানী হাত বাড়াল বিশালদেহী দলনেতার দিকে। পকেট থেকে বের করল নেতা একটি হাইপোডারমিক সিরিঞ্জ।

তরুণ বিজ্ঞানী সিরিঞ্জটা নিয়ে চোখের সামনে তুলে ধরে ওষুধের পরিমাণটা দেখল। তারপর আলতোভাবে ধরল রাজকুমারীর একটা বাহু। সিরিঞ্জের নিডলটা প্রবেশ করিয়ে দিল সে রাজকুমারীর বাহুতে।

ইঞ্জেকশন দেয়া শেষ হলো। অপেক্ষার পালা। নিজের হাতের রিস্টওয়াচের দিকে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে আছে তরুণ বিজ্ঞানী।

এক, দুই করে কেটে যাচ্ছে মিনিট। কারও মুখে কোন কথা নেই, কারও চোখে পলক নেই।

ঠিক সাত মিনিট পর তরুণ বিজ্ঞানী কথা বলে উঠল। 'রাজকুমারী, তোমার শরীরে ঘা বলে কোন জিনিস নেই। কিছু যদি মনে না করো, সকলের সামনেই একবার সরাও তো বুকের কাপড়। দেখুক সবাই, দেখো তুমিও, দেখুন, মহামান্য রাজা।'

রাজকুমারী কাপড় সরিয়ে নিজের বুক দেখল। আনন্দে, উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল সে, 'বাবা! বাবা! আমি ভাল হয়ে গেছি! নেই, সত্যি ঘা নেই! ওহ্, বাবা!'

ছয়

বিপদ!

বিপদ এগিয়ে আসছে দেখে বিজ্ঞানীদলের নেতা এবং অপর দুই সহকারী ভয়ে মঞ্চ থেকে লাফ মেরে ছুটল।

তরুণ বিজ্ঞানী কিন্তু নড়েনি মঞ্চ থেকে। হাসছে সে ভরাট গলায়। ছুটে আসছে উন্মাদের মত মঞ্চের দিকে শত শত, হাজার হাজার প্রতিনিধি!

'আমাকে দিন! আমাকে দিন! আমাকে দিন!' সমস্বরে সবাই চেঁচাচ্ছে। ভাইরাস আক্রমণ করার আগেই সবাই প্রতিষেধক নিয়ে মৃত্যু-ভয় থেকে নিষ্কৃতি চায়।

রাজা স্বয়ং দিশেহারা হয়ে উঠলেন। কি যে হলো তাঁর, সিংহাসন থেকে লাফ মেরে পড়লেন তিনি তরুণ বিজ্ঞানীর সামনে।

'আমাকে! আমাকে! ঘা ফুটছে—জলদি ইঞ্জেকশন দাও আমাকে।'

সত্যিই তাই। তরুণ বিজ্ঞানী দেখল রাজার হাতে ঘা ফুটছে। দ্রুত হাতের সিরিঞ্জটা রাজার বাহুতে প্রবেশ করাল সে। অবশিষ্ট প্রতিষেধক রাজার দেহে প্রবেশ করিয়ে সুচটা বের করে নিল। রাজা ব্যগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন নিজের হাতের ঘায়ের দিকে। বাড়ছে ঘা। ক্রমশ বাড়ছে।

'কই! কমছে না কেন! জ্বালা বেড়ে যাচ্ছে যে...'

তরুণ বিজ্ঞানী তখন কথা বলছে ধস্তাধস্তিরত প্রতিনিধিদের উদ্দেশে, 'আপনারা মঞ্চে উঠবেন না। দয়া করে আমার কথা শুনুন। মঞ্চে উঠলে কোন লাভ হবে না।

আমার কাছে ওষুধ নেই। ওষুধ আছে ল্যাবরেটরিতে।'

সবাই স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুনছে তরুণ বিজ্ঞানীর কথা।

'আপনারা অধীর হবেন না। মনে রাখতে হবে, গোটা দেশ আজ বিপদের মধ্যে। আপনাদের ভয় পাবার কিছু নেই। আমি যে ওষুধ আবিষ্কার করেছি তা সহজেই যে কোন বিজ্ঞানী ফর্মুলা দেখে তৈরি করতে পারবেন। আপনারা ড. কায়মনোর সাথে এখুনি ল্যাবরেটরিতে চলে যান। ড. কায়মনো, আপনি মঞ্চে উঠে আসুন। ড. যোজন এবং ড. রেকা, আপনারাও আসুন।'

মঞ্চে উঠে এল বিজ্ঞানী দলের নেতা ড. কায়মনো এবং তার দুই সহকারী।

তরুণ বিজ্ঞানী কুয়াশা বলল, 'আপনারা আমার ফর্মুলা প্রেসে ছাপতে দিন এই মুহূর্তে। হাজার হাজার কপি ছড়িয়ে দিন, বিলি করার ব্যবস্থা করুন দেশের সর্বত্র। সাধারণ কেমিস্টরাও এই ফর্মুলা দেখে ওষুধ তৈরি করতে পারবেন। রেডিও, টি. ভির মাধ্যমে ফর্মুলা প্রচার শুরু করুন। মনে রাখবেন, যত তাড়াতাড়ি এই প্রতিষেধকের কথা মানুষ জানবে তত কম মারা যাবে মানুষ। আপনারা জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি, আপনারা সবাই মিলিতভাবে চেষ্টা করুন বিজ্ঞানী এবং ডাক্তারদেরকে একত্রিত করার, তাদেরকে কাজে লাগাবার।'

রাজা বলে উঠলেন আচমকা, 'সেরে গেছে! ঘা সেরে গেছে আমারও।'

কুয়াশা বলল, 'মহামান্য, আপনি পরবর্তী কর্তব্য সম্পর্কে নির্দেশ দিন।'

প্রতিনিধিদের উদ্দেশে রাজা বললেন, 'আমরা সবাই এই তরুণ অজ্ঞাত পরিচয় বিজ্ঞানীর কাছে কৃতজ্ঞ। আমাদের জীবনের ভয়ঙ্কর বিপদের অন্তত একটি বিপদ থেকে এই প্রতিভাবান বিজ্ঞানী আমাদেরকে রক্ষা করেছে। এখন আমাদের কর্তব্য এই বিজ্ঞানীর আবিষ্কৃত ওষুধ ব্যাপক হারে তৈরি করা এবং সব নাগরিকের জন্য সহজপ্রাপ্য করে তোলা। আপনারা, নির্বাচিত প্রতিনিধিরা, যার যার এলাকায় ফিরে গিয়ে ফর্মুলা অনুযায়ী ওষুধ তৈরি করে জনসাধারণের মধ্যে সরবরাহের ব্যবস্থা করুন। আমি জাতীয় সংসদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করছি অনির্দিষ্টকালের জন্য।'

প্রতিনিধিরা বিদায় নিল। প্রকৃতপক্ষে ড. কায়মনোর নেতৃত্বে সবাই ছুটল ল্যাবরেটরির দিকে।

রাজা তরুণ বিজ্ঞানীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি আমার অতিথি, বিজ্ঞানী! তোমার সম্পর্কে আমি সব কথা জানতে চাই। ভাল কথা, এসো পরিচয় করিয়ে দিই। এ আমার মেয়ে, রাজকুমারী ওমেনা। ওমেনাও একজন বিজ্ঞানী।'

হাত বাড়াল কুয়াশা। করমর্দন করল রাজকুমারীর সাথে। রাজকুমারীর মুগ্ধ দৃষ্টি সারাক্ষণ কুয়াশার মুখের উপর বিছিয়ে রয়েছে।

'এসো সবাই বসি পাশের কামরায়।'

মঞ্চ থেকে পার্শ্ববর্তী দরজা পেরিয়ে একটি সুসজ্জিত কামরায় প্রবেশ করল কুয়াশা রাজার পিছু পিছু।

নরম সোফায় বসল কুয়াশা রাজা এবং রাজকুমারীর মুখোমুখি।

রাজা দেহরক্ষীদের নির্দেশ দিলেন, 'ঠাণ্ডা পানীয় দাও আমাদেরকে।'

ঠাণ্ডা পানীয় পান করে রাজা প্রশ্ন করলেন, 'এবার তোমার পরিচয় দাও, বিজ্ঞানী। কে তুমি? নাম কি তোমার? কোথায় থাকো তুমি? চিকিৎসা বিজ্ঞানে এমন পাণ্ডিত্য কিভাবে অর্জন করেছ—সব বলো আমাকে।'

কুয়াশা হাসতে হাসতে বলল, 'আমার ধারণা একটি কথাতেই আপনার সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি আমি। মহামান্য, আমি আপনাদের আনতারার মানুষ নই। আমি পৃথিবীর বাসিন্দা। আমার নাম কুয়াশা।'

কিন্তু রাজা চমকালেন না এতটুকু, আশ্চর্যও দেখাল না তাঁকে। বললেন, 'আমি সেই রকমই ধারণা করেছিলাম।'

রাজার কণ্ঠস্বর শুনে অবাক হলো কুয়াশা। জিজ্ঞেস করল, 'হঠাৎ বিষণ্ণ হয়ে উঠেছেন আপনি, মহামান্য।'

রাজা বললেন, 'হ্যাঁ। তার কারণও আছে। আনতারাকে ধ্বংসের হাত থেকে কেউ বাঁচাতে পারবে না—সেই কথা ভেবেই।'

কুয়াশা বলল, 'ধ্বংসের হাত থেকে কেউ বাঁচাতে পারবে না মানে?'

রাজা বললেন, 'তুমি পৃথিবীর মানুষ, ডক্টর কৃটজেও পৃথিবীর মানুষ ছিলেন। তিনি শেষ পর্যন্ত তাঁর কাজ শেষ করে যেতে পারেননি। যাক যা বলছিলাম। ওমেনা, তুমিই বরং মি. কুয়াশাকে বলো আমাদের বিপদগুলোর কথা।'

রাজকুমারী বলল, 'সব কথা আপনি যদি জানতে চান তাহলে প্রথম থেকেই বলা ভাল।'

কুয়াশা পায়ের উপর পা তুলে দিয়ে আরাম করে বসল, বলল, 'তাই বলো।'

রাজকুমারী ওমেনা শুরু করল, 'আমাদের এই গ্রহের নাম আনতারা। আনতারার আকার এবং আকৃতি হুবহু পৃথিবীর মত। পৃথিবী যে গতিতে সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘোরে আনতারাও সেই একই গতিতে সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরছে। সূর্যের একদিকে পৃথিবী অপরদিকে আনতারা। আনতারা এবং পৃথিবীর মাঝখানে সারাক্ষণ বিশাল পাঁচিলের মত অবস্থান করছে সূর্য। ফলে পৃথিবীবাসী আনতারা সম্পর্কে, আনতারাবাসী পৃথিবী সম্পর্কে কিছুই জানতে পারেনি এতদিন।'

কুয়াশা বলল, 'জানতে না পারলেও এই রকম একটা গ্রহের অস্তিত্ব থাকতে পারে বলে পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা অনেক দিন থেকে ধারণা পোষণ করতেন। আমরা এই কল্পিত গ্রহের নামও দিয়েছিলাম—টুইন আর্থ।'

রাজকুমারী বলল, 'আমরা পৃথিবী সম্পর্কে সর্ব প্রথম জানতে পারি মাস ছয়েক আগে। আপনাদের পৃথিবী থেকে এক বৃদ্ধ বিজ্ঞানী তাঁর মহাকাশযান নিয়ে আমাদের এই গ্রহে এসে পড়েন। বিজ্ঞানীর নাম ডক্টর কৃটজে। অবতরণের সময় ডক্টর কৃটজের মহাশূন্যযান বিধ্বস্ত হয়। যাক, ডক্টর কৃটজেই সর্বপ্রথম পৃথিবী এবং পৃথিবীর সভ্য মানবজাতি সম্পর্কে আমাদেরকে জানান। কিন্তু এসব অনেক পরের কথা। আমি আগের কথায় ফিরে যাই।'

দম নিয়ে রাজকুমারী আবার বলতে শুরু করল, 'পৃথিবীর মত আনতারারও একটি উপগ্রহ আছে। এই উপগ্রহের নাম সসেমিরা। সসেমিরায় অদ্ভুত এক ধরনের প্রাণী বাস করে। এরা যেমন দয়ামায়া আবেগ বর্জিত তেমনি অকৃতজ্ঞ,

বিশ্বাসঘাতক। দেখতে এরা অক্টোপাশের মত। চলে মাকড়সার মত। গত পনেরো বছর আগেও এরা ছিল বুনো জন্তু-জানোয়ার। কিন্তু এরা নিকৃষ্ট প্রাণী হলেও একটা কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। ভয়ঙ্কর ধারাল এদের ব্রেন। যে-কোন জিনিস একবার দেখলে, জিনিসটার নাড়ি নক্ষত্র সম্পর্কে বিশদ এবং নিখুঁত ধারণা পেয়ে যায়। জ্ঞান অর্জনের এমন অস্বাভাবিক ক্ষমতা সৃষ্টির আর কোন প্রাণীর মধ্যে সম্ভবত নেই। যে-কোন ভাষা মাত্র আধঘণ্টার চেষ্টায় শিখে ফেলতে পারে এরা। ওদের ব্রেনটা অত্যাধুনিক কমপিউটারের চেয়েও হাজারগুণ উন্নত। জ্ঞানকে ওরা খাদ্য বলে মনে করে। জ্ঞানের পিপাসাও ওদের ভয়ঙ্কর। জন্তু-জানোয়ারের মত দিন কাটাচ্ছিল ওরা, কিন্তু আমাদের সংস্পর্শে আসার মাত্র দুই মাসের মধ্যে আমাদের জ্ঞান ওরা হজম করে ফেলে।'

কুয়াশা প্রশ্ন করল, 'তোমাদের সংস্পর্শে ওরা এল কিভাবে?'

রাজকুমারী বলল, 'আজ থেকে পনেরো বছর আগে আমরা একটা রকেট নিয়ে সসেমিরায় প্রাণী আছে কিনা দেখতে যাই। প্রাণী আছে জানার পর পরবর্তী এক বছর ধরে আমরা ওখানে কয়েকটা দালান তৈরি করি। মহাশূন্যের অপরাপর গ্রহ সম্পর্কে গবেষণা এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য আমরা ওখানে একটা রিসার্চ সেন্টার স্থাপন করি। আমাদের সতেরোজন বিজ্ঞানী কাজ করছিলেন ওখানে। মাত্র দুইমাসের মধ্যে সসেমরা আমাদের বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে যাবতীয় জ্ঞান ধার করে হজম করে ফেলে। এবং বন্দী করে আমাদের বিজ্ঞানীদের। সে আজ পনেরো বছর আগের কথা। এরপর বন্দী বিজ্ঞানীদের সাহায্যে এবং নিজেদের অর্জিত জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করে ওরা দ্রুত। সেই বছরই ওরা রকেট যোগে আমাদের আবহাওয়া মণ্ডলে বিষাক্ত একটা গ্যাস ছড়িয়ে দেয়। যার ফলে আনতারার প্রতিটি প্রাণী সন্তানোৎপাদন ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে।'

কুয়াশা সোজা হয়ে বসল, 'বুঝেছি এতক্ষণে! তাই তোমাদের এখানে পনেরো ষোলো বছরের কম বয়েসী ছেলে-মেয়ে একটাও দেখতে পাইনি। তার মানে রোগে, শোকে, জরায়, দুর্ঘটনায় আনতারাবাসীরা স্বাভাবিক হারে মরছে ঠিকই কিন্তু নতুন মানুষ জন্মাচ্ছে না। কি সাংঘাতিক! এর প্রতিকার না করলে যে তোমরা শেষ হয়ে যাবে একদিন! আনতারায় কোন প্রাণীই থাকবে না ভবিষ্যতে।'

রাজকুমারী বলল, 'সসেমরা চায়ও তাই। আগেই বলেছি, ওদের ব্রেন কল্পনার বাইরে ক্ষমতা রাখে। এবং ওদের আদর্শ ও উদ্দেশ্যও ভয়ঙ্কর। নিজেদের অস্বাভাবিক ক্ষমতা সম্পর্কে ওরা সচেতন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে মনে করে ওরা নিজেদেরকে। ওরা ঘোষণা করেছে সসেম জাতি ছাড়া মহাশূন্যের কোথাও কোন প্রাণীর অস্তিত্ব থাকবে না। আনতারাকে জনশূন্য গ্রহে পরিণত করার জন্য ওরা বিষাক্ত গ্যাস ছড়িয়ে দিয়েছে। এরপর ওরা যাবে পৃথিবীতে।'

কুয়াশা আঁৎকে উঠল, 'সে কি!'

রাজকুমারী বলল, 'পৃথিবীতে যাবার কারণও আছে। পৃথিবীর মানুষের অর্জিত জ্ঞান হজম করার উদ্দেশ্য তো আছেই, তাছাড়া অন্যান্য কারণও আছে। সসেমিরা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে দ্রুত, আগামী একশো বছরের মধ্যেই সম্ভবত হিমশীতল হয়ে যাবে

সসেমিরা। সসেমরা তাই অন্য গ্রহে চলে যেতে চায়। যাবার সব রকম প্রস্তুতি শেষ করেছিল ওরা। তৈরি করেছিল মস্ত একটা মহাশূন্যযান। সংখ্যায় ওরা মাত্র আড়াই লাখ। একটি মাত্র মহাশূন্যযানে করে ওদের রওনা হবার কথা ছিল পৃথিবীর উদ্দেশে। তার আগে ভয়ঙ্কর একটা কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলে ওরা। এমন একটা কাণ্ড, যার ফলে সসেমিরা অদৃশ্য হয়ে যাবে, আনতারা কক্ষচ্যুত হবে···।'

'কি করেছে ওরা?'

'রকেটযোগে পারমাণবিক বোমা পাঠিয়ে ভেঙে দিয়েছে ওরা স্যার্টান-এর অ্যাসটারয়েড। শনির বলয়টা এমন কায়দায় ভেঙে দিয়েছে ওরা যে সেই বিচ্ছিন্ন মহাকাশ বলয় দ্রুত বেগে ছুটে আসছে সসেমিরার দিকে। আমাদের হিসেব অনুযায়ী আগামীকাল বিকেল পাঁচটায় সেই অগ্রসরমান বলয় সসেমিরাকে আঘাত হানবে। সসেমিরাকে সাথে নিয়ে সেটা ক্রমশ দুরে সরে যাবে, সৌরজগৎ পেরিয়ে, মহাশূন্যের সীমাহীন রাজ্যে শেষ পর্যন্ত হারিয়ে যাবে সেটা। এর ফলে আনতারা স্বভাবতই, কক্ষচ্যুত হবে।'

আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়াল কুয়াশা। চঞ্চল, উত্তেজিত দেখাচ্ছে তাকে, 'কী বলছ তুমি, রাজকুমারী! এসব যদি সত্যি হয় তাহলে···আনতারা কক্ষচ্যুত হলে গোটা সৌরজগতের প্রতিষ্ঠিত নিয়মকানুন লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে। পৃথিবীও রক্ষা পাবে না শেষ পর্যন্ত। তুমি ঠিক জানো সসেমরা পৃথিবীর উদ্দেশে রওনা হচ্ছে?'

'পৃথিবীতে যাবারই উদ্দেশ্য ছিল ওদের। কিন্তু এখন ওরাও আটকা পড়ে গেছে। ধ্বংস ওদের অনিবার্য। একটি মাত্র মহাশূন্যযান তৈরি করেছিল ওরা। ডক্টর কূটজে সেটা রকেট মেরে ধ্বংস করে দিয়েছেন।'

'সব কথা ব্যাখ্যা করে বলো আমাকে, রাজকুমারী।'

রাজকুমারী বলল, 'ডক্টর কূটজে মাস ছয়েক আগে আমাদের এই গ্রহে আসেন, একথা তো আগেই বলেছি। তিনি আমাদের সমস্যাগুলো জানার পর বলেন সব সমস্যার সমাধান করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তবে মহাশূন্যযান সংক্রান্ত গবেষণায় তিনি কিছু অবদান রাখতে পারেন। আমরা তাঁকে সবরকম সাহায্যের আশ্বাস দিই। তিনি আমাদের একদল বিজ্ঞানীকে সাথে নিয়ে একটা মহাপরিকল্পনায় হাত দেন। মোট বারোটা রকেট তৈরি করেন তিনি। একটি মাত্র রকেট নিক্ষেপ করা হয়। সেই রকেট সসেমদের মহাশূন্যযানকে ধ্বংস করতে সক্ষম হয়েছে। ফলে সসেমিরা থেকে অন্য কোথাও যাবার আর কোন উপায় নেই ওদের।'

'ডক্টর কূটজে বারোটা রকেট তৈরি করেছিলেন কেন?'

রাজকুমারী বলল, 'ডক্টর কূটজের পরিকল্পনা ছিল পারমাণবিক বোমার আঘাতে শনির ধাবমান বলয়কে প্রতিরোধ করা। বলয়টাকে বাধা দিতে হলে সসেমিরা থেকে অপারেশন করা দরকার। তাই সসেমদেরকে কাবু করার জন্য তিনি প্রথমে বোমার আঘাতে ওদের মহাকাশযান ধ্বংস করে দেন। পরিকল্পনার দ্বিতীয় কাজ ছিল সসেমিরায় একটা রকেট স্টেশন স্থাপন করা। স্বয়ংসম্পূর্ণ একটা রকেট স্টেশন তৈরিও করা হয়। কিন্তু তার আগেই ডক্টর কূটজে মারা যান।'

কুয়াশা জানতে চাইল, 'ঘায়ের ভাইরাস সসেমরা কেন ছড়িয়ে দিল আনতারার

আবহাওয়ায়?'

রাজকুমারী বলল, 'সসেমরা ডক্টর কূটজে সম্পর্কে সব কথা জেনে ফেলেছিল। ওদের উন্নতমানের বেতার যন্ত্র এমনই যাদুকরী যে তার মাধ্যমে আনতারার কোথায় কি ঘটছে, কি আলাপ হচ্ছে, সব পরিষ্কার শুনতে পায় ওরা। ডক্টর কূটজের পরিকল্পনার কথাও জানতে পারে ওরা। ফলে ওরা দাবি জানায়—কূটজেকে ওদের হাতে তুলে দিতে হবে। তা না হলে বিষাক্ত ঘায়ের ভাইরাস ছড়িয়ে দেবে ওরা আমাদের আনতারার আবহাওয়া মণ্ডলে। আমরা রাজি হইনি ডক্টর কূটজেকে ওদের হাতে তুলে দিতে। ফলে ওরা ভাইরাস পাঠায়। ভাইরাস পাঠিয়েছে এই খবর শুনে ডক্টর কূটজে তাড়াহুড়ো করে পারমাণবিক বোমাসহ একটা রকেট পাঠান সসেমিরায়। এটা ছিল প্রতিশোধ। ওদের রকেট ধ্বংস হয়ে গেছে। কিন্তু ডক্টর কূটজে ভাইরাসে আক্রান্ত হন ক'দিন পরই। মারা যান তিনি। ফলে মহাপরিকল্পনার কাজ বন্ধ হয়ে যায়। বেশির ভাগ বিজ্ঞানী ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। যাঁরা বেঁচে আছেন তাঁদের যোগ্যতাও ডক্টর কূটজের মত না। ডক্টর কূটজের অসমাপ্ত কাজ শেষ করার মত দক্ষতা আমাদের বিজ্ঞানীদের নেই।'

কুয়াশা পায়চারি করছিল। হঠাৎ থামল সে। বলল, 'বিপদ বড় ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে দ্রুত এগিয়ে আসছে। গোটা সৌরজগৎই ধ্বংস হয়ে যাবে, যদি শনির বলয় সসেমিরাকে ধাক্কা দিয়ে সাথে করে নিয়ে চলে যায়। রাজকুমারী, এ আমি মেনে নিতে পারছি না। পৃথিবী এবং আনতারার মানুষের এই সভ্যতা, কোটি কোটি নিরীহ মানুষের প্রাণ ধ্বংস হয়ে যাবে একটা উগ্র, হিংস্র, অন্যায়ের পূজারী, শয়তান উপাসক নিকৃষ্ট মানবেতর জাতির ষড়যন্ত্রে—এ অসম্ভব!'

কুয়াশা রাজার দিকে তাকাল, 'মহামান্য আপনি অনুমতি দিন! আমি ডক্টর কূটজের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার জন্যে শেষ চেষ্টা করতে চাই।'

রাজা বললেন, 'অনুমতির জন্য ভেব না, কুয়াশা। কিন্তু সময় কোথায় আর? শনির বলয়কে ঠেকানো সম্ভবও নয় যে।'

কুয়াশা বলল, 'অসম্ভব বলে কোনো জিনিস নেই। সবই সম্ভব, যদি চেষ্টা করা হয়। জানি না কতদূর কি করতে পারব আমি। তবে চেষ্টা করে দেখতে চাই একবার। আমাকে আপনাদের রকেট ষ্টেশনে পাঠাবার ব্যবস্থা করুন। যে কজন বিজ্ঞানী বেঁচে আছেন তাঁদেরকে একত্রিত করুন। তাঁরা যেন আমাকে সাহায্য করেন, এই নির্দেশ দিন তাঁদেরকে। আমি পরিকল্পনার অগ্রগতি, সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে চাই।'

রাজকুমারী বলল, 'আপনি আমার সাথেই চলুন। বিজ্ঞানীরা কোথায় আছেন আমি জানি। যাবার পথে ওঁদেরকে তুলে নেব গাড়িতে।'

রাজা উঠে দাঁড়ালেন। কুয়াশার কাঁধে একটা হাত রেখে তিনি বিড়বিড় করে বললেন, 'তোমার প্রশংসা করার ভাষা আমি খুঁজে পাচ্ছি না। প্রার্থনা করি, তুমি আমাদের রক্ষাকর্তা হতে পারো যেন।'

সাত

আণ্ডারগ্রাউণ্ড রকেট স্টেশন। রুদ্ধদ্বার কন্ট্রোলরুম।

কুয়াশা একটা রিভলভিং চেয়ারে বসে আছে। সামনের প্রকাণ্ড টেবিলের উপর বিছানো রয়েছে কমপিউটারের মাধ্যমে নিরূপিত সাঙ্কেতিক ডাটা, ম্যাপ, ইনফরমেশন। এক পাশে রয়েছে মহাশূন্য যানগুলোর ব্লুপ্রিন্ট। টেকনিক্যাল ইনফরমেশন অর্থাৎ রকেটগুলোর স্পীড, ক্যাপাসিটি, ল্যাণ্ডিং সিস্টেম, কাউন্ট ডাউন প্রসেস, ফুয়েল ক্যাপাসিটি, ইত্যাদি সম্পর্কে বিশদ এবং বিস্তারিত তথ্য ছাপার অক্ষরে লেখা রয়েছে একাধিক চার্টে।

কমপিউটর, ক্যালকুলেটর মেশিন রয়েছে কুয়াশার বাঁ দিকে। গভীর মনোযোগের সাথে সবকিছু পরীক্ষা করছে কুয়াশা। রাজকুমারী এবং বারোজন বিজ্ঞানী কুয়াশার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে রয়েছে। কুয়াশা যখন যা চাইছে তাই বাড়িয়ে দিচ্ছে তারা।

দ্রুত কমপিউটরের সুইচ টিপছে কুয়াশা, বোতাম টিপছে, হিসেব করছে ক্যালকুলেটর মেশিনে। ধীরে ধীরে পরিষ্কার ধারণা পাচ্ছে সে গোটা পরিকল্পনা সম্পর্কে।

প্রায় দু'ঘণ্টা পর মুখ তুলল কুয়াশা। হতাশার রেখা তার চোখেমুখে।

'একি কাণ্ড আপনাদের। বারোটা রকেট তৈরি করা হয়েছে অথচ কোনোটাই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। আপনারা যে-সব কাগজ পত্র দিয়েছেন আমাকে সেগুলোতে রকেট পরিচালনা করার বিষয়ে কোনো ডাটা, ইনফরমেশনই নেই। একি পাগলামি।'

রাজকুমারী বলল, 'ডক্টর কূটজে যেমন নির্দেশ দিয়েছিলেন আমাদের টেকনিশিয়ানরা সেই রকমভাবে তৈরি করেছিল রকেটগুলো।'

কুয়াশা বলে উঠল, 'ডক্টর কূটজে তো আর পাগল ছিলেন না। নিশ্চয়ই তিনি রকেটগুলো মহাশূন্যে পাঠাবার জন্যই তৈরি করার কথা ভেবেছিলেন, তাই না? কিন্তু আমার কাছে যে-সব টেকনিক্যাল ডাটা রয়েছে তাতে রকেটগুলো পরিচালনা করার ব্যাপারে কোনো পদ্ধতির উল্লেখ নেই। এমন হতে পারে না।'

সবাই মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগল। কারও মুখে কোন কথা নেই।

কুয়াশা বলল, 'নিশ্চয়ই ডক্টর কূটজে কোন ব্যবস্থা করেছিলেন। রকেটগুলো মহাশূন্যে পাঠাতে হলে ওগুলোকে চালু করতে হবে না?'

রাজকুমারী বলল, 'নিশ্চয়ই হবে।'

কুয়াশা ধমকে উঠল, 'সেক্ষেত্রে কোথাও তার উল্লেখ নেই কেন?'

সবাই চুপ। এই প্রশ্নের উত্তর কারও জানা নেই।

কুয়াশা অধৈর্য স্বরে বলল, 'আমার ধারণা ডক্টর কূটজে রেডিও সিগন্যালের মাধ্যমে রকেটগুলোর পরিচালনা করার কথা ভেবেছিলেন। সেক্ষেত্রে নিশ্চয়ই আলাদা একটা কন্ট্রোলরুম থাকবে। কিন্তু আপনারা এমন কিছু আমাকে দেননি যার ফলে সেই কন্ট্রোলরুমের অস্তিত্ব সম্পর্কে জানতে পারি আমি।'

কেউ কথা বলছে না।

কুয়াশা তাকাল রাজকুমারীর দিকে। তুমি বলেছিলে ডক্টর কূটজে সসেমিরায় স্থাপনের জন্য একটা রকেট লঞ্চিং স্টেশন তৈরি করেছিলেন। কোথায় সেটা? সেটা কি স্বয়ংক্রিয় একটা স্টেশন? স্টেশনটা কি মুভেবল? সেটার টেকনিক্যাল ডাটা, চার্ট ব্লুপ্রিন্ট—কোথায় সব?

প্রৌঢ় একজন বিজ্ঞানী বলল, 'রকেট স্টেশনটা অন্যান্য বারোটা রকেটের মত একটা রকেট। সেটার কাগজপত্র ডক্টর কূটজে তাঁর নিজের কাছে রাখতেন।'

কুয়াশা বলল, 'ওগুলোই দরকার আমার। আমার বিশ্বাস ওই রকেট স্টেশনেই আছে একটা কন্ট্রোলরুম। সেই কন্ট্রোলরুম থেকেই এই বারোটা রকেটকে পরিচালনা করার ব্যবস্থা করেছিলেন ডক্টর কূটজে। এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। রাজকুমারী, রকেট স্টেশন সম্পর্কে যাবতীয় কাগজপত্র চাই আমি।'

রাজকুমারী বিজ্ঞানীদের সাথে আলোচনা করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ডক্টর কূটজে কাগজপত্রগুলো কোথায় রেখেছেন এ বিষয়ে এক-এক জনের এক-এক রকম ধারণা।

যাক, পনেরো মিনিটের জন্যে সম্ভাব্য স্থানে সন্ধান চালাবার জন্য রাজকুমারী ছাড়া সবাই বেরিয়ে গেল।

কুয়াশা হাসিমুখে বলল, 'তোমরা এমন একটা উন্নত জাতি অথচ কয়েকটা সামান্য বিপদের মধ্যে পড়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছ। তোমাদের বিজ্ঞানীরাই ডক্টর কূটজের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করতে পারত। পারেনি মনোযোগের অভাবে, স্থিরতার অভাবে। আসল জিনিসটার খোঁজ না করে এরা বারোটা রকেট কিভাবে পরিচালনা করতে হবে সেই সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামিয়েছে ডক্টর কূটজে মারা যাবার পর। ডক্টর কূটজে যে রকেটগুলো পরিচালনার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করে গেছেন সে খবরই এরা রাখে না।'

'আপনি নিশ্চিত?'

'নিশ্চয়ই। ডক্টর কূটজেকে আমি চিনতাম। তিনি আগের কাজ কখনও পরে করতেন না। রকেটগুলো তৈরি করেছেন অথচ সেগুলো পরিচালনার ব্যবস্থা করেননি—এমন হতেই পারে না।'

রাজকুমারী বলল, 'আপনি আমাদের বিজ্ঞানীদের দোষ দিতে পারেন না। যেখানে জীবনের ধ্বংস অনিবার্য সেখানে মনোযোগ দিয়ে সুস্থিরভাবে কাজ করা সম্ভব নয়।'

'জীবনের ধ্বংস অনিবার্য বলছ কেন? তোমাদের কোনো সমস্যাই তো খুব ভয়ঙ্কর নয়। ভাইরাস-এর ফলে ঘা দেখা দিয়েছিল—চেষ্টা করলে তার প্রতিষেধক আবিষ্কার করা সম্ভব হত তোমাদের দ্বারাও।'

রাজকুমারী বলল, 'আমাদের বিজ্ঞানীরা কেমিক্যালস এবং চিকিৎসা শাস্ত্রে তেমন উন্নত নয় যে...'

কুয়াশা বলল, 'তবু প্রাণ উৎসর্গ করে চেষ্টা করলে সফলতা আসত। দ্বিতীয় বিপদ, সন্তানোৎপাদন ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছ তোমরা, শেষ হয়ে যাচ্ছ গোটা জাতি ধীরে ধীরে। এটা আসলে কোন সমস্যাই নয়। যে বিষাক্ত গ্যাস সন্তানোৎপাদনের

ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছে সেই গ্যাসের প্রভাব থেকে মুক্তি পাবার জন্য চাই মেডিসিন। চব্বিশঘণ্টার চেষ্টাতেই সেই মেডিসিন আবিষ্কার করতে পারি আমি।'

রাজকুমারী বলল, 'তার মানে—আপনি বলতে চাইছেন— আবার আনতারার মেয়েরা সন্তান ধারণ করতে পারবে?'

'কেন পারবে না? বিজ্ঞান কি এই সামান্য সমস্যার সমাধান দেবার মত উন্নতি লাভ করেনি?'

'সত্যি বলছেন? আমি···আমি ঠিক বিশ্বাস করতে পারছি না।'

কুয়াশা হাসল। বলল, 'দাঁড়াও, আগে শনির বলয়টাকে ঠেকাবার ব্যবস্থা করি। এ কাজে যদি সফল হই তাহলে তোমাদের চুনোপুটি বাকি সমস্যাগুলোরও সমাধান করে দিয়ে যাব।'

রাজকুমারী বলল, 'কিন্তু আপনার ঋণ আমরা শোধ দেব কিভাবে?'

কুয়াশা বলল, 'তোমরা পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের তুলনায় অনেক বিষয়ে অনেক পিছিয়ে আছ ঠিক, কিন্তু অনেক বিষয়ে তোমরা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি এগিয়ে গেছ। আনতারা এবং পৃথিবীর মানুষের বুদ্ধি যদি একত্রিত হয় তাহলে কল্পনার চেয়েও বেশি উন্নতি করতে পারবে উভয় গ্রহই। সভ্যতার চরম বিকাশ ঘটবে তাহলে। তোমাদের ব্রেন সত্যি আমাদের ব্রেনের চেয়ে বেশি ক্ষমতার অধিকারী। যেমন, ডক্টর কূটজে তিনটে ভাষা জানতেন। অল্প সময়ের মধ্যে তোমরা প্রায় সবাই তিনটে ভাষাই রপ্ত করে নিয়েছ। এটা একটা অস্বাভাবিক গুণ।'

রাজকুমারী বলল, 'ঠিকই বলেছেন। যে কোন ভাষা আমরা চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে শিখে নিতে পারি।'

কুয়াশা বলল, 'তোমাদের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা, অল্পতেই হাল ছেড়ে দাও তোমরা। আর, তোমাদের ব্রেনকে তোমরা ঠিক মত কাজে লাগাতে সচেষ্ট নও।'

রাজকুমারী বলল, 'ভাল কথা, আপনি পৃথিবী থেকে এলেন কিভাবে? আপনার স্পেস-ক্র্যাফট কোথায়?'

'আমাদের বিজ্ঞান কত উন্নত তার প্রমাণ চাও? দেখো, পৃথিবী থেকে আমি আঠারো কোটি ষাট লক্ষ মাইল অতিক্রম করে তোমাদের এই গ্রহে এসেছি। সূর্য ভেদ করে সূর্যের ভিতর দিয়ে এসেছি আমি। কিন্তু মজা কি জানো, কোন রকেট বা মহাকাশযান নিয়ে আসিনি।'

'তাহলে?'

'পৃথিবীতে এক পাগল বিজ্ঞানী আছে। তার নাম প্রফেসর ওয়াই। এর সম্পর্কে সব কথা পরে বলব তোমাকে। এই পাগলা এমন একটা ট্র্যান্সমিটার যন্ত্র তৈরি করেছে যার দ্বারা বস্তু বা মানুষকে ট্র্যান্সমিট করা যায়। অর্থাৎ রেডিও বা টেলিভিশনের মত একটা ব্যাপার। রেডিও শব্দ ট্র্যান্সমিট করে, টেলিভিশন ছবি ট্র্যান্সমিট করে, কিন্তু এই পাগলার ট্র্যান্সমিটার যন্ত্র ম্যাটার ট্র্যান্সমিট করতে পারে। কোনও কারণে পাগলা প্রফেসর ওয়াই আমার ওপর রেগে গিয়ে পৃথিবী থেকে আমাকে তোমাদের এই গ্রহে পাঠিয়ে দিয়েছে। তার ধারণা আমি কোনদিন পথিবীতে ফিরে যেতে পারব না।'

'ভাগ্যিস আপনাকে পাঠিয়েছিল! আপনি না এলে আমরা নির্ঘাৎ ধ্বংস হয়ে যেতাম।'

কুয়াশা বলল, 'ধ্বংস শুধু তোমরা হতে না, আমরাও হতাম। কিন্তু, কথা হলো, ধ্বংস আমরা হব না সে-কথাও তো বলা যায় না এখনও জোর করে। শনির বলয়কে প্রতিরোধ করা যদি অসম্ভব হয়?'

রাজকুমারী বলল, 'আশার কথা বলুন আপনি। নিরাশার মধ্যে ডুবে ছিলাম আমরা, তলিয়ে যাচ্ছিলাম গোটা জাতি। আপনি আমাদেরকে আশার আলো দেখিয়েছেন। এখন আর নিরাশার কথা শুনতে চাই না। আমরা আবার বাঁচতে চাই। আপনি আমাদেরকে বাঁচাবার চেষ্টা করুন।'

কুয়াশা হাসল। বলল, 'চেষ্টা তো অবশ্যই করব। কিন্তু সফলতা আসবে কিনা কে জানে।'

তিনজন বিজ্ঞানী প্রবেশ করল কন্ট্রোলরুমে ছুটতে ছুটতে। কুয়াশার সামনে এসে দাঁড়িয়ে হাপরের মত হাঁপাচ্ছে তারা।

কুয়াশা কোন প্রশ্ন করল না। একজনের হাতে নানা সাইজের নানা ধরনের কাগজপত্র দেখল সে। হাত বাড়িয়ে সেগুলো নিয়ে একটা একটা করে বিছিয়ে নিল টেবিলের উপর।

আবার কাজে নিমগ্ন হয়ে পড়ল কুয়াশা।

প্রায় এক ঘণ্টা পর আচমকা টেবিল থেকে মুখ তুলে কুয়াশা ভরাট কণ্ঠে হোঃ হোঃ করে হাসতে শুরু করল।

রাজকুমারী এবং বিজ্ঞানীরা হতবাক। কি ব্যাপার! কথা নেই বার্তা নেই হঠাৎ এমন পাগলের মত হাসি কেন? এত বড় বিজ্ঞানী কি শেষ পর্যন্ত উন্মাদ হয়ে গেল?

কুয়াশা হাসি থামিয়ে বলল, 'আমাকে সবাই পাগল ভাবছেন, তাই না? কিন্তু পাগল আমি নই, পাগল আপনারা!'

রাজকুমারী বলে উঠল, 'কেন?'

কুয়াশা বলল, 'কেন?' আবার সেই ভরাট গলায় উচ্চকণ্ঠে হাসতে শুরু করল কুয়াশা।

খানিক পর থামল তার হাসি। বলল, 'ডক্টর কুটজে কোন কাজই অবশিষ্ট রেখে যাননি। মারা যাবার আগে তিনি তাঁর দায়িত্ব পালন করে গেছেন। রকেট স্টেশনটা স্বয়ংসম্পূর্ণ। ওটাকে শুধু সসেমিরায় নিয়ে যেতে হবে। ওই রকেট স্টেশনের ভিতরই আছে কন্ট্রোলরুম। সেই কন্ট্রোলরুম থেকে পরিচালনা করা যাবে এখানকার বারোটা রকেটকে। কাজ বাকি আছে শুধু একটাই।'

'কি সেটা?' সমস্বরে জানতে চাইল সবাই।

'বারোটা রকেটের জন্য তৈরি করা আছে বারোটা পারমাণবিক বোমা। সেই বোমাগুলো বারোটা রকেটের ভিতর নির্দিষ্ট স্থানে বসিয়ে দিতে হবে। মাত্র কয়েক ঘণ্টার কাজ।'

'কিন্তু সসেমিরায় রকেট-স্টেশন নিয়ে যাবে কে! সসেমরা অবশ্য চব্বিশ ঘণ্টা

বিরামহীনভাবে আমাদের সাহায্য চাইছে ওদেরকে রক্ষা করার জন্য। কিন্তু বড় বিশ্বাসঘাতক ওরা। যে যাবে তাকেই ওরা বন্দী করে রাখবে। শুধু তাই না, রকেট স্টেশনটাও দখল করে নেবে ওরা।'

কুয়াশা বলল, 'ওরা যদি সত্যি বিপদে পড়ে থাকে তাহলে এখান থেকে যে রকেট-স্টেশন নিয়ে যাবে তার কোন ক্ষতি করার চেষ্টা করবে না। কেউ যাক বা না যাক, সসেমিরায় আমি যাব। ওদের সম্পর্কে অনেক কথা শুনেছি, দেখতে চাই স্বচক্ষে। তাছাড়া যেতে এমনিতেও হবে। ওখান থেকেই কেবল শনির বলয়কে প্রতিরোধের চেষ্টা করা সম্ভব।'

রাজকুমারী কি যেন বলতে যাচ্ছিল, কুয়াশা বাধা দিয়ে বলল, 'কোন কথা নয়। আমি এখন থেকে ঠিক চারঘণ্টা পর রওনা হব সসেমিরার উদ্দেশে। রাজাকে এ ব্যাপারে তুমি সব জানাবার ব্যবস্থা করো। বারোটা রকেট নিক্ষেপ মঞ্চেই আছে, সুতরাং কাজ তেমন বাকি নেই। শুধু বোমাগুলো ওঠাতে হবে রকেটের ভিতর। এ কাজটা আমি তোমাদের সকলের সাহায্যে এই চারঘণ্টার মধ্যেই সেরে ফেলতে পারব।'

রাজকুমারী বলল, 'সসেমদেরকে আপনি চেনেন না। ওরা আমাদের সতেরো জন বিজ্ঞানীকে পনেরো বছর ধরে বন্দী করে রেখেছে। আপনাকেও···।'

কুয়াশা বলল, 'সতেরো জন বিজ্ঞানীকে আমি মুক্ত করে আনব। ওদেরকে আমি চিনি না, সত্যি কথা। চিনি না বলেই তো চিনতে চাই। আর আমাকে বন্দী করবে, বলছ? সম্ভব নয়। আমাকে বন্দী করে রাখার মত শক্তি কারও নেই।'

আট

পরদিন বেলা দুটোর সময় সসেমিরায় রকেট-স্টেশন নামল কুয়াশাকে নিয়ে। বেতার সঙ্কেত পাঠিয়ে সসেমদেরকে আগেই জানিয়ে দেয়া হয়েছিল কুয়াশার অভিযানের কথা। রকেট অবতরণের স্থান নির্দিষ্ট করা হয়েছিল সেই সময়।

সসেমিরার আবহাওয়া মণ্ডলে প্রবেশ করার পূর্ব মুহূর্তে রকেটের গতি শ্লথ করে ঘণ্টায় মাত্র তিনশো মাইলে নামিয়ে আনল কুয়াশা। খানিক পর গতি আরও কমাল।

প্রকাণ্ড মাঠে সসেম সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারী এবং সেনাবাহিনীর তিন প্রধানকে নিয়ে উপস্থিত রয়েছে প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং। বড়সড় একটা মঞ্চের সামনে নামল কুয়াশার রকেট।

সসেমবাসীরা আটটা হাত-পা সহযোগে তালি দিয়ে স্বাগত জানাল কুয়াশাকে। আরও কয়েক মিনিট পর কেবিনের জানালা খুলে নিচের দিকে তাকাল কুয়াশা। কুয়াশাকে দেখে সেনাবাহিনীর তিন প্রধান এবং প্রধানমন্ত্রী স্যালুট করল সম্মান দেখিয়ে।

রাজকুমারী বলে উঠল পাশ থেকে, 'ভক্তিতে একেবারে গদগদ ভাব দেখাচ্ছে ওরা। লক্ষণ ভাল নয়। নিশ্চয়ই কোন কুমতলব এঁটেছে।'

রাজকুমারীকে এই বিপদসঙ্কুল অভিযানে নিয়ে আসতে চায়নি কুয়াশা। কিন্তু

এমন জেদ ধরল যে শেষপর্যন্ত কুয়াশা সাথে আনতে বাধ্য হয়েছে।

'কন্ট্রোলরুমে যাও তুমি। দরজা খুলে দিয়ে বোতাম টিপে নামিয়ে দাও এলুমিনিয়ামের সিঁড়ি। ওদের প্রতিনিধিরা উঠে আসুক ওপরে।'

কেবিন থেকে কন্ট্রোলরুমে গিয়ে প্রবেশ করল রাজকুমারী।

কুয়াশা অনেক নিচের সসেমদের দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে। একেবারে মাকড়সার মত দেখতে সসেমরা। আটটা পা। পাগুলোই হাতের কাজ করে। দেহটা শসার মত, একপ্রান্তে ফুটবলের মত বড়সড়, খয়েরী রঙের মাথা। মাথার একপাশে দুটো হলুদ মণিবিশিষ্ট চোখ। পাগুলো কালো এবং বড় বড়, খাড়া খাড়া লোম গজিয়ে রয়েছে। দূর থেকে দেখে কুয়াশার মনে হলো ওদের শসার মত শরীরগুলো ভিজে ভিজে, পিচ্ছিল তরল পদার্থের প্রলেপ দেয়া। লেজ আছে, তবে মাত্র আধ হাতের মত লম্বা। কারও পরনেই কাপড়-চোপড়ের কোন বালাই নেই।

সসেমদের চেহারা দেখে গা ঘিন ঘিন করে উঠল কুয়াশার। সত্যি কথা বলতে কি, চেহারার দিক থেকে সসেমরা আসলেই কুৎসিত।

নেমে গেছে স্বয়ংক্রিয় সিঁড়ি। সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসছে আট পা বিশিষ্ট চারটে সসেম।

খানিকপর জানালার কাছ থেকে সরে এল কুয়াশা। কন্ট্রোলরুমে গিয়ে একটা চেয়ারে বসল সে দরজার দিকে মুখ করে। একমিনিট পরই রাজকুমারী দরজার কাছ থেকে ঘোষণা করল, 'ওঁরা এসেছেন।'

কন্ট্রোলরুমে প্রবেশ করল চারটে বিরাটাকার মাকড়সা। কুয়াশার মুখোমুখি পাশাপাশি দাঁড়াল তারা। ডান দিক থেকে সব চেয়ে বড় মাকড়সাটা বলে উঠল পরিষ্কার বাংলায় অনেকটা যান্ত্রিক স্বরে, 'আমি সসেমিরার প্রধানমন্ত্রী, মহামান্য পৃথিবীবাসী মি. কুয়াশা, আপনি আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন। আপনি মানবজাতির গর্ব। আপনি আমাদেরকে অবধারিত ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে এসেছেন বলে আমরা আনন্দিত এবং উল্লসিত।'

কুয়াশা বলল, 'ধন্যবাদ।'

মাকড়সাদের প্রধানমন্ত্রী বলল, 'এবার আমি পরিচয় করিয়ে দিই আমাদের তিন বাহিনীর প্রধানের সাথে। ইনি আমাদের স্থল বাহিনীর প্রধান মেজর জেনারেল কোরোলা কেংখাব, ইনি আমাদের নৌবাহিনীর প্রধান ভাইস অ্যাডমিরাল লাম্বা লাম্পা চোক এবং ইনি আমাদের বিমান বাহিনীর প্রধান, এয়ার ভাইস মার্শাল চেগা ডেগা বুম! মহামান্য পৃথিবীবাসী কুয়াশা, এবার আপনি আপনার কাজ শুরু করুন। স্যাটার্ন-এর বলয় এখন থেকে দু'ঘণ্টা চল্লিশ মিনিট তিরিশ সেকেণ্ড পর আঘাত হানবে সসেমিরায়। সুতরাং দেরি করা উচিত হবে না।'

কুয়াশা বলল কিন্তু আগে আমাদের শর্ত পূরণ করুন আপনারা। আনতারার বন্দী বিজ্ঞানীদেরকে মুক্তি দিন। তাদের সবাইকে আগে পাঠান এই রকেটে। তা না হলে আমি কাজে হাত দেব না।

মাকড়সাদের প্রধানমন্ত্রী সাথে সাথে উত্তরে বলল, 'কিন্তু বন্দী বিজ্ঞানীদেরকে এই মুহূর্তে একত্রিত করে এখানে নিয়ে আসা কোনমতেই সম্ভব নয়। তারা বিভিন্ন

প্রজেক্টে দেশের বিভিন্ন এলাকায় কাজ করছেন। অন্তত বারো ঘণ্টা সময় দিতে হবে। বারো ঘণ্টা পর সবাইকে আপনি এই রকেটে বহাল তবিয়তে পাবেন। আমার কথা অবিশ্বাস করবেন না। এখন ভেবে দেখুন কি করবেন। মনে রাখবেন, শনির বলয় সসেমিরাকে ধ্বংস করলে আপনারা বা আনতারাবাসীরাও ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পাবে না।'

কুয়াশা বলল, 'বিপদ কেটে যাবার পর যদি আপনারা কথা না রাখেন?'

প্রধানমন্ত্রী বলল, 'আমাদেরকে বিশ্বাস করা ছাড়া কোন উপায় নেই আপনার।'

কুয়াশা একমুহূর্ত ভেবে বলল, 'ঠিক আছে। তাই। কিন্তু একটা কথা বলে রাখি। আপনারা যদি কোনরকম বেইমানী করেন তাহলে তার ফল ভাল হবে না।'

মাকড়সাদের প্রধানমন্ত্রী বলল, 'আমরা বেঁচে থাকতে চাই। ইন্টেলিজেন্স এবং নলেজ হজম করতে চাই। বেইমানী কাকে বলে জানি না। ভাল কথা, শনির বলয়কে প্রতিরোধ করবেন আপনি কি উপায়ে?'

কুয়াশা বলল, 'নিজের চোখেই দেখুন কিভাবে কি করি আমি।'

কুয়াশা দেখল মাকড়সারা যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে ঠিক তার নিচে হলদেটে তরল পদার্থ পড়ছে ফোঁটায় ফোঁটায়। সসেমদের দেহ থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে হলদেটে, আঠাল পদার্থ। দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াল কুয়াশা।

রাডার এবং ট্র্যান্সমিশন সেটের সামনে গিয়ে বসল কুয়াশা। ইন্সট্রুমেন্ট প্যানেলের সামনে একটা হেডফোন পড়ে রয়েছে। ওয়্যারলেস সেটের। বোতাম টিপে রাডারে চোখ রাখল কুয়াশা।

আট পায়ে থপ-থপ, থপ-থপ করে এগিয়ে এসে সসেমরা দাঁড়াল কুয়াশার পাশে।

রাডারের পর্দায় ফুটে উঠল ছোট্ট একটা কালো বিন্দু।

কুয়াশা বলল, 'দেখছেন তো? ওই কালো বিন্দুটাই হলো শনির বিচ্ছিন্ন, অগ্রসরমান বলয়। ওটা আপনাদের সসেমিরার চেয়েও কয়েক শতগুণ বড়। ঘণ্টায় আশি হাজার মাইল বেগে ছুটে আসছে।'

মাকড়সাদের বিমানবাহিনীর প্রধান চেগা ডেগা বুম বলে উঠল, 'জানি আমরা।' ধমকে উঠল কুয়াশা, 'সাবধান, কথা বলবেন না। যা বলব শুনবেন শুধু।'

প্রধানমন্ত্রী বলল, 'ঠিক আছে।'

কুয়াশা আর একটা বোতাম টিপে দ্বিতীয় রাডারে চোখ রাখল। দ্বিতীয় রাডারের পর্দায় ফুটে উঠল টিভির মত ছবি। বারোটা রকেট মঞ্চে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রয়েছে।

কুয়াশা বলল, 'আনতারার দৃশ্য এটা। রকেটগুলো দেখছেন তো? ওগুলো প্রত্যেকটি পারমাণবিক বোমা দিয়ে সজ্জিত। এই রকেটগুলোই শনির অগ্রসরমান বলয়ে গিয়ে আঘাত হানবে। পারমাণবিক বোমার আঘাতে শনির বলয় শুধু গতিহীন হয়ে পড়বে যে তা নয়, যে পথে যেখান থেকে ওটা আসছে সেই পথে, সেখানেই ফিরে যাবে ওটা!'

'গুড। গুড।'

প্রধানমন্ত্রী এবং তিনবাহিনীর প্রধান একযোগে বলে উঠল।

কুয়াশা বলল, 'গুড তো ইংরেজি শব্দ। আপনারা পৃথিবীর ভাষা শিখলেন কি ভাবে?'

মাকড়সাদের প্রধানমন্ত্রী যান্ত্রিক স্বরে বলল, 'পৃথিবীর দুই শত পঁচাত্তরটিরও বেশি ভাষা আমরা সবাই জানি। আমাদের বেতার যন্ত্র পৃথিবীর সব শব্দ গ্রহণ করতে সক্ষম। আমরা আপনাদের কথাবার্তা শুনে শুনে ভাষাগুলো শিখে ফেলেছি।'

অবাক হয়ে চেয়ে রইল কুয়াশা।

'কাজ করুন।' প্রধানমন্ত্রী স্মরণ করিয়ে দিল কাজের কথা।

ইন্সট্রুমেন্ট প্যানেলের যন্ত্রপাতি নাড়াচাড়া করল কুয়াশা। ট্র্যান্সমিটার যন্ত্রের বোতাম টিপল খট খট করে কয়েক ডজন। হাতল ঘোরাল, হুইলের মত গোলাকার দেখতে একটা ইস্পাতের চাকা বেরিয়ে এল একটা ফোকর থেকে, সেটা ঘুরিয়ে দিল বন বন করে। কুয়াশার দৃষ্টি রাডারের দ্বিতীয় পর্দার দিকে। সেদিক থেকে দৃষ্টি না সরিয়েই লম্বা লাল একটা হ্যাণ্ডেল ধরে নিচের দিকে টানল। হ্যাণ্ডেলটা নিচের দিকে নুয়ে পড়তেই রাডারের পর্দায় দেখা গেল—বারোটা রকেট এক যোগে মঞ্চ ত্যাগ করে আকাশে উড়ল।

কুয়াশা কথা বলে উঠল, 'মাত্র পনেরো মিনিট...'

'পনেরো মিনিট তেইশ সেকেণ্ডের মাথায় রকেটগুলো আঘাত হানবে শনির ওই বলয়ে।'

কুয়াশার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বাকি অংশটা পূরণ করল প্রধানমন্ত্রী।

কুয়াশা ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল, 'আপনি জানলেন কি ভাবে?'

'হিসেব কষে। রকেটগুলোর গতিবেগ সম্পর্কে জানি আমরা, জানি শনির বলয় কি গতিতে ছুটে আসছে—সুতরাং রকেট এবং শনির বলয় ঠিক কখন পরস্পরের সাথে মিলিত হবে তা জানা কি আর এমন কঠিন।'

কুয়াশা মনে মনে ভাবল, কী সাংঘাতিক! অঙ্কে এরা কমপিউটারের চেয়েও দক্ষ দেখা যাচ্ছে।

সকলের দৃষ্টি এক নম্বর রাডারের পর্দার দিকে।

ঠিক পনেরো মিনিট তেইশ সেকেণ্ড পর ঘটল ঘটনা। দেখা গেল শনির অগ্রসরমান বলয় প্রচণ্ড ভাবে কেঁপে উঠল পারমাণবিক বোমার আঘাতে। ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে চারদিক। রাডারের পর্দা এক সময় অন্ধকার হয়ে গেল। তারপর ধোঁয়া সরে গেল ধীরে ধীরে।

দেখা গেল শনির বলয় ফিরতি পথে যাত্রা শুরু করেছে। ফিরে যাচ্ছে স্বস্থানে। ছোট্ট কালো বিন্দুটা একচুল একচুল করে সরে যাচ্ছে রাডারের পর্দার উপর দিকে।

কুয়াশা বলল, 'সমস্যার সমাধান হয়ে গেল।'

'হ্যাঁ। আমাদের সমস্যার সমাধান হলো মাত্র! কিন্তু আপনাদের? আপনার?'

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতে গিয়েও পারল না কুয়াশা। তিন আটে চব্বিশটা পা তাকে জড়িয়ে ধরল দু'পাশ থেকে।

তিন বাহিনীর প্রধান তাদের চব্বিশটা পা দিয়ে কুয়াশাকে জড়িয়ে ধরেছে। নিজেকে ছাড়াবার জন্য হাত-পা ছুঁড়ছে কুয়াশা।

হাঃ হাঃ করে হাসছে প্রধানমন্ত্রী। সে তার আট পা দিয়ে জড়িয়ে ধরে রেখেছে রাজকুমারী ওমেনাকে।

হাসি থামিয়ে মাকড়সাদের প্রধানমন্ত্রী বলল, 'ওহে, মি. কুয়াশা, লম্ফঝম্ফ দেবার চেষ্টা করে লাভ নেই। তুমি আমাদের বন্দী হয়ে বেশ মজাতেই থাকবে সসেমিরায়, যা চাও পাবে। বদলে কাজ করতে হবে আমাদের কথা মত।'

স্থির হলো কুয়াশা। এদের চব্বিশটা লোহার মত পায়ের বাঁধন থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয় বুঝতে পারছে সে। মাকড়সাদের উদ্দেশ্যে সে কঠিন কণ্ঠে বলে উঠল, 'এই বিশ্বাসঘাতকতার সাজা তোমাদেরকে পেতে হবে!'

মাকড়সাদের প্রধানমন্ত্রী বলল, 'বেইমানী, বিশ্বাসঘাতকতা— এইসব শব্দের প্রকৃত অর্থ আমাদের কাছে অন্য রকম। আমরা নলেজ চাই, ইন্টেলিজেন্স চাই। তোমার কাছ থেকে চাইলে তুমি দেবে না। তাই আদায় করার জন্য তোমাকে বন্দী করে রাখব, বাধ্য করব আমাদের কথা মত কাজ করতে। আমাদের উন্নতির জন্যে এটা না করে উপায় নেই। আমাদের সভ্যতার বিকাশ ঘটাবার স্বার্থে আমরা এটা করতে বাধ্য। এরমধ্যে অন্যায় তো কিছু দেখি না।'

বিমান বাহিনী প্রধান চেগা ডেগা বুম বলল, 'আমরা সসেমিরা থেকে পৃথিবীতে যাব। ডক্টর কূটজে আমাদের রকেট ধ্বংস করে দিয়েছে। ডক্টর কুয়াশা, তুমি, আমাদেরকে রকেট তৈরির ব্যাপারে সাহায্য করবে। আমরা পৃথিবীতে যাব। তোমাদের নলেজ এবং ইন্টেলিজেন্স আমরা খেয়ে ফেলব, হজম করে নেব। তারপর পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেব বিষাক্ত গ্যাস। পৃথিবীর মানুষ সেই গ্যাসের প্রভাবে শেষ হয়ে যাবে। তারপর ওখান থেকে আমরা যাব অন্য এক গ্রহে। সেখানেও আমরা বেশি দিন থাকব না। মহাশূন্যে শত শত গ্রহে কোটি কোটি প্রাণী রয়েছে। আমরা তাদের জ্ঞান হজম করব এবং তাদেরকে খতম করে দেব। এইভাবে আমরা সীমাহীন মহাশূন্যে ঘুরে বেড়াব, নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব কায়েম করব।'

কুয়াশা মনে মনে আঁৎকে উঠলেও প্রকাশ্যে বলল, 'স্বপ্ন দেখছ তোমরা। মাথা খারাপ হয়ে গেছে তোমাদের। ব্রেন তোমাদের যতই শক্তিশালী হোক, তোমরা নীতিহীন, আদর্শহীন। শুধু এই কারণেই তোমাদের ধ্বংস অনিবার্য।'

মাকড়সাদের প্রধানমন্ত্রী বলল, 'নীতিহীন বা আদর্শহীন হলেই কোন জাতি ধ্বংস হতে পারে না। যে জাতির যত বেশি বুদ্ধি, সেই জাতি তত বেশি দিন টিকে থাকবে। তোমরা বা আনতারাবাসীরা বুদ্ধিহীন। তোমরা তাই ধ্বংস হয়ে যাবে।'

কুয়াশা বলল, 'সময় আসুক, প্রমাণ পাবে তোমরা, ধ্বংস কারা হয়।'

মাকড়সার প্রধানমন্ত্রী বলল, 'বড় বেশি চ্যাড়াং চ্যাড়াং কথা বলছ তুমি। আমাদের কেন্দ্রীয় কারাগারে সাতদিন বন্দী থাকবে তুমি। আহার-টাহার দেয়া হবে না। ওখানে বন্দী বিজ্ঞানীরা সবাই আছে। তাদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখো টরচারের প্রকৃতি কি রকম ভয়ঙ্কর আমাদের। আমরা রসায়ন শাস্ত্রে খুব বেশি উন্নত।

একটা ইঞ্জেকশন আবিষ্কার করেছি আমরা, সেটা দিলে তোমার শরীরের ভিতর আগুন জ্বলবে, সত্যি সত্যি আগুন জ্বলবে না, কিন্তু মনে হবে আগুন জ্বলছে, পুড়ে যাচ্ছে ভিতরের হাড়, মাংস, চর্বি—সব। সাতদিন পরও যদি তুমি আমাদের কথা মত কাজ করতে রাজি না হও তাহলে ওই ইঞ্জেকশন দেয়া হবে তোমাকে।'

নয়

রাত বাড়ছে ক্রমশ।

সেলের বাইরে মাকড়সাদের সশস্ত্র সেন্ট্রিরা পাহারা দিচ্ছে।

হাত-পা বাঁধা কুয়াশার। কিন্তু রাজকুমারীকে বাঁধেনি ওরা। দুটো সেলের মাঝখানে কোন দেয়াল নেই। দেয়ালের বদলে মোটা মোটা লোহার রডের প্রতিবন্ধকতা। ওদিকের সেলে ঘুমাচ্ছে আনতারার সতেরোজন বৃদ্ধ বিজ্ঞানী। তারা কেউই কুয়াশা বা রাজকুমারী সম্পর্কে কিছুই জানতে পারেনি এখনও।

অটোমেটিক কারবাইনের মত দেখতে আগ্নেয়াস্ত্র হাতে নিয়ে দু'জন মাকড়সা সেলের বাইরের মেঝেতে বসে আছে।

কুয়াশাকে নড়াচড়া করতে দেখলেই খেঁকিয়ে উঠছে তারা।

মাকড়সার প্রধানমন্ত্রী নির্দেশ দিয়ে গেছে কুয়াশা কোনরকম চালাকি করার চেষ্টা করলেই গুলি করে জখম করতে।

রাত বাড়ছে। ফিসফিস করে কথা বলছে কুয়াশা। রাজকুমারী গভীর মনোযোগের সাথে শুনছে তার কথা।

কুয়াশা বলছে, 'অকারণে ভয় পাচ্ছ তুমি, ওমেনা। এমন মুষড়ে পড়লে চলে নাকি। তুমি দেখো, এরা আমাদেরকে বন্দী করে রাখতে পারবে না। মুক্তির উপায় কি তা আমার জানা আছে। কিন্তু তোমার সাহায্য দরকার হবে। আমার জুতোর ভিতর লুকানো আছে ছোট্ট একটা পেন্সিল। ওটাই আসলে দরকার। ওটা হাতে পেলে আমরা এখান থেকে মুক্ত তো হবই, আনতারাতেও ফিরে যেতে পারব।'

'দূর! আপনার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। একটা পেন্সিল দিয়ে এদের সাথে লড়বেন আপনি?'

কুয়াশা হেসে ফেলল, 'বিশ্বাস করো, ওই পেন্সিলটা দিয়েই আমি লড়ব। সে লড়াইয়ে জিতবও আমি। তুমি শুধু আমার পিছনদিকে গিয়ে শুয়ে পড়ো। ঘুমিয়ে পড়ার ভান করে আস্তে আস্তে খোলার চেষ্টা করো হাতের বাঁধন। খুলতে আমিও পারি পাঁচ মিনিটের মধ্যে। কিন্তু মাকড়সা ব্যাটারা যে নড়তে দেখলেই গুলি করবে। লক্ষ্মী, রাজকুমারী, যা বলছি ঠিক তাই করো এবার। কোন ভয় নেই তোমার। এতটুকু দুশ্চিন্তা কোরো না।'

রাজকুমারী কুয়াশার পিছনে গিয়ে শুয়ে পড়ল। খানিক পরই স্থির হয়ে গেল তার হাত-পা, যেন ঘুমিয়ে পড়েছে অঘোরে।

তিন মিনিটে কুয়াশার হাত বাঁধনমুক্ত হলো। আগেই সে ডান পা দিয়ে বাঁ পায়ের জুতোটা খুলে ফেলেছিল। হাত দুটো মুক্ত হতেই জুতোর ভেতর থেকে

পেন্সিলের মত লম্বা একটা জিনিস বের করে ফেলল।

সশস্ত্র মাকড়সারা অটোমেটিক কারবাইন তুলল কুয়াশার দিকে। পেন্সিলটা লম্বা করে ধরল কুয়াশা। ক্ষুদ্রাকৃতি একটা বোতাম রয়েছে পেন্সিলটার মাঝখানে। সেটায় চাপ দিল।

মাকড়সাদুটোর কারবাইনের ইস্পাতের ব্যারেলসহ হাতলের বেশির ভাগ অংশ চোখের পলকে বাষ্প হয়ে উঠে গেল বাতাসে।

অবাক বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠল রাজকুমারী, 'মাই গড! একি ভোজবাজী!'

কুয়াশা তখন ব্যস্ত সেলের লোহার রডগুলোকে বাষ্পে পরিণত করতে।

'রাজকুমারী, তুমি তোমাদের বিজ্ঞানীদেরকে ঘুম থেকে ওঠাও। সংক্ষেপে ওদেরকে জানাও, আমরা ওদেরকে মুক্ত করে আনতারায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি। তাড়াতাড়ি করো!'

পাশের সেলে গিয়ে চেঁচামেচি শুরু করে দিল রাজকুমারী।

সেলের বাইরে ভয়ানক ছুটোছুটি শুরু হয়ে গেছে। দলে দলে মাকড়সারা ছুটে আসছে কুয়াশার সেলের দিকে। প্রত্যেকের হাতে অটোমেটিক কারবাইন।

কিন্তু সেলের ধারে কাছে ঘেঁষতে পারছে না কেউ। কুয়াশার মিনি লেজার গানের যাদুকরী কারসাজিতে মাকড়সাদের হাতের অস্ত্র, কারও দুটো পা, কারও দেহের শেষ ভাগের আধ হাত লেজ বাষ্প হয়ে উড়ে যাচ্ছে।

যন্ত্রণাকাতর অতিকায় মাকড়সারা বিকট স্বরে চেঁচাচ্ছে।

মাকড়সারা পিছু হটে গেল। সেলের বাইরে একটা মাকড়সাকেও দেখা যাচ্ছে না আর।

রাজকুমারী কুয়াশার পাশে এসে দাঁড়াল হাঁপাতে হাঁপাতে। তার পিছনে সতেরোজন বিজ্ঞানী।

'সবাইকে বুঝিয়ে বলেছি। এখন কি···আমরা কি পারব এখান থেকে পালাতে?'

কুয়াশা বলল, 'আমার পিছু পিছু এসো তোমরা।'

সেল থেকে বেরিয়ে পড়ল কুয়াশা। পিছনে রাজকুমারী এবং বিজ্ঞানীর দল।

সেলের বাইরে বড়সড় একটা চত্বর। সেই চত্বরে বিদ্যুৎ বেগে এসে পড়ল একটা গোলাকার ছয় চাকাওয়ালা গাড়ি। গাড়িটা থামার আগেই কুয়াশা গাড়িটার দিকে তুলে ধরল লম্বালম্বি ভাবে হাতের পেন্সিলটা।

গাড়ি থেকে নামল প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং। উন্মাদের মত কাঁদতে কাঁদতে ছুটে আসছে সে কুয়াশার দিকে।

'সাবধান! আর একপাও এগোবে না।' গর্জে উঠল কুয়াশা।

থমকে দাঁড়াল মাকড়সাদের প্রধানমন্ত্রী। কাঁদকাঁদ কণ্ঠে সে বলে উঠল, 'হে মহামান্য পৃথিবীবাসী মি. কুয়াশা, আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি! দয়া করে আপনি এইবার আমাদেরকে ক্ষমা করুন। আমরা আপনার প্রতি অন্যায় করেছি, তার জন্য যে শাস্তি দেবেন সেই শাস্তি মাথা পেতে নেব। কিন্তু নতুন এই বিপদ থেকে আপনি দয়া করে আমাদেরকে রক্ষা করুন।'

কুয়াশা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল, 'নতুন বিপদ?'

'ভাইরাস! কেমন করে জানি না ল্যাবরেটরি থেকে ছড়িয়ে পড়েছে বাইরে। সসেমরা দলে দলে আক্রান্ত হচ্ছে ভয়ঙ্কর গোলাপী ঘায়ে। মারা যাচ্ছে শয়ে শয়ে। প্রতি মুহূর্তে মারা যাচ্ছে শয়ে শয়ে। এভাবে মরতে থাকলে আমরা আড়াই লক্ষ সসেম দু'দিনেই ধ্বংস হয়ে যাব।'

কুয়াশা হাসল। বলল, 'নিজেদের ফাঁদে নিজেরাই পড়েছ তোমরা।'

প্রধানমন্ত্রী বলল, 'আনতারা থেকে আপনি যখন সুস্থ শরীরে এখানে এসেছেন তখন নিশ্চয়ই আপনি এই ঘায়ের প্রতিষেধক কি জানেন। আপনিই আনতারাবাসীদেরকে রক্ষা করেছেন এই ঘা থেকে। পৃথিবীবাসী মহামান্য মি. কুয়াশা, ক্ষমা করুন আপনি আমাদেরকে।'

কুয়াশা বলল, 'ঠিক আছে। চলুন রকেটে। প্রতিষেধক আছে বটে রকেটে, তবে পরিমাণ খুব বেশি নয়। সব সসেমকে বাঁচানো যাবে না, হয়তো অর্ধেক সসেমকে বাঁচানো যাবে।'

'তাই বাঁচান! দোহাই আপনার। তাই বাঁচান।'

ওদের রকেটে ওরা ফিরে এল সাতেরোজন বিজ্ঞানীকে সাথে নিয়ে। সিঁড়ি বেয়ে মাকড়সাদের প্রধানমন্ত্রীও উঠল।

কন্ট্রোলরুমে ঢুকে প্রধানমন্ত্রী কুয়াশাকে বলল, 'কোথায় আপনার ঘায়ের প্রতিষেধক?'

কুয়াশা রাজকুমারীর উদ্দেশ্যে বলল, 'ওমেনা, আমাদের বিজ্ঞানীদের ইঞ্জেকশন দেবার ব্যবস্থা করো তুমি। ওদেরকে ইঞ্জেকশন দেয়া হয়ে গেলে আমাকে জানাও, কতটা ওষুধ অবশিষ্ট থাকে।'

মাকড়সাদের প্রধানমন্ত্রী বলল, 'কিন্তু আপনি যে বললেন…?'

কুয়াশা বলল, 'রাজকুমারী, সিঁড়ি তুলে নিয়েছ? কেবিনের দরজা বন্ধ করেছ?'

'হ্যাঁ।'

কুয়াশা বলল, 'আমি রকেট নিয়ে মহাশূন্যে উঠছি, সসেমিরা ত্যাগ করছি। এই মাকড়সাটাকে তোমরা সবাই মিলে বেঁধে ফেলো। আর এখান থেকে সরিয়ে স্টোররুমে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দাও। কানের কাছে ঘ্যানর ঘ্যানর করছে বুদ্ধুটা।'

রাজকুমারী এবং কয়েকজন বিজ্ঞানী এগিয়ে গেল মাকড়সাদের প্রধানমন্ত্রীর দিকে।

কুয়াশা বলল, 'তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি কেন জানো? তোমার বিচার একটু অন্যভাবে হওয়া দরকার, তাই। আর সব সসেমদের বিচার হয়ে গেছে, শাস্তি হিসেবে তারা ভাইরাসে আক্রান্ত হবে, দু'দিনের মধ্যেই সবাই মারা যাবে। এর চেয়ে বড় শাস্তি আর কি হতে পারে?'

দশ

জাতীয় উদ্যানে নামল রকেট।

লক্ষ লক্ষ মানুষ অধীর উত্তেজনায় অপেক্ষা করছে। তাদের নব জীবনদাতা পৃথিবীবাসী মহামানব কুয়াশা সসেম জাতিকে ধ্বংস করে দিয়ে ফিরে আসছে আনতারায়।

চারদিকে সে কি উল্লাস! সে কি আনন্দ ধ্বনি!

সিঁড়ি বেয়ে নামছে কুয়াশা। তার পিছনে রাজকুমারী। রাজকুমারীর পিছে সতেরোজন বৃদ্ধ বিজ্ঞানী। পনেরো বছর পর বন্দী অবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে নিজেদের গ্রহে ফিরে এসেছে তারা।

লক্ষ লক্ষ জনতা হাত নেড়ে, বাতাসে টুপি উড়িয়ে লাফাতে লাফাতে আনন্দ প্রকাশ করছে।

মঞ্চের উপর রাজা এবং নবনিযুক্ত প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রীরা অপেক্ষা করছেন।

কুয়াশা উঠে এল মঞ্চে। রাজা প্রথমে, তারপর প্রধানমন্ত্রী, তারপর মন্ত্রীরা মাল্যভূষিত করল কুয়াশাকে।

প্রধানমন্ত্রী লাউডস্পীকারের মাউথপীসের সামনে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিলেন। অবশেষে তিনি আনতারার সর্বশ্রেষ্ঠ উপাধি—'সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব' দান করে কুয়াশাকে সম্মানিত করার প্রস্তাব দিলেন। জনতা দুই হাত তুলে সোল্লাসে সমর্থন জানাল।

প্রধানমন্ত্রী মূল্যবান পাথর খচিত স্বর্ণের কণ্ঠহার পরিয়ে দিল কুয়াশার গলায়।

আনুষ্ঠানিক ভাবে কুয়াশাকে আনতারার নাগরিকত্ব দান করা হলো।

অনুষ্ঠান শেষে কুয়াশা রাজার উদ্দেশে বলল, 'আপনাদের আর একটি মাত্র সমস্যা আছে। সন্তানোৎপাদন ক্ষমতা ফিরে পেলেই আপনারা বিপদমুক্ত হতে পারেন। সসেমিরা থেকে ফেরার পথে আমি গবেষণা করে এই রোগের ওষুধ আবিষ্কার করে ফেলেছি। ওষুধ তৈরির ফর্মুলাটা রাজকুমারীর কাছে আছে। মহামান্য রাজা, মি. প্রেসিডেন্ট এবং আনতারার বন্ধু এবং ভাইয়েরা,—এবার আমাকে বিদায় দিন! পৃথিবীতে আমি অনেক কাজ ফেলে এসেছি। আমার আত্মীয় বন্ধু, এবং লাখো লাখো দুঃখী, গরীব ভাইয়েরা বিপদের মুখে পড়ে আছে। তাদের জন্যে আমার হৃদয় বিষণ্ণ হয়ে পড়েছে। আমি এখুনি আপনাদের কাছ থেকে বিদায় চাই।'

রাজা বললেন, 'তা হয় না। আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে ঠিক করেছি, আপনাকে আনতারায় স্থায়ীভাবে থেকে যাবার প্রস্তাব দেব। মি. কুয়াশা, আপনি আমাদের কাছ থেকে সম্মান, ভালবাসা, আরাম, ক্ষমতা—সব পাবেন। আনতারা যদি আপনার মত গুণী, প্রতিভাবান বিজ্ঞানী পায় তাহলে অল্প সময়ের মধ্যেই উন্নতির চরম পরাকাষ্ঠা দেখাতে পারবে। আপনাকে আমরা হারাতে চাই না।'

কুয়াশা গম্ভীর মুখে বলল, 'তার মানে? আপনারা কি আমাকে আনতারায় বন্দী

করে রাখতে চান?'

রাজা হাসলেন, 'মি. কুয়াশা, ভুল বুঝো না আমাদেরকে। আনতারাবাসী চাইছে তুমি তাদের সাথে থাকো।'

কুয়াশা বলল, 'সেটা সম্ভব নয়। পৃথিবীতে আমার অনেক কাজ। পৃথিবীবাসীর কথা ভুলে আমি এখানে থেকে যাব—এও কি সম্ভব? আপনারা পাগলামি করছেন। আমাকে বিদায় নিতে দিন।'

প্রধানমন্ত্রী বলল, 'তা হয় না।'

'তার মানে আমি বন্দী?'

প্রধানমন্ত্রী বলল, 'দুঃখের সাথে জানাচ্ছি,—হ্যাঁ। আপনার মত বিস্ময়কর প্রতিভাকে আমরা পেয়েও হারাতে রাজি নই।'

গভীর রাত। কোথাও কেউ জেগে নেই।

বন্দী কুয়াশা হাসছে আপনমনে। কিন্তু তার এ হাসি দুঃখের হাসি। উপকার করার কি ফল! গোটা জাতটাকে অনিবার্য ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার বিনিময়ে বরণ করতে হলো বন্দীত্ব।

রাজ প্রাসাদেরই একটা আরামদায়ক কামরায় বন্দী করে রাখা হয়েছে কুয়াশাকে। কেড়ে নেয়া হয়েছে ওর কাপড়চোড়, জুতো, অস্ত্রশস্ত্র।

মুক্তির উপায় কি?

ভাবছে আর ভাবছে কুয়াশা। কামরার চারদিকে পাথরের দেয়াল। একটি মাত্র দরজা, তাও বাইরে থেকে বন্ধ। বাইরে সশস্ত্র সেন্ট্রি পাহারা দিচ্ছে, তাদের বুট জুতোর শব্দ পাচ্ছে সে।

বড় অকৃতজ্ঞ এরা।

আবার হাসল কুয়াশা। শেষ পর্যন্ত তিক্ত একটা অভিজ্ঞতা নিয়ে যেতে হবে এখান থেকে। মুক্তি সে ঠিকই পাবে, আজ হোক, কাল হোক। কিন্তু এদের সম্পর্কে খারাপ একটা ধারণা থেকে যাবে তার মধ্যে।

হঠাৎ কুয়াশার খেয়াল হলো বুট জুতোর শব্দ হচ্ছে না কামরার বাইরে। ব্যাপার কি!

পরমুহূর্তে সশব্দে খুলে গেল দরজা।

'রাজকুমারী, তুমি!'

রাজকুমারী ত্রস্ত পদক্ষেপে কুয়াশার সামনে এসে দাঁড়াল। তার হাতে কুয়াশার সেই পেন্সিলটা।

'মিনি লেসারগান—ওটা কেন তোমার হাতে!'

রাজকুমারী কুয়াশার হাত পায়ের বাঁধন খুলে দিতে দিতে বলল, 'কথা বলো না। তোমার কাপড়চোড় সব এনেছি। তাড়াতাড়ি সব পরে নাও। পালাতে দেরি করলে ধরা পড়ে যাব!'

'কোথায় পালাব!'

'পৃথিবীতে ফিরবে না! তাড়াতাড়ি করো, পরে নাও কাপড়চোপড়! ধরা পড়ে

যাব যে!'

'তুমি...'

রাজকুমারী বলল, 'হ্যাঁ। আমিও যাব তোমার সাথে। তোমার প্রতি দুর্বল হয়ে পড়েছি আমি। শুধু তোমার সাথে যেতে পারব এই আশায় সাতজন সেন্ট্রিকে লেজার গান দিয়ে শেষ করে এখান অবধি পৌঁছেছি। প্লীজ! অমন অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকো না। এখুনি কেউ হয়তো এসে পড়বে।'

রাজকুমারীর প্রদর্শিত পথ দিয়ে রাজপ্রাসাদের বাইরে বেরিয়ে এল কুয়াশা পাঁচ মিনিটের ভেতর।

জাতীয় উদ্যানের দিকে ছুটল রাজকুমারীর গাড়ি।

কুয়াশা বলল, 'ওমেনা, ভেবে দেখো ভাল করে এখনও! একবার গেলে আর হয়তো ফিরতেই পারবে না।'

'ভেবে দেখেছি বৈকি! ফিরতে চাই না বলেই তো যাচ্ছি!'

কুয়াশা বলল, 'কিন্তু—কেন? আত্মীয়-স্বজন, বাবা, দেশ—সব ছেড়ে কেন যেতে চাইছ তুমি?'

'ভালবাসি, তাই। ভালবাসার চেয়ে বড় কিছু আছে? বলো?'

কুয়াশা শুধু হাসল। উত্তর দিল না।

—০—

কুয়াশা ৪৭

প্রথম প্রকাশ ঃ ডিসেম্বর, ১৯৭৫

এক

মাঝারি আকারের একটি কামরা। কেউ নেই ভিতরে। মানুষ তো নয়ই, এমনকি টিকটিকি, তেলাপোকা, মশা, মাছি, কিংবা কুকুর, বিড়াল, শিয়াল—কোন পোকা মাকড় বা জীব জানোয়ারের টিকিটি পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না।

কামরাটার মাঝখানে উঁচু একটা টেবিল। টেবিলের উপর জ্বলছে একটা হারিকেন। দেখতে হারিকেনের মত হলেও ওটা জ্বলছে বিশেষ এক ধরনের গ্যাসে। গত তিন বছর ধরে ওই টেবিলের উপরই রয়েছে হারিকেনটা ওই অবস্থায়। রাতদিন চব্বিশ ঘণ্টা জ্বলছে একই ভাবে। প্রফেসর ওয়াইয়ের আবিষ্কার এই আজব হারিকেন। একবার সে ভরে দিয়েছে হারিকেনের ট্যাঙ্ক গ্যাস দিয়ে, ব্যস, চিরকাল জ্বলতে থাকবে এমনিভাবে। আপনাআপনিই তৈরি হচ্ছে গ্যাস ট্যাঙ্কের ভিতর।

টেবিল এবং টেবিলের উপর ওই হারিকেনটা ছাড়া কামরাটার ভেতর আর কিছুই নেই।

কামরার চারদিকের দেয়াল ভারি এবং কঠিন পাথর দিয়ে তৈরি। মাথার উপরের শিলিংটাও পাথরের। অবাক কাণ্ড, কামরাটা জানালা ও দরজাহীন এখান থেকে বেরুবার বা বাইরে থেকে এর ভিতর ঢোকার কোন দৃশ্যমান পথ নেই। এমনকি একটা ভেন্টিলেটারও নেই।

অথচ কামরার ভিতর অক্সিজেনের কোন অভাব নেই। রহস্যটা অবশ্য প্রফেসর ওয়াই জানে। পৃথিবীর সেরা বিজ্ঞানীদের অন্যতম সে। তার আবিষ্কৃত যুগান্তকারী গ্যাসের সাহায্যে জ্বলছে হারিকেনটা। ওই গ্যাসই পুড়ে আপনা-আপনি তৈরি হচ্ছে অক্সিজেন।

হঠাৎ একটা শব্দ উঠল কামরাটার ভিতর। কেউ যেন কাঠের টেবিলটা মৃদু ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল একটু।

'এ কোথায় এলাম!' একটি নারী কণ্ঠ থেকে বিস্ময়োক্তি বেরিয়ে এল।

মুহূর্ত পূর্বেও এই কামরাটা ছিল নির্জন। এখন দেখা যাচ্ছে কামরার শক্ত কালো পাথরের মেঝেতে দাঁড়িয়ে আছে দু'জন মানুষ। একজন তার মধ্যে নারী, অন্যজন সুদর্শন সুবেশী বলিষ্ঠ চেহারার পুরুষ।

শাড়ি পরিহিতা সুন্দরী মেয়েটি ঘুরে দাঁড়াবার সময় ধাক্কা খেয়েছে টেবিলের সাথে। পুরুষটিও বিমূঢ় নেত্রে কামরার চারদিকটা দেখে নিচ্ছিল। অন্যমনস্কভাবে সে

বলল, 'কি জানি, ঠিক বুঝতে পারছি না। দেখে মনে হচ্ছে এটা যেন একটা কারাগার।'

মেয়েটি বলল, 'দরজা নেই, জানালা নেই—আমরা এর ভিতর ঢুকলাম কিভাবে?'

পুরুষটি বলল, 'আমি সে কথা ভাবছি না, মহুয়া। আমি ভাবছি প্রফেসর ওয়াই আমাদেরকে এই রকম একটা সেলে পাঠাল কেন? খেপে গিয়ে সে বলেছিল আমাদেরকে তার ম্যাটার ট্র্যান্সমিট করার যন্ত্রের সাহায্যে ভারত মহাসাগরের একটা দ্বীপে পাঠাবে।'

কথাটা বলে শহীদ পায়চারি করতে শুরু করল উত্তেজিত ভাবে।

মহুয়া বলল, 'প্রফেসরের ম্যাটার ট্র্যান্সমিশন যন্ত্র—আমি বিশ্বাস করি না। আমার কি ধারণা জানো?'

'কি?'

মহুয়া বলল, 'আমরা ঢাকাতেই প্রফেসরের বাড়িতে বন্দী রয়েছি। এটা হয়তো আণ্ডার গ্রাউণ্ডের কোন সেল। প্রফেসরের কাঁচ দিয়ে ঘেরা কেবিনে ঢোকার পর আমরা মারাত্মক কোন গ্যাসে আক্রান্ত হয়ে জ্ঞান হারিয়েছিলাম। তাই মনে নেই, মনে করতে পারছি না, কিভাবে এখানে এলাম। নিশ্চয়ই কেউ আমাদেরকে এখানে রেখে গেছে।'

পায়চারি থামিয়ে শহীদ টেবিলের হারিকেনটা তুলে নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল। মুখ তুলে তাকিয়ে মুচকি হাসল সে। বলল, 'কুয়াশা কিন্তু বিশ্বাস করে ম্যাটার ট্র্যান্সমিট করার যন্ত্রের কথা। তুমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলে, মনে পড়ে?'

'হ্যাঁ, মনে পড়ে। তাহলে তুমিও বলতে চাইছ...?'

শহীদ বলল, 'প্রফেসর সত্যি ওই রকম একটা যন্ত্র আবিষ্কার করেছে।'

মহুয়া বলল, 'রিসিভিং সেট দেখছি না কেন তাহলে? তুমিই তো আমাকে বলেছিলে যেখানে রিসিভিং সেট নেই সেখানে প্রফেসর তার যন্ত্রের সাহায্যে ম্যাটার বা মানুষকে পাঠাতে পারবে না।'

শহীদ টেবিলের উপরে হারিকেনটা নামিয়ে রাখল। বলল, 'এই প্রশ্ন আমার মনেও দেখা দেয়। উত্তরও পেয়ে গেছি। এই হারিকেনটাই হলো প্রফেসর ওয়াইয়ের রিসিভিং সেট। অন্যান্য সেটের চেয়ে একটু অন্য রকম দেখতে এই যা।'

মহুয়া স্বামীর দিকে বোকার মত তাকিয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপর বলল, 'তুমি বলতে চাইছ সত্যি প্রফেসর তার ঢাকার আস্তানা থেকে ট্র্যান্সমিট করে আমাদেরকে অন্য কোথাও পাঠিয়ে দিয়েছে?'

শহীদ বলল, 'অন্য কোথাও না, আমার ধারণা সে তার কথা মত আমাদেরকে ভারত মহাসাগরের কোন এক ছোট্ট নির্জন দ্বীপেই পাঠিয়েছে।'

কালো হয়ে গেল মহুয়ার মুখটা। বলল, 'তাহলে! তোমার কথা যদি সত্যি হয়...। শহীদ আমরা আবার দেশে ফিরতে পারব তো?'

শহীদ এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল মহুয়ার দিকে। বলল, 'সত্যি-কথাই বলা ভাল, মহুয়া। মিথ্যে আশা দিয়ে তোমাকে ঠকাতে চাই না। দেশে ফিরতে পারব কিনা

জানি না আমি।'

মেয়েরা চিরকাল যে-কোন পরিস্থিতির সাথে দ্রুত নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। মহুয়ার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটল না। শহীদের দুই হাতের দিকে তাকিয়ে সে জানতে চাইল, 'প্রফেসরের রোবটরা তোমাকে খাবারের দুটো প্যাকেট দিয়েছিল—কোথায় সেগুলো?'

মহুয়ার কাঁধে পানির ফ্লাস্কটা অবশ্য ঠিকই আছে। প্রফেসরের একটা রোবট সুপের পানি ভরা এই ফ্লাস্কটা দিয়েছিল ওদেরকে।

'প্যাকেট দুটো আমি পকেটে ভরে রেখেছিলাম প্রফেসরের ম্যাটার ট্র্যান্সমিশন যন্ত্রের কেবিনের ভিতর ঢুকে।'

পকেটে হাত ঢোকাল শহীদ। প্লাস্টিকের দুটো প্যাকেট বের করে টেবিলের উপর রাখল ও।

হঠাৎ নিজের রিস্টওয়াচের দিকে তাকাল মহুয়া।

'শহীদ, মাত্র দেড় মিনিট হয়েছে—মানে, দেড় মিনিট আগেও আমরা ঢাকার প্রফেসরের কন্ট্রোল রুমে ছিলাম…!'

শহীদ বলল, 'ঠিক তা নয়। প্রফেসরের কেবিনে ঢুকে সময় দেখেছিলাম আমি। এখানে নিজেকে আবিষ্কার করার সাথে সাথে আবার সময় দেখেছি। দেড় মিনিট হলো আমরা এখানে এসে পৌঁছেছি বটে, কিন্তু পৌঁছতে এক সেকেণ্ডও লাগেনি। আলোর গতিতে আমরা এখানে এসে পৌঁছে গিয়েছি।'

মহুয়া টেবিলের কিনারায় বসে পড়ল। বলল, 'আমার মাথায় তোমার হেঁয়ালি ঢুকছে না, বাপু। কি বলতে চাইছ তুমি? এক নিমেষে এতদূর আসা যায় কোনদিন?'

'আলোর গতিতে মাত্র এক সেকেণ্ডে চলে যাবে তুমি এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল। প্রফেসরের আবিষ্কৃত যন্ত্রটা ম্যাটারকে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় পাঠাতে পারে আলোর গতিতে।'

মহুয়া গালে হাত দিয়ে বলল, 'তুমি বলতে চাইছ আমরা ঢাকা থেকে অনেক দূরে কোথাও চলে এসেছি?'

শহীদ বলল, 'দুই হাজার ছয়শো মাইল—হ্যাঁ।'

মহুয়া টেবিল থেকে লাফ দিয়ে নেমে পড়ল। খপ করে একটা হাত ধরে ফেলল সে শহীদের, 'তার মানে—প্রফেসরের সব কথা সত্যি! কামাল আর ডি. কস্টা তাহলে এই মুহূর্তে…!'

'হ্যাঁ। ওরা এখন এভারেস্টের চূড়োয় রয়েছে।'

মহুয়ার চোখ দুটো কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে। ঢোক গিলল সে। বলল, 'আর মি. সিম্পসন গ্রীনল্যাণ্ডে!'

'হ্যাঁ।'

'আর দাদা, দাদাকে প্রফেসর পাঠাতে চেয়েছিল মহাশূন্যে…

শহীদ বলল, 'কুয়াশা হয়তো মহাশূন্যের কোন গ্রহের উদ্দেশে ছুটছে। কুয়াশা ঠিক নয়, কুয়াশার শরীর লক্ষ-কোটি অণু পরমাণুতে পরিণত হয়ে গেছে। সেই

অণুগুলো ছুটছে সীমাহীন মহাশূন্যের পথ ধরে। ডক্টর কুটজের স্পেসক্রাফটের রিসিভিং সেট যেখানে আছে সেখানে গিয়ে অনুগুলো একত্রিত হবে অর্থাৎ কুয়াশা নিজেকে সেখানে আবিষ্কার করবে…।'

ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল মহুয়া। দুই হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল সে শহীদকে। শহীদ গম্ভীর হয়ে উঠল একটু। মহুয়ার মাথায় একটা হাত রেখে সান্ত্বনার সুরে কিছু বলতে গিয়েও ঠোঁট দুটো বন্ধ করে ফেলল ও।

সান্ত্বনা দেবার ভাষা নেই।

খানিক পর ধাতস্থ হয়ে মহুয়া শাড়ির আঁচলে চোখ-মুখ মুছতে মুছতে বলল, 'আমরা তো এখনও বেঁচে রয়েছি। কিন্তু ওরা…ওরা হয়তো মরে গেছে এরই মধ্যে।'

শহীদ বলল, 'মরেনি। প্রফেসর ওদেরকে কিছু কিছু সাজসরঞ্জাম দিয়েছে, যার ফলে ক'টা দিন বেঁচে থাকতে পারবে সবাই।'

মহুয়া বলল, 'তাতেই বা কি! এভারেস্টের চুড়ো থেকে ওরা কি নামতে পারবে বলে মনে করো? মি. সিম্পসনই বা বরফের দেশে ক'দিন বেঁচে থাকতে পারবেন? আর দাদা…!'

আবার চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে এল মহুয়ার। জীবনে আর হয়তো দাদাকে দেখতে পাবে না সে। অনেক জীবন-মরণ সমস্যায় পড়েছে তারা, কিন্তু প্রত্যেকবারের মত এবার আর দাদা ছুটে আসবে না তাদেরকে উদ্ধার করার জন্যে।

শয়তান প্রফেসরের শিকার কুয়াশা নিজেও।

'কি করছ তুমি?'

শহীদ পিছন ফিরে না তাকিয়েই জবাব দিল, 'এখান থেকে বেরুবার গোপন পথের হদিস পাবার চেষ্টা করছি।'

শহীদ পাথরের দেয়ালের প্রতি ইঞ্চি জায়গা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে এবং হাত বুলিয়ে পরীক্ষা করছে।

'বেরুবার রাস্তা যদি না থাকে?'

মহুয়ার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে কাজ করে যেতে লাগল শহীদ। চারদিকের চারটে দেয়াল পরীক্ষা করতে আধ ঘণ্টা সময় নিল ও। নৈরাশ্য ফুটে উঠল ওর চোখে মুখে।

'কি, পেলে না?' ব্যগ্র কণ্ঠে জানতে চাইল মহুয়া

'না। মেঝেটা বাকি আছে পরীক্ষা করতে।'

মেঝেতে হাঁটু মুড়ে বসল শহীদ। মেঝের দিকে তাকিয়ে ভুরু জোড়া কুঁচকে উঠল ওর। দু'হাত মেঝেতে রেখে ঝুঁকে পড়ল নিচের দিকে সন্ধানী দৃষ্টিতে কিছু যেন দেখছে সে।

এদিকে মহুয়া টেবিলের ড্রয়ারটা খুলে হতবাক হয়ে গেছে। সুন্দর একটা আধ হাত লম্বা টর্চ দেখা যাচ্ছে ড্রয়ারের ভিতর। ঘাড় ফিরিয়ে মুখটা হাঁ করল কিছু বলার জন্য। কিন্তু বলা হলো না। তার আগেই শহীদ কথা বলে উঠল।

'মহুয়া, এদিকে এসো। দেখো তো, এগুলো পায়ের ছাপ না?'

'পায়ের ছাপ!'

মহুয়া শহীদের পাশে এসে বসল, 'মেঝের দিকে তাকিয়ে সে দেখল সত্যি পায়ের ছাপই। কাদামাখা পায়ের ছাপ পরিষ্কার ফুটে রয়েছে মেঝের উপর। তবে, ছাপগুলো যেন বাচ্চা ছেলের পায়ের।'

শহীদ বলল, 'খুব ছোট ছোট, না? একটু যেন, লম্বার তুলনায় বেশি চওড়া—তাই মনে হচ্ছে না তোমার?'

মহুয়ার দিকে তাকাল শহীদ কথাগুলো বলে। প্রশ্ন ফুটে উঠল ওর চোখের দৃষ্টিতে। বলল, 'তোমার হাতে টর্চ কোত্থেকে এল!'

মহুয়া বলল, 'এটা টর্চ কিনা বুঝতে পারছি না। টর্চের মত দেখতে কিন্তু সুইচ বা বোতাম নেই কেন?'

হাত বাড়িয়ে জিনিসটা নিল শহীদ। সত্যি, সুইচ বা বোতাম জাতীয় কিছু নেই কোথাও। শহীদ মুখ তুলে তাকাতে মহুয়া বলে উঠল, 'ড্রয়ারের ভিতর ছিল।'

জিনিসটার দিকে আবার তাকাল শহীদ। এক মুহূর্ত পর আপন মনেই বলে উঠল ও, 'আশ্চর্য!'

মহুয়া সাগ্রহে জানতে চাইল, 'কি ব্যাপার?'

শহীদ টর্চের মত দেখতে চকচকে ইস্পাতের জিনিসটা বাড়িয়ে দিল মহুয়ার দিকে। বলল, 'পিছন দিকটা ভালমত লক্ষ্য করে দেখো। কিছু দেখতে পাচ্ছ?'

মহুয়া হুমড়ি খেয়ে পড়ল সামনে। খোঁপা ভেঙে মাথার চুলগুলো ছড়িয়ে পড়ল পিঠের উপর। প্রায় সাথে সাথে চেঁচিয়ে উঠল সে, 'একি! কুয়াশা—দাদার নাম খোদাই করা রয়েছে যে! কিন্তু…।'

শহীদ বলল, 'কুয়াশারই কাজ এটা। এখন আমি বুঝতে পারছি। প্রফেসরের কন্ট্রোলরুমের ঠিক কোন জায়গাটায় দাঁড়িয়েছিল কুয়াশা খেয়াল আছে তোমার? কাঁচের কেবিনটার দরজার কাছ থেকে বড়জোর চার কি পাঁচ হাত দূরে দাঁড়িয়ে ছিল সে।'

'হ্যাঁ, মনে পড়ছে। কিন্তু দাদার দাঁড়িয়ে থাকার সাথে এই জিনিসের সম্পর্ক কি?'

শহীদ বলল, 'সম্পর্ক আছে। কুয়াশা জানত প্রফেসর ওয়াই আমাদেরকে পাঠাচ্ছে ভারত মহাসাগরের একটা দ্বীপে। আমরা বিপদে পড়তে পারি এ-কথা ভেবে সে-ই সকলের অগোচরে এই টর্চটা ছুঁড়ে দিয়েছিল কেবিনের ভিতর। কেবিনে ঢোকার পর আমি একটা শব্দ শুনেছিলাম। কিন্তু তখন কোন শব্দের প্রতি মনোযোগ দেবার মত মানসিক অবস্থা আমার বা তোমার ছিল না।'

মহুয়া বলল, 'এটা তাহলে দাদার আবিষ্কৃত কোন অস্ত্র?'

শহীদ বলল, 'হ্যাঁ। আমাদের জন্যে শেষ মুহূর্তেও মাথা ঘামিয়েছে কুয়াশা। কিন্তু অস্ত্রটা কিভাবে ব্যবহার করতে হয় জানাতে পারেনি। ঠিক আছে, চেষ্টা করলে জানা তেমন কোন কঠিন কাজ হবে না।'

শহীদ টর্চ সদৃশ জিনিসটা পকেটে ভরে রেখে মেঝের দিকে তাকাল।

'কিন্তু, এটা ড্রয়ারে এল কিভাবে?'

শহীদ মুখ না তুলেই বলল, 'কেবিনের দেয়ালে লেগে মেঝেতে পড়বার আগেই শূন্যে থাকা অবস্থায় অনুতে পরিণত হয়ে একত্রিত হয়েছে ওটা ওই ড্রয়ারের ভেতর। ওটা যদি আমার পকেটে বা তোমার হাতে থাকত তাহলে আমার পকেটে বা তোমার হাতেই পাওয়া যেত ওটাকে এখানে এসে।'

বসে বসেই মেঝের উপর দিয়ে এগোতে লাগল শহীদ। ছোট ছোট পায়ের ছাপগুলো হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেছে, সামনে আর কোন চিহ্ন নেই। মেঝের দিকে আরও নুয়ে পড়ল শহীদ।

'মহুয়া! ইউরেকা!'

শহীদের পাশে দাঁড়িয়ে হাত দুটো পিছনে নিয়ে গিয়ে লম্বা কালো সাপের মত চুলগুলোকে একত্রিত করে খোঁপার মধ্যে বন্দী করতে চেষ্টা করছিল মহুয়া। হাত দুটো থেমে গেল ওর। ঝুলে পড়ল চুলগুলো পিঠের উপর।

'কি পেলে! বেরুবার রাস্তা?'

শহীদ বলল, 'দেখো, এই জায়গার পাথরটা সামান্য একটু উঁচু হয়ে রয়েছে। এটা সরাতে হবে।'

আশার আলো ফুটে উঠেছিল মহুয়ার চোখে মুখে। কিন্তু পাথরটার দিকে চোখ পড়তেই দপ্ করে নিভে গেল সব আশার আলো।

'অতটুকু মাত্র! ওটা সরালেই বা কি? যদি গর্ত একটা পাওয়াও যায়, বড়জোর খাবার প্যাকেটগুলো একটা একটা করে গলিয়ে দেয়া যাবে। আমরা বেরুবো কোন পথে? তোমার মাথা গরম হয়ে গেছে। তাই ছোট্ট একটা পাথর উঁচু হয়ে রয়েছে দেখেই...।'

শহীদ গায়ে মাখল না মহুয়ার কথা। পাথরটাকে সরাবার চেষ্টা করছে ও। কিন্তু সরানো তো দূরের কথা, নড়াতেও পারছে না পাথরটাকে। মিনিট সাতেক পর ক্ষান্ত হলো ও।

এভাবে হবে না। কি মনে করে, পাথরটার উপর ডান হাত রেখে চাপ দিতে লাগল শহীদ। সাথে সাথে শব্দ উঠল ঘর-ঘর-ঘর করে।

শহীদ এবং মহুয়া বিদ্যুৎবেগে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল পিছন দিকে। লাফ মেরে উঠে দাঁড়াল শহীদ। পশ্চিম দিকের দেয়ালটা মাঝখান থেকে দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে দু'পাশে সরে যাচ্ছে। উন্মোচিত ফাঁকা জায়গায় দেখা যাচ্ছে একটা সিঁড়ি। সিঁড়িটা উঠে গেছে উপর দিকে।

মহুয়ার একটা হাত ধরল শহীদ। বলল, 'এটা সেল হলেও জায়গাটা কিন্তু বেশ নিরাপদ।'

মহুয়া ঝট্ করে তাকাল শহীদের দিকে, 'তুমি বলতে চাইছ এখান থেকে বেরুলে বিপদে পড়ার সম্ভাবনা আছে?'

শহীদ বলল, 'তোমার কি মনে হয়? বিপদে পড়ার আশঙ্কা না করলে কুয়াশা অস্ত্রটা আমাদের সাথে পাঠাত কি? আমার কাছে রিভলভার আছে তা তো সে জানতই। তার মানে কি দাঁড়ায়? কুয়াশা জানত আমরা এখানে যে বিপদে পড়ব সেই বিপদের মোকাবিলা করার জন্য রিভলভার যথেষ্ট নয়।'

দুই

সুড়ঙ্গটার মেঝে, দেয়াল এবং সিলিং পাথরের তৈরি। পেন্সিল টর্চটা ছিল বলে রক্ষে। তা না হলে গাঢ় অন্ধকারে হাতড়ে মরতে হত। মহুয়া খুব বেশি নার্ভাস হয়ে পড়েছে। বিশেষ কিছু বলছে না সে ঠিক, কিন্তু শহীদ তার দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছে।

এর আগে দু'বার বাঁক নিয়েছে ওরা। সামনে আরও একটা বাঁক। বেশ দীর্ঘ সুড়ঙ্গ। মাঝে মধ্যে থেমে কান পেতে কোন শব্দ শোনা যায় কিনা খেয়াল করছে শহীদ। মহুয়া ঠিক ওর পিছনেই রয়েছে। তার ছোঁয়া প্রতি মুহূর্তে পাচ্ছে ও পিঠে। দু'জনের মাঝখানে এতটুকু দূরত্ব রাখতে চায় না মহুয়া।

সুড়ঙ্গের দু'পাশের দেয়ালগুলো কোথাও মসৃণ, কোথাও উঁচু-নিচু। মেঝেটাও পরীক্ষা করেছে শহীদ। বেশ যত্ন করে বড় বড় পাথরের খণ্ড বসানো হয়েছে। প্রাকৃতিক কোন সুড়ঙ্গ নয়। একদল মানুষের কঠোর পরিশ্রমের ফসল এটা।

শহীদের কাঁধ দুটো আঁকড়ে ধরল মহুয়া পিছন থেকে, 'শহীদ, আমার বড় ভয় করছে কেন যেন!'

সামনে বাঁক। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সেদিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকার পর শহীদ বলল, 'ভয়ের কি আছে? আমি থাকতে তোমার ভয়ের কিছু নেই, মহুয়া। আশপাশে বাঘ, ভালুক, সিংহ বা গরিলার দল বা চোর, ডাকাত, গুণ্ডা, বদমাশ কিছুই তো দেখছি না। প্রফেসর ওয়াই—সেও তো ঢাকায়। কাকে ভয় লাগছে তোমার বলো তো? আমাকে? বিশ্বাস করো, মানুষটা আমি কখনও কখনও ভয়ঙ্কর হলেও, তোমার কোন ক্ষতি আমি করব না।'

কাজ হলো। সব ভয়, উত্তেজনা শঙ্কা থেকে মুক্ত হয়ে শব্দ করে হেসে ফেলল মহুয়া।

বাঁক পেরুতেই শহীদ দাঁড়িয়ে পড়ল। বলল, 'মহুয়া, দেখছ?'

'দরজা। অনেকগুলো। শহীদ, দরকার নেই আর সামনে এগিয়ে। চলো ফিরে যাই সেই কামরাটায়।'

'দূর বোকা! ওখানে কতদিন থাকবে শুনি? খাবে কি? তাছাড়া, এত ভয় পেলে চলবে কিভাবে বলো তো? সত্যিকার ভয়ের ব্যাপার ঘটলে দেখছি তুমি হার্টফেলই করবে।'

মহুয়া বলল, 'সত্যিকার ভয়ের ব্যাপার ঘটলে হার্টফেল করার সুযোগ পাব? তার আগেই সত্যিকার ভয়ের ব্যাপারটা ঘাড় মটকে দেবে না তো?'

দরজাগুলোর গায়ে বড় বড় তালা ঝুলছে। ভিতরে কি আছে দেখার কোন উপায় নেই। শহীদ বলল, 'আমার কিন্তু ভারি কৌতূহল হচ্ছে, মহুয়া।'

'কি করতে চাও তুমি?'

পকেট থেকে সেই ইস্পাতের লম্বা টর্চটা বের করল শহীদ। বলল, 'কুয়াশার এই জিনিসটা এবার ব্যবহার করা দরকার। আমার বিশ্বাস, এটা কুয়াশার আবিষ্কৃত

লেজার গানের ক্ষুদ্র সংস্করণ।'

নেড়েচেড়ে দেখতে শুরু করল শহীদ জিনিসটা। ডায়াল দেখা যাচ্ছে পিছনে একটা। জিরোতে সেট করা আছে ডায়ালের একটা কাঁটা। খানিক নাড়াচাড়া করেই টের পেল শহীদ, আলাদা কোন বোতামের ব্যবস্থা নেই—পিছনের এক ইঞ্চি পরিমাণ জায়গা সবটাই বোতাম। চাপ দিলে ঢুকে যাচ্ছে ভিতরে। ডায়াল ঘুরিয়ে কাঁটাটা ওয়ানের উপর নিয়ে এল শহীদ।

'খুলছে তাহলে!'

মহুয়া কাছে সরে এল। ধমকে উঠল শহীদ সাথে সাথে। 'সরে যাও সামনে থেকে! এটা লেজার গান, ছেলে-খেলা ব্যাপার নয়। সুইচে আঙুলের ছোঁয়া লাগলেই বেরিয়ে পড়বে অদৃশ্য একটা রে। সেই রে যার ওপর পড়বে সে-ই চোখের পলকে বাষ্প হয়ে উড়ে যাবে।'

মুখ শুকিয়ে গেল মহুয়ার। শহীদের পিছনে চলে গিয়ে বলল, 'সুইচ কোথায় পেলে তুমি আবার?'

শহীদ বলল, 'এই দেখো এটাই সুইচ।'

মহুয়া পিছন থেকে উঁকি দিয়ে দেখছে শহীদের কার্যকলাপ।

শহীদ ডায়ালের কাঁটা ঘোরাতে ঘোরাতে বলল, 'রে-এর তরঙ্গের কম বেশি করার জন্যে এই ডায়াল। মহুয়া, চোখ দুটো বন্ধ করো তো।'

চোখ বন্ধ করল মহুয়া। শহীদ মিনি লেজারগানের সামনের দিকটা একটা দরজার তালার দিকে ধরে লেজার গানের পিছনের অংশে একটা আঙুল রেখে মৃদু চাপ দিল।

এক নিমেষে তালাসহ দরজার খানিকটা অংশ যাদুমন্ত্রে অদৃশ্য হয়ে গেল। দরজার গায়ে ধাক্কা দিতেই কবাট দুটো সরে গেল দু'দিকে।

কামরার ভিতর বড় বড় কাঠের বাক্স একটার উপর একটা চাপানো রয়েছে। লেজারগানের রে একটা বাক্সের একটা কোণা গায়েব করে দিয়েছে। বাক্সের ভিতর চকচক করছে ইস্পাতের তৈরি যন্ত্রপাতি।

'বাক্সগুলোয় নানারকম যন্ত্রপাতি, মেশিনের পার্টস এইসব রয়েছে।'

শহীদ গম্ভীর। কথা না বলে পাশের কামরার দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল ও।

দ্বিতীয় কামরায় বাক্স নয়, কাঁচের বড় বড় জার দেখা গেল। জারের ভিতর নানা রঙের, নানা জাতের তরল রাসায়নিক পদার্থ। তৃতীয় কামরার ভিতর কিছুই পাওয়া গেল না। সম্পূর্ণ ফাঁকা। চতুর্থ কামরার ভিতর নানা ধরনের তার। চুলের মত সরু থেকে শুরু করে আঙুলের মত মোটা—সব রকমের তারই রয়েছে।

পাঁচ নম্বর কামরার ভিতরই অপেক্ষা করছিল ওরা। ঘর ভর্তি লোক। দাঁড়িয়ে আছে সবাই দরজার দিকে মুখ করে। যেন শহীদ এবং মহুয়ার জন্যই দাঁড়িয়ে আছে সবাই। দাঁত বের করে হাসছে।

কানের কাছে তীক্ষ্ণস্বরে আর্তচিৎকার করে উঠল মহুয়া। দুই হাত দিয়ে প্রাণপণ শক্তিতে জড়িয়ে ধরেছে সে শহীদকে। ছাড়াতে পারছে না শহীদ নিজেকে। শত চেষ্টাতে মহুয়াকে থামাতেও পারছে না।

চোখ বুজে চিৎকার করেই চলেছে মহুয়া।

কামরার ভিতর লোকগুলো দাঁত বের করে নিঃশব্দে হাসছে। কেউ নড়ছে না কারও গায়ে মাংসের ছিটেফোঁটা নেই ওদের। শুকনো, খটখটে।

কঙ্কাল পরস্পরের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ঝট্ করে মুখ তুলে আবার তাকাল শহীদ। মাথাটা যেন ঘুরে উঠল ওর। মহুয়ার চিৎকার, সেই সাথে কাদের যেন সম্মিলিত হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ ধরনের ভয় দেখানোর হাসি···

লজ্জা পেল শহীদ। ওটা আসলে মনের ভুল। কেউ হাসছে না। মহুয়ার মুখে হাত চাপা দিয়ে চিৎকার থামিয়ে দিল ও। হাতটা পরমুহূর্তে সরিয়ে নিয়ে হালকা সুরে বলল, 'অমন করে কেউ চেঁচায়? ওগুলো তো নিষ্প্রাণ কঙ্কাল, কি করবে ওরা তোমার?'

চোখ খুলতে ভয় হচ্ছে মহুয়ার। দু'হাতে আঁকড়ে ধরে আছে সে শহীদকে। শহীদের ঘাড়ের মাংসে চেপে বসেছে তার আঙুলের নখগুলো। কাঁপছে গোটা দেহ। ভাঙা গলায় সে বলে উঠল, 'এখানে আর এক সেকেণ্ডও নয়!'

মৃদু হেসে শহীদ বলল, 'বেশ তো, চলো, সামনের দিকে হাঁটি।'

সামনে আর একটা বাঁক। বাঁক ঘুরতেই কাঠের উপর লোহার পাত মোড়া প্রকাণ্ড দরজা দেখতে পেল ওরা। দরজার মাথার উপরে, পাথরের দেয়ালে, ঝুলছে একটা টিভি ক্যামেরা।

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে মহুয়া ভয়ে ভয়ে পিছন দিকে বারবার তাকাচ্ছে। দেয়ালে হাত বুলিয়ে কি যেন খুঁজছে শহীদ। মিনিট খানেক পরই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ও। পাওয়া গেছে একটা বোতাম। বোতামটায় চাপ দিল ও।

নিঃশব্দে খুলে যাচ্ছে মস্ত ভারি দরজাটা। সূর্যের আলোয় ধাঁধিয়ে গেল ওদের চোখ। উঁচু একটা মাটির টিলা দেখা যাচ্ছে। সূর্যটা তার মাথার উপর। সামনে সবুজ গাছপালা, ঝোপঝাড়।

একটানা গুরুগম্ভীর গর্জনের শব্দ আসছে কোথাও থেকে।

মহুয়া ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, 'কিসের শব্দ হচ্ছে অমন?'

'সমুদ্র ডাকছে। মহুয়া, আমরা ভারত মহাসাগরের কোন দ্বীপেই বন্দী রয়েছি।' কথাটা বলে দরজা পেরিয়ে বনভূমিতে পা রাখল শহীদ। মহুয়াও ওর পিছু পিছু বেরিয়ে এল।

এক মুহূর্ত পর একটা শব্দ শুনে ওরা দু'জনেই পিছন ফিরে তাকাল। সুড়ঙ্গের দরজাটা অদৃশ্য হয়ে গেছে।

'দরজাটা কোথায়! শহীদ! আমি কি স্বপ্ন দেখছি!'

শহীদ বলল, 'দরজাটা বন্ধ হয়ে গেছে, মহুয়া। ওই যে মস্ত পাথরটা দেখছ, ওটাই দরজা। দরজার গায়ের সাথে পাথরটাকে আটকে রাখা হয়েছে। কিন্তু আমি ভাবছি—দরজা বন্ধ করল কে!'

তিন

পরিবেশটা খুবই সুন্দর। গাছে গাছে সবুজ পাতা, ডালে ডালে চেনা-অচেনা হরেক রকম হলুদ, লাল, খয়েরী, কালো রঙের সুন্দর সুন্দর পাখি। সুরেলা কণ্ঠে ডাকাডাকি করছে, দল বেঁধে এক ডাল থেকে আরেক ডালে গিয়ে বসছে। বুনো ফুলের উজ্জ্বল রঙ চোখ ধাঁধিয়ে দেয়, মন কেড়ে নেয়। রঙিন প্রজাপতিরা উড়ছে ফুলের চারদিকে। শীতল শরীর-জুড়ানো সামুদ্রিক বাতাস, বুক ভরে শ্বাস নিচ্ছে ওরা। ভুলেই গেছে প্রফেসর ওয়াইয়ের কথা।

হঠাৎ মহুয়া থমকে দাঁড়াল। অবাক কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল ছেলে-মানুষের মত, 'মাগো মা! তুমিও এখানে আছ! এমন করে চেয়ে আছ কেন আমার দিকে? এসো কাছে এসো, বিস্কুট খাবে?'

ঘাড় ফিরিয়ে শহীদ দেখল মহুয়া একটা সাদা খরগোশের সাথে আলাপ জমাবার চেষ্টা করছে। হেসে উঠে বলল, 'গুড! তোমার নীতির প্রশংসা করি।'

মহুয়া ঝাঁঝাল কণ্ঠে আক্রমণ করল শহীদকে, 'দিলে তো ভয় খাইয়ে বেচারীকে। তোমার হেঁড়ে গলা শুনে পালিয়ে গেল!'

'হেঁড়ে গলা আমার? বলতে পারলে কথাটা তুমি?'

'পুরুষ মানুষের গলা মেয়েদের তুলনায় হেঁড়ে নয় তো কি! যাকগে আমার নীতির প্রশংসা করছিলে যেন! কিসের নীতি?'

শহীদ বলল, 'এই দ্বীপের বাসিন্দাদের সাথে, আই মীন, জীবজন্তু জানোয়ারদের সাথে সহাবস্থানের নীতিই গ্রহণ করতে হবে। বন্ধুত্ব চাই আমরা। একদিন দু'দিনের ব্যাপার তো আর নয়। বাকি জীবনটা আমাদেরকে কাটাতে হবে এখানেই। সুতরাং···।'

মহুয়া সহাস্যে বলল, 'ভয় দেখাতে চেষ্টা করছ তুমি? জি না, হুজুর, ভয় আমি আর পাচ্ছি না! বিশ্বাস করো, সভ্য দুনিয়ায় ফিরে যেতে চাই না আর আমি। বড় ভাল লাগছে এখানকার পরিবেশ। তুমি আর আমি বাকি জীবনটা এখানে কাটিয়ে দেব—মন্দ কি! শহরের কোলাহল, যান্ত্রিক শব্দ, কল-কারখানার দূষিত ধোঁয়া, চোর ডাকাতের উপদ্রব, যুদ্ধের বিভীষিকা—কিছু নেই এখানে। স্বর্গের চেয়ে কম কিসে এই পরিবেশ?'

হাঁটতে হাঁটতে ওরা যতই এগোচ্ছে সমুদ্রের গর্জন ততই কাছে এগিয়ে আসছে। ঝোপঝাড়, গাছপালাকে পাশ কাটিয়ে হাত ধরাধরি করে আরও খানিকদূর এগিয়ে বালুকাবেলায় পৌঁছল ওরা। পায়ের জুতো খুলে আরও এগিয়ে গেল

লুটিয়ে পড়ছে ওদের পায়ের কাছে ভারত মহাসাগর। সাগরের কূল নেই কিনারা নেই। যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু অথৈ জলরাশি। ঢেউয়ের পর ঢেউ একটার একটা অবিরাম ছুটে আসছে, বালুকাবেলায় ধাক্কা খেয়ে ভেঙে পড়ছে, গড়িয়ে আসছে ওদের পায়ের দিকে। ফেনায় ফেনায় সামনের দিকটা সাদা হয়ে গেছে। মুগ্ধ সম্মোহিত দৃষ্টিতে দেখছে ওরা মহাসাগরের মহিমা।

শহীদের কানের কাছে ঠোঁট নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে মহুয়া বলল, 'শহীদ! যাব না, এই জায়গা ছেড়ে কোথাও যাব না আমরা।'

মুচকি হাসল শহীদ। ঘাড় ফিরিয়ে পিছনের গভীর বনভূমির দিকে চেয়ে রইল।

'কি দেখছ?'

শহীদ বলল, 'এই গভীর জঙ্গলে হিংস্র প্রাণী নিশ্চয়ই আছে, মহুয়া। আমাদেরকে খুব সাবধানে থাকতে হবে।'

সুপারি আর নারকেল গাছগুলোর মাথার দিকে তাকিয়ে শহীদ আবার কথা বলে উঠল, 'ডাব খাবে?'

মহুয়া সমুদ্রের দিকে চেয়ে আছে। অন্যমনস্কভাবে বলল সে, 'খাব।'

বনভূমিতে ঢুকে একটা নারকেল গাছের কাছে এসে দাঁড়াল শহীদ। মহুয়াও এসেছে ওর সাথে। বুনো ফুলে অস্তগামী সূর্যের কিরণ পড়েছে। ঘুরে ঘুরে ফুল ছিঁড়ছে মহুয়া। শহীদ গাছে চড়তে শুরু করল। বলল, 'বুঝলে মহুয়া, ডাব পাড়াই একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। ওপরে উঠে দ্বীপের চারদিকটা একবার দেখে নিতে চাই। রাতটা নিরাপদে কাটাবার জন্য একটা ভাল জায়গা পেতে হবে।'

মহুয়া কথা বলছে না কেন? গাছ বেয়ে শহীদ প্রায় সাত-আট হাত উপরে উঠে গেছে। নিচের দিকে তাকাল ও।

ঠিক তখনই চোখ বন্ধ করে চারদিক সচকিত করে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চিৎকার করতে শুরু করল মহুয়া।

চিন্তা করার কোন অবকাশই পেল না শহীদ। একটা কদাকার বাইসন মাথা নত করে ঝড়ের বেগে ছুটে আসছে মহুয়ার দিকে। পেশীবহুল প্রকাণ্ডদেহী হিংস্র জন্তুটার ঘাড়টা দেহের তুলনায় মস্ত বড়। ছোট্ট লেজটা উপর দিকে তুলে সগর্জনে ছুটে আসছে। রক্ষে নেই মহুয়ার। এক ধাক্কাতেই তার শরীরের হাড়-পাঁজরা গুঁড়ো করে ফেলবে।

চিন্তা করার কোন অবকাশই পেল না শহীদ। লাফ দিল ও নারকেল গাছের উপর থেকে। মহুয়ার সামনে পড়ল ও। তাল সামলে সিধে হয়ে দাঁড়িয়েই ধাক্কা দিল মহুয়াকে। ছিটকে সাত হাত দূরের একটা ঝোপের উপর গিয়ে পড়ল মহুয়া।

ঘুরে দাঁড়াল শহীদ। স্বয়ং যমদূত এসে গেছে সামনে। লেজারগানটা পকেটেই রয়েছে শহীদের। কিন্তু সেটা বের করার সময় পাওয়া গেল না।

দ্রুত একটু ডান দিকে সরে গেল শহীদ। মহুয়াকে দেখতে না পেয়ে হিংস্র বাইসনটা গুরু গুরু মেঘ ডাকার মত গম্ভীর স্বরে আক্রোশ প্রকাশ করল শহীদের প্রতি। শহীদ ছুটতে শুরু করল।

ছুটছে শহীদ। চেয়ে আছে পিছন দিকে। বাইসনটার দৃষ্টি নিজের দিকে আকৃষ্ট করতে চাইছে ও। উদ্দেশ্য পূরণ হয়েছে ওর। বাইসনটা বিপুল বেগে ছুটে আসছে পিছু পিছু।

মহুয়াকে বাঁচাবার জন্য প্রাণের ঝুঁকি নিয়েছে শহীদ। বনভূমির উপর দিয়ে ঝোপঝাড় টপকে তীরবেগে ছুটছে ও। পিছন পিছন ছুটে আসছে মহাশক্তিশালী খেপা বাইসনটা। গোঁয়ার জন্তুটা নাছোড়বান্দা। কেন রেগে গেছে কে জানে। শহীদকে

গুঁতো না মারতে পারলে যেন শান্তি নেই ওর। শহীদের পিছু পিছু ঝড়ের বেগে ছুটছে সে।

মাত্র আড়াই কি তিন হাত পিছনে চলে এসেছে বাইসনটা। সশব্দে নিঃশ্বাস ফেলার হুশ হুশ শব্দ পাচ্ছে শহীদ। সামনে একটা নালা দেখল ও। ঢালু হয়ে গেছে জায়গাটা। মাঝখানে পানি জমেছে। তারপর আবার উঁচু হয়ে গেছে মাটি। লাফ দিয়ে নালাটা পেরিয়ে গেল ও। ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাবার সময়ও নেই। গতি একটু শ্লথ হলেই বিপদ। বাইসনের তীক্ষ্ণ শিঙের গুঁতোয় পটল তুলতে হবে।

হাঁপিয়ে গেছে শহীদ। ঘামে ভিজে গেছে ট্রাউজার, শার্ট। হঠাৎ ও টের পেল, বাইসনের নিঃশ্বাস ফেলার শব্দ শোনা যাচ্ছে না আর। কিন্তু ঝোপঝাড় ভেঙে ধাওয়া করে আসছে ঠিকই। তবে, পিছিয়ে পড়েছে একটু। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল শহীদ। পিছিয়ে পড়ার কারণটা বুঝতে পারল ও। এঁকেবেঁকে ছুটেছে এতক্ষণ ও, সেটাই কারণ।

সামনেই একটা ফাঁকা মত জায়গা। শহীদ হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে বাইসনটার দিকে ঘুরে দাঁড়াল। পারছে না আর। দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে পাগলের মত ছুটেছে এতক্ষণ। দম ফুরিয়ে এসেছে। এবার দৌড়ে ফাঁকি দেয়া নয়, ফাঁকি দিতে হবে কৌশলে।

একটা গাছকে ঠিক পিছনে রেখে বাইসনটার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে পড়েছে শহীদ। ঝড়ের বেগে ছুটে আসছে কদাকার জন্তুটা। এসে পড়েছে। আর এক সেকেণ্ড, গুঁতো মেরে শহীদের দেহটা রক্তাক্ত মাংসপিণ্ডে পরিণত করবে এবার। গাছের সাথে ধাক্কা খেয়ে চ্যাপটা হয়ে যাবে···।

আচমকা বিদ্যুৎ খেলে গেল যেন শহীদের শরীরে। চোখের পলকে লাফ দিয়ে সরে গেল ও এক পাশে।

শহীদের পেট লক্ষ্য করে মস্ত ঘাড় ফুলিয়ে ছুটে আসছিল বাইসনটা। শেষ মুহূর্তে শহীদ সরে গেল, দিক পরিবর্তনের সময় পেল না জন্তুটা।

ইউক্যালিপটাস গাছের মসৃণ কাণ্ডের গায়ে গুঁতো মারল বাইসনটা। ঝড়ের গতি রুদ্ধ হলো। কেঁপে উঠল সুউচ্চ ইউক্যালিপটাস গাছটা। শুকনো পাতাগুলো খসে পড়ল সেই কম্পনে।

গাছের কঠিন কাণ্ডের সাথে ধাক্কা খেয়ে বাইসনের মাথাটা ফেটে চৌচির হয়ে গেছে। গাছের গোড়ায় উল্টে পড়েছে প্রকাণ্ড দেহটা। মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করছে। হাপরের মত, ঘন ঘন বুকটা উঠছে আর নামছে শহীদের। সশব্দে হাঁপাচ্ছে ও। পকেট থেকে মিনি লেজারগানটা বের করল ও। লেজারগানের সাথে বেরিয়ে এল রুমালটা।

মারা যাবে জন্তুটা! বড় কষ্ট পাচ্ছে। যন্ত্রণা থেকে ওটাকে দ্রুত মুক্তি দেবার জন্য লেজারগানটা তুলল শহীদ। লেজারগানের অদৃশ্য রে বাইসনটাকে অদৃশ্য করে দিল মুহূর্তে। ক্লান্তিতে ঘাসের ওপর বসে পড়ল ও। শরীরটা যেন জ্বলছে প্রচণ্ড গরমে। লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল ও। চোখ দুটো বন্ধ করল।

মহুয়া একা কি করছে কে জানে। কথাটা মনে হতেই চোখ মেলে তাকাল ও। আরে, কি ব্যাপার? ভূমিকম্প হচ্ছে নাকি? কিসের ওপর মাথা রেখে শুয়েছে ও? নড়ছে কেন…? মাথা তুলে সিধে হয়ে বসল শহীদ। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতেই ছানাবড়া হয়ে উঠল চোখ দুটো। সর্বনাশ!

সম্মোহিতের মত চেয়েই রইল শহীদ। নড়াচড়ার শক্তি যেন হারিয়ে ফেলেছে ও। ঘাসের উপর হলুদ ডোরাকাটা প্রকাণ্ড একটা বাঘ শুয়ে আছে পাশ ফিরে! এতক্ষণ বাঘটার পেটেই মাথা রেখে শুয়েছিল ও!

নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল শহীদ। ডান হাতে শক্ত করে ধরা লেজারগানটা। দাঁড়াল বটে ও, কিন্তু পা বাড়াল না।

বাঘ ওটা, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এ কেমন বাঘ? চোখ দুটো অমন গাঢ় নীল কেন? নীল চোখের মাঝখানে সাদা মণি। চেয়ে আছে শহীদের দিকে। যেমন শুয়েছিল তেমনি শুয়ে আছে। এ কেমন বাঘ? মাথাটা দেহের তুলনায় কি একটু ছোট? ঠিক বুঝতে পারছে না শহীদ। হাতের তালু দুটো ঘামছে ওর।

আরও একটা বিদঘুটে ব্যাপার চোখে পড়ল শহীদের। বাঘটার গায়ের রঙের সাথে মাথার দিকের রঙের পার্থক্য রয়েছে বেশ একটু। গলা থেকে উপরের অংশটা ডোরাকাটা হলুদ হলেও হলুদ রঙটা এখানে অনেক বেশি গাঢ়। কেউ যেন তুলি দিয়ে রঙ করে দিয়েছে সযত্নে।

খুঁটিয়ে আরও কয়েক মুহূর্ত দেখার পর একটা ভুল ভাঙল ওর। বাঘটা জেগে নেই। ঘুমুচ্ছে চোখ মেলে। বাঘটার চোখ রয়েছে কিন্তু চোখের পাতা নেই।

অতি সন্তর্পণে পা বাড়াল শহীদ। বুকের ভেতর সারাক্ষণ হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে। ভয় যত না পেয়েছে তার চেয়ে বেশি বিমূঢ় হয়ে পড়েছে ও। এ কেমন রহস্য!

কৌতূহল দমিয়ে রাখতে পারছে না শহীদ। নিঃশব্দে বাঘটার পিছনে গিয়ে দাঁড়াল ও, ঝুঁকে পড়ল নিচের দিকে। যা আছে কপালে, সন্দেহ নিরসনের জন্য বনরাজের মাথাটা পরীক্ষা করবে সে। ভয় কি, ডান হাতে তো ধরাই রয়েছে লেজারগান।

বাঘের মাথায় আঙুল দিয়ে প্রথমে মৃদু একটা টোকা দিল শহীদ। তারপর বেশ জোরে আবার টোকা মারল। প্রথমে আস্তে, তারপর বেশ জোরে। টং, টং, করে শব্দ হলো দু'বার।

ধাতব পদার্থ! বাঘের মাথাটা ধাতব পদার্থ দিয়ে তৈরি! ঠাণ্ডা হয়ে গেছে শহীদের হাত-পা। এ কি ব্যাপার! এ কি রহস্য! কে…কার কাণ্ড এটা! এই দ্বীপে কারা আছে!

'আমাকে বিরক্ত করার কোন মানে হয় না। প্লীজ, লেট মি স্লীপ, মাই ফ্রেণ্ড!'

আত্মা খাঁচা ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে শহীদের। কে বলল কথাগুলো! বাঘটা? না আর কেউ?

কম্পিত পায়ে সরে যেতে লাগল শহীদ। এখানে আর এক মুহূর্ত নয়! কিন্তু কথা বলল কে? আশপাশে দ্রুত একবার চোখ বুলিয়ে নিল শহীদ। কেউ নেই। অন্তত

কাউকে দেখা যাচ্ছে না। কেমন যেন দিশেহারার মত হয়ে উঠেছে ও, তাই কথাগুলো কোনদিক থেকে ভেসে এল ঠিক বুঝতে পারেনি।

বাঘটার কাছ থেকে বিশ-পঁচিশ গজ দূরে এসে দাঁড়াল শহীদ। বিশ্বাস করতে পারছে না সে ঘটনাটা। ও কি স্বপ্ন দেখেছে খানিক আগে? রাইসনের তাড়া খেয়ে ক্লান্তিতে শুয়ে পড়েছিল। শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েনি তো? ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখেনি তো?

দ্রুত ঘুরে দাঁড়াল শহীদ। মহুয়া একা কি করছে কে জানে। এ বড় ভয়ঙ্কর দ্বীপে প্রফেসর ওয়াই পাঠিয়েছে ওদেরকে। প্রতি মুহূর্ত চোখ কান খোলা রাখতে হবে। বিপদ যে-কোনদিক থেকে কি রূপ নিয়ে আসবে কেউ তা জানে না।

হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল শহীদ। হাঁটতে হাঁটতে ওর মনে হলো, পথ ভুল করেনি তো? মহুয়াকে কোনদিকে রেখে এসেছিল সে?

এমন সময় গোধূলির নিস্তব্ধতা খান খান করে ভেঙে দিল একটি শব্দ।

পশ্চিমের আকাশ লাল হয়ে উঠেছে। অস্ত গেছে সূর্য। চারদিকে ছায়া-শীতল একটা ভাব। শব্দটা রিভলভারের। গুলির শব্দ শুনে থমকে দাঁড়িয়েছিল শহীদ। হন হন করে হাঁটছে আবার।

মহুয়াকে রিভলভারটা দেবার সময় শহীদ বলে দিয়েছিল পথ হারিয়ে ফেললে ফাঁকা আওয়াজ করতে। মহুয়া সম্ভবত নিজের অবস্থান ওকে জানাবার জন্যই গুলি ছুঁড়েছে।

কিংবা, হয়তো, বিপদে পড়েছে মহুয়া। কিন্তু অশুভ কোন কথা ভাবতে চায় না শহীদ। এমনিতেই ইতিমধ্যে মাথাটা ভারি হয়ে উঠেছে নানা রকম দুশ্চিন্তা আর দুর্ভাবনায়।

চার

মহুয়াকে যেখানে রেখে গিয়েছিল সেখানে তাকে পেল না শহীদ। এদিকে সন্ধ্যা নামছে, চারদিক আঁধার হয়ে আসছে দ্রুত। নানা অশুভ কথা মনে পড়তে লাগল ওর। কোন বিপদে পড়েনি তো মহুয়া? এই দ্বীপে তারা ছাড়াও মানুষ থাকতে পারে। মানুষ হিসেবে তারা কেমন তাও জোর করে কিছু বলা যায় না। গলা ছেড়ে মহুয়ার নাম ধরে ডাকতে গিয়েও ক্ষান্ত হলো শহীদ। যদি মহুয়া সত্যি বিপদে পড়ে থাকে তাহলে তার কাছ থেকে কোন সাড়া তো পাওয়া যাবেই না, বরং শত্রুদেরকে জানিয়ে দেয়া হবে নিজের অবস্থান।

সমুদ্রের কিনারায় চলে গেল শহীদ। আকাশে মেলা বসছে নক্ষত্রদের, একটা একটা করে ফুটছে তারা। কেন যেন, সমুদ্রের গর্জনের সাথে ওর বুকটা হু হু করে উঠল। হাঁটতে হাঁটতে আবার থামল ও।

আবার গুলির শব্দ। এবার কাছাকাছি থেকেই এসেছে আওয়াজটা। বালুকাবেলা ছেড়ে দ্রুত পা বাড়াল শহীদ। বনভূমির ভিতর প্রবেশ করে খানিকটা এগিয়েই থামল ও। মহুয়ার গলা।

'আরও বাঁ দিকে এসো। আমি এই বটগাছটার উপর রয়েছি।'

দ্রুত গাছে চড়ল শহীদ। মহুয়ার বুদ্ধির তারিফ না করে পারল না ও। প্রকাণ্ড একটা বটগাছ বেছে নিয়েছে মহুয়া। এমন চওড়া একটা ডালে বসে আছে ও যে তাতে অনায়াসে দু'জন পাশাপাশি শুয়ে পড়া চলে।

'তোমার ফিরতে দেরি হচ্ছে দেখে···। শহীদ, বাইসনটা···।'

'খুব বুদ্ধির কাজ করেছ। মেরে ফেলেছি ওটাকে।' শহীদ বলল। কিন্তু যান্ত্রিক মাথাওয়ালা বাঘটা সম্পর্কে কোন কথা বলল না ও।

মহুয়া শহীদের একটা হাত ধরে বলল, 'যা ভয় পেয়েছিলাম না। এদিকে—শহীদ, এই দ্বীপে বড় রহস্যময় কাণ্ড ঘটছে, জানো! নিশ্চয়ই এর মধ্যে কোন ঘটনা আছে।'

'কাণ্ড ঘটছে মানে? ঘটনা আছে—কিসের মধ্যে?'

মহুয়া দম বন্ধ করে চাপা উত্তেজনায় বলতে শুরু করল, 'এই গাছে চড়ে তোমার খোঁজে এদিক ওদিক তাকাচ্ছিলাম। হঠাৎ দেখলাম কি জানো?'

'কি?'

মহুয়া বলল, 'তুমি হয়তো আমার কথা বিশ্বাস করবে না। কিন্তু বিশ্বাস করো, আমি ভুল দেখিনি।'

'কি দেখেছ বলোই না ছাই?'

'পাঁচিল। প্রায় দেড় মানুষ সমান উঁচু একটা পাঁচিল। ওই দিকে, মানে পুব দিকের কথা বলছি আমি। পাঁচিলের ওপারে কি আছে দেখা যায় না এখান থেকে। গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে পাঁচিলের খানিকটা অংশ দেখেছি আমি। পাঁচিলের ওপর কাঁটাতারের বেড়াও আছে।'

'হুঁ।' গম্ভীর হয়ে উঠল শহীদ।

একটার পর একটা প্রশ্ন করে চলেছে মহুয়া। এই দ্বীপে তাহলে মানুষ আছে? কারা তারা? পাঁচিল কেন? এই দ্বীপে কি করছে মানুষগুলো? তারা কি ওদেরকে বিরূপ চোখে দেখবে, শত্রু বলে মনে করবে?

চিন্তায় মগ্ন শহীদ। মহুয়ার কোন প্রশ্নেরই উত্তর দিতে পারল না ও। সংক্ষেপে বলল—জানি না।

'কি হলো তোমার? এমন চুপচাপ হয়ে গেলে যে? কি ভাবছ?'

শহীদ বলল, 'না, কি আর ভাবব। ভাবছি পাঁচিলটার কথা। ভুল দেখোনি তো, মহুয়া?'

মহুয়া অভিমান ভরে বলে উঠল, 'আমাকে তুমি কি মনে করো? পরিষ্কার না দেখে তোমাকে এত জোর দিয়ে বলতে পারি?'

প্রসঙ্গ বদলাবার ছলে শহীদ বলল, 'কাল সকালে দেখে আসব পাঁচিলটা। বাদ দাও এখন পাঁচিলের কথা। খিদে পায়নি তোমার?'

'না। তোমার?'

শহীদ অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল আবার। মহুয়ার কথা ওর কানেই যায়নি। অনেকক্ষণ পর মহুয়ার কথায় ওর ধ্যান ভাঙল। অন্ধকার আর তেমন গাঢ় নেই। চাঁদ উঁকি দিচ্ছে পাতার ফাঁক দিয়ে। জানতে চাইল ও, 'কিছু বললে, মহুয়া?'

'হ্যাঁ। কিছু হয়েছে তোমার, শহীদ। বলবে না আমাকে?'

জোর করে হাসল শহীদ। সান্ত্বনা দেবার জন্য বলল, 'কিছুই হয়নি, পাগলী। ভাবছি অনেক কথা।'

'দাদার কথা ভাবছ বুঝি?'

শহীদ বলল, 'হ্যাঁ। সে হয়তো মহাশূন্যের কোন অচেনা গ্রহে পৌঁছে গেছে—কিংবা এখনও তার দেহের অণুগুলো আলোক গতিতে ছুটছে মহাশূন্যের পথ ধরে। কি জানো মহুয়া, কুয়াশার জন্যে তেমন দুশ্চিন্তা করি না আমি। আমি জানি, বিপদ যতই ভয়ঙ্কর হোক, সাধ্যের মধ্যে থাকলে কুয়াশা সামলে নেবে। বেঁচে থাকার যোগ্যতা বা ক্ষমতা কোনটারই তার অভাব নেই। প্রফেসর ওয়াই তাকে যত বড় বিপদের মাঝখানেই ছুঁড়ে দিক, কুয়াশাও তো তার চেয়ে কম না কোন কিছুতে। কুয়াশা হাজার হোক, প্রফেসর ওয়াইয়ের প্রভু তো ছিল এককালে!'

'তাই নাকি! কই, একথা তো কোনদিন দাদা আমাকে বলেনি!'

শহীদ বলল, 'বলেনি সে কাউকেই। এমনকি সব কথা সে আমাকেও বলেনি। তবে যতটুকু বলেছে তার সাথে কিছু অনুমান যোগ করে আসল কথা বুঝে ফেলেছি আমি। আমার অনুমান মিথ্যে হতে পারে না। প্রফেসর ওয়াই, কুয়াশাকে যমের চেয়েও বেশি ভয় করে। কেন?'

'কেন বলো তো?'

শহীদ হঠাৎ নিজেকে সামলে নিল। বলল, 'না, থাক, মহুয়া। এসব কথা আলোচনা করা ঠিক হচ্ছে না। কুয়াশা আমাকে বলেছিল, কাউকে যেন এ সম্পর্কে আমি কোন কথা না বলি। মোট কথা, কুয়াশার জন্য আমি খুব একটা দুশ্চিন্তা করছি না। আমি ভাবছি কামালের কথা। ওর সাথে ডি. কস্টা আছে—তার কথা। আর ভাবছি মি. সিম্পসনের কথা। ওদের কপালে যে কি ঘটছে তা একমাত্র সৃষ্টিকর্তাই বলতে পারেন। ওদেরকে সাহায্য করার কেউ নেই। কুয়াশার তো প্রশ্নই ওঠে না। আমি হয়তো পারতাম—কিন্তু এই দ্বীপ থেকে কবে মুক্তি পাব আদৌ মুক্তি পাব কিনা কে জানে!'

'ছোট ভাইয়ের মত কামালকে কত বকেছি, কত আদর করেছি—আর দেখতে পাব না ওকে একথা ভাবলে কান্নায় বুকটা ফেটে যেতে চায়...' রুদ্ধ হয়ে এল মহুয়ার কণ্ঠস্বর।

চুপ করে রইল ওরা। খানিক পর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল মহুয়া। শহীদ বলল, 'খাবে এবার! খেয়ে নিয়ে তুমি ঘুমিয়ে পড়ো।'

'তুমি?'

শহীদ বলল, 'আমি জেগে থাকব। পাহারা দিতে হবে সারারাত।'

মহুয়া নীরব গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কেন, কোন রকম বিপদের আশঙ্কা করছ নাকি তুমি?'

শহীদ বলল, 'তা ঠিক না। তবে বলাও তো যায় না। অচেনা জায়গা, কি ঘটে না ঘটে বলা যায়?'

মহুয়া বলল, 'তাহলে আমিও জেগে থাকব।'

খাবার প্যাকেটে পাওয়া গেল সুস্বাদু খাদ্য সামগ্রী। সিদ্ধ ডিম, বাটার টোস্ট, জেলী, পনির, মধু, কাজু বাদাম, আপেল এবং ব্র্যাণ্ডিভরা চকোলেট। এদিক থেকে কিছুমাত্র কার্পণ্য করেনি প্রফেসর ওয়াই। খাওয়া শেষ হতে মহুয়া বলল, 'দ্বিতীয় প্যাকেটটা কাল সকালের জন্য রইল। তারপর!'

'তারপর বুনো ফল আর ডাবের পানি।'

মিষ্টি সুরে হেসে উঠল মহুয়া। বলল, 'তাই বা মন্দ কি। তবে ভাগ্য ভাল হলে পাঁচিলের ওপারের মানুষগুলোর সাথে একটা মধুর সম্পর্ক গড়ে…।'

'পাঁচিলের ওপারে মানুষ না-ও থাকতে পারে, মহুয়া। মনে নেই, প্রফেসর ওয়াই বলেছিল—জনমানবহীন একটা দ্বীপে পাঠাচ্ছি তোমাদেরকে?'

'কিন্তু মানুষ না থাকলে পাঁচিল এল কোথা থেকে?'

চুপ করে রইল শহীদ। মহুয়া একই প্রশ্ন দ্বিতীয়বার করতে ও শুধু বলল, 'জানি না।'

খানিকক্ষণ থেমে থাকার পর মহুয়া বলল, 'মানুষ যদি সত্যি না থাকে তাহলে তো আরও ভাল। কেউ বিরক্ত করবে না আমাদেরকে। দুজনে বেশ আনন্দেই থাকব। জায়গাটা জঙ্গলে ভরা হলেও বাইসন ছাড়া অন্য কোন হিংস্র জন্তু-জানোয়ার নেই, তাই না? রাত তো বেশ হয়েছে, থাকলে এতক্ষণে বাঘের গর্জন আর হায়েনার কুৎসিত হাসিতে কেঁপে উঠত চারদিক, কি বলো?'

কোন মন্তব্য করল না শহীদ। অনেকক্ষণ কেটে গেল। একটা সিগারেট ধরাল শহীদ। গভীর চিন্তায় মগ্ন? এক সময় মহুয়ার কথা স্মরণ হতে বলে উঠল, 'তোমার শাড়ির আঁচলটা দাও দেখি আমাকে। গাছের সাথে বেঁধে রাখি। তা না হলে পড়ে যেতে পারো।'

'ঘুম আসছে না যে।'

'জেগে থাকো। যদি ঘুমিয়ে পড়ো, তাই বলছি। শুয়ে পড়ো দেখি।'

আপত্তি করল না মহুয়া। গাছের সাথে মহুয়াকে শাড়িটা দিয়ে বেঁধে দিল শহীদ। তার পাশে নিজেও চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল। গাছের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে চাঁদের অংশ বিশেষ। সেদিকে তাকিয়ে কুয়াশার কথা মনে পড়ল ওর। মহুয়াকে আসলে সান্ত্বনা দিয়েছে সে। কুয়াশার বেঁচে থাকার সম্ভাবনা যে কত ক্ষীণ তা সে ভাল করেই জানে। ড. কুটজের মহাকাশযান যদি বিধ্বস্ত হয়েই থাকে, সে গ্রহে অক্সিজেন থাকবে তার কি নিশ্চয়তা?

একটা রাত জাগা পাখি গাছের উপর দিয়ে তীক্ষ্ণস্বরে ডাকতে ডাকতে উড়ে গেল। শহীদ ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল মহুয়ার দিকে, 'ঘুমালে নাকি?'

একটা হাত খামচে ধরল শহীদের কাঁধের মাংস। চাপা উত্তেজনায় কাঁপছে মহুয়ার নিচু গলা, 'শুনছ!'

পাথরের মত শক্ত হয়ে গেছে শহীদের মাংসপেশী। পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে ও। কারা যেন কথা বলছে।

'বলো কি হে। ইউ হ্যাভ সীন উইথ ইওর ওউন আইজ! মোস্ট ইন্টারেস্টিং! তা, কথাবার্তা কিছু হলো তোমার সাথে লোকটার?'

দ্বিতীয় কণ্ঠস্বরটাও প্রথমটার মত কেমন যেন ঘরঘরে যান্ত্রিক বলে মনে হলো, 'ঘুমের দরকার ছিল তখন আমার। তাই আলাপ করার কথা ভাবিনি।'

প্রথম কণ্ঠস্বর বলে উঠল, 'মন্দ নয়, কি বলো? এরপর দেখা হলে আলাপ করো। খবর দিতে ভুলো না যেন আমাকে। তা, মাস্টারদেরকে জানিয়েছ কথাটা!'

'না। মাস্টাররা তো আমাদের কথা ভুলেই গেছে। দেখা করারই সুযোগ পাই না

দ্বিতীয় কণ্ঠস্বরটা বলল, 'মিথ্যে বলোনি। মাস্টাররা আর আমাদের ব্যাপারে মাথা ঘামায় না।'

শহীদ নিঃশব্দে উঠে বসল। নিচের বনভূমিতে চাঁদের আলো আর ঘন কালো ছায়া মিলেমিশে একাকার। পরিষ্কার কিছু দেখা যাচ্ছে না। কণ্ঠস্বর দুটোর অবস্থান লক্ষ্য করে নির্দিষ্ট একদিকে চেয়ে রইল শহীদ। উঠে বসেছে মহুয়াও। সে-ও তাকিয়ে আছে।

কাউকে দেখা যাচ্ছে না কোথাও। আর কোন শব্দও নেই। অনেক, অনেকক্ষণ কেটে গেল। শিরদাঁড়া ব্যথা করতে শুরু করল শহীদের। উশখুশ করছে মহুয়াও।

'শহীদ! বাঘ!' চাপা গলায় বলে উঠল মহুয়া। শহীদ চাঁদের আলোয় পরিষ্কার দেখতে পেল বাঘটাকে। বটগাছটার খানিকটা দূর দিয়ে হেলেদুলে হেঁটে যাচ্ছে। একা নয়, আরও একটা বড়সড় জানোয়ার রয়েছে বাঘটার সাথে। নিজের চোখকে বিশ্বাস করা কঠিন—এমন দৃশ্য কেউ কোনদিন দেখেছে! বাঘটার সাথে, পাশাপাশি হাঁটছে একটা গরু।

দেখতে দেখতে বাঘ এবং গরুটা অদৃশ্য হয়ে গেল গাছপালার আড়ালে।

'শহীদ!'

শহীদ যেন অনেক দূর থেকে উত্তর দিল, 'বলো।'

'স্বপ্ন দেখলাম না তো?'

'না।'

মহুয়া ঢোক গিলল, গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে তার। 'বাঘ—বাঘের সাথে ওটা কি দেখলাম?' মহুয়ার কণ্ঠে অবিশ্বাসের সুর, 'তা কি করে সম্ভব? বাঘ আর গরু···পাশাপাশি হাঁটছে···মনে হচ্ছে দু'জন দু'জনের বন্ধু···'

'এখানকার নিয়ম আলাদা। এখানে বাঘ-গরু একঘাটে জল খায়। খুব কড়া শাসন কিনা!'

'শাসন? কাদের শাসন?'

'তা তো জানি না!'

মহুয়া বলে উঠল, 'ঠাট্টা করছ তুমি! ভয় করছে না তোমার? অবাক লাগছে না?'

শহীদ মৃদু হাসল, 'ভয় করছে। অবাকও লাগছে! কিন্তু করার কিছু নেই।'

মহুয়ার প্রশ্নের শেষ নেই, 'কারা কথা বলছিল বলো তো?'

'দেখতে পাইনি।'

মহুয়া চিন্তিত, 'মানুষ তাহলে সত্যি আছে। ওরা কি আমাদেরকে···!

শহীদ বাঁকা স্বরে বলল, 'মানুষ আছে? দেখেছ তুমি স্বচক্ষে?'

মহুয়া বিরক্ত হলো, 'তার মানে? কি বলতে চাইছ তুমি? না দেখলে কি হয়েছে, পরিষ্কার শুনলাম কথাগুলো। বাংলায় কথা বলছিল ওরা, ইংরেজিও জানে…'

শহীদ বলল, 'হুঁ। অনেক হয়েছে। দয়া করে এবার ঘুমাও। সকাল থেকে কাজে নামতে হবে।'

'কি কাজ?'

শহীদ সিগারেট ধরাল। ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'কাল সকালেই শুনো।'

রাতটা কাটল নিরুপদ্রবে। সূর্য ওঠার আগেই ঘুম ভাঙল মহুয়ার, 'ওমা! আমি সত্যি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম নাকি!'

শহীদ নামছে গাছ থেকে। নামতে নামতেই জিজ্ঞেস করল, 'সমুদ্র স্নান—রাজি!'

'শাড়ি পেটিকোট কই? চান করে পরব কি?'

মুচকি হাসল শহীদ। বলল, 'বাকি জীবনটা এখানে নাকি থাকতে চাও বলেছিলে যে! একটা শাড়ি পেটিকোট কত দিন চলবে? গাছের ছাল বা পাতা দিয়ে তৈরি পোশাকই তো ব্যবহার করতে হবে।'

'যখন হবে তখন হবে। আমি গোসল করব না।'

'কোরো না। আমি করব। দেখার ইচ্ছা থাকলে এসো।'

সমুদ্র স্নান করল শহীদ। বালুকাবেলায় দাঁড়িয়ে রইল মহুয়া। ইচ্ছা হচ্ছিল ওরও ঝাঁপিয়ে পানিতে নামতে। কিন্তু ভিজে কাপড়ে থাকতে হবে সারাদিন ভেবে নিজেকে সামলে রাখল জোর করে।

দ্বিতীয় প্যাকেটের খাবার উদরস্থ করল ওরা। ফ্লাস্কের পানিও শেষ। মহুয়া বলল, 'চা হলে বড় ভাল হত।'

শহীদ হাসল, 'সবচেয়ে ভাল হত নিজেদের বাড়িতে ফিরে যেতে পারলে, কি বলো?'

শুকিয়ে গেল মহুয়ার মুখটা বাড়ির কথা মনে পড়ে যেতে। বলল, 'কি যে অবস্থা করছে লেবু আর সন্দেশ বাড়ির, আল্লাই জানে। শহীদ, সত্যি আমরা কি ফিরতে পারব না কোনদিন এখান থেকে?'

'ইতিমধ্যেই খারাপ লাগতে শুরু করেছে? এখনও তো তেমন অসুবিধের কারণ ঘটেনি। আজ দুপুর থেকেই মজাটা বুঝবে। খেতে হবে বুনো ফল আর ডাবের মিষ্টি পানি।'

'না-না! শহীদ, আমি বাড়ি ফিরব!' ঘনঘন মাথা নেড়ে কাঁদো কাঁদো গলায় বলে উঠল মহুয়া।

'এই রে, এ যে দেখছি কেঁদে ফেলবে! অধৈর্য হয়ো না, দ্বীপের চারদিকটা দেখব আজ ভাল করে। দেরি নয়, পাঁচিলটা কোন্ দিকে দেখেছিলে মনে আছে তো? পুব দিকে, কেমন? হাঁটো তাহলে। ভাগ্য ভাল হলে দেশে ফেরার একটা উপায় পেয়েও যেতে পারি।'

'সত্যি? চলো তাহলে।'

আশায়-আনন্দে খুশি হয়ে উঠল মহুয়া। কিন্তু শহীদ জানে, সেটা অত সহজ নয়। বাড়ি ফেরা তো দূরের কথা, প্রাণ বাঁচানো সম্ভব কি না সে ব্যাপারেও ঘোর সন্দেহ দেখা দিয়েছে ওর মনে।

এখানে আসার পর থেকে যা যা দেখেছে ও সেগুলোর তাৎপর্য অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়নি শহীদ। সে জন্যেই ওর মনে অমন ভয় ঢুকেছে।

পাঁচ

পাঁচিলটা খুব বেশি দিনের পুরাতন নয়। প্লাস্টার খসে পড়েনি কোথাও, শ্যাওলাও জমেনি। প্রায় দুই মানুষ সমান উঁচু হবে। মহুয়ার কথাই ঠিক, কাঁটাতারের বেড়াও রয়েছে। শহীদের সন্দেহ হলো, তারের বেড়াটা ইলেকট্রিফায়েড। ছুঁলেই মৃত্যু।

'কি ভাবছ? পাঁচিলের ওপর উঠবে নাকি? তা আমি উঠতে দেব না তোমাকে!'

মহুয়া শঙ্কিত। শহীদ বলল, 'পাঁচিলে উঠব না এখন। উঠব ওই উঁচু গাছটায়। ভিতরটা দেখা দরকার।'

কি দরকার দেখার!

শহীদ বলল, 'বাহ্! ভিতরে কি আছে, কারা আছে জানতে হবে না? কৌতূহল মেটাব বলেই না এলাম।'

মহুয়া বলল, 'তাহলে আমিও গাছে চড়ব।'

শহীদ সাহায্য করল মহুয়াকে। উঁচু একটা জাম গাছের উপর উঠল ওরা। পাঁচিলের ওপারেও গাছপালার সমারোহ। কিন্তু পাতার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে পাকা একটা রাস্তা। গাছপালার ভিতর দিয়ে খানিকদূর গিয়ে বাঁক নিয়ে আরও ভিতর দিকে চলে গেছে। সবটা রাস্তা দেখা যাচ্ছে না। ডান দিকের অনেকদূর ফাঁকা, কোন গাছপালা নেই। গম্ভীর হলো শহীদ। বহুদূর অবধি দেখা যাচ্ছে। ফাঁকা একটা মাঠের পর সাদা ধব ধবে একটা দোতলা বিল্ডিং। বেশ বড়সড়। উপর নিচে কম করেও বিশ-পঁচিশটা কামরা নিশ্চয়ই আছে।

রাস্তায় বা বাড়িটার সামনে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। রাস্তার পাশে লাইট পোস্ট দেখা যাচ্ছে। ত্রিশ পঁয়ত্রিশ গজ দূরের একটা গাছের দিকে দৃষ্টি পড়তে ভুরু কুঁচকে উঠল শহীদের। গাছের ডালে বাঁধা রয়েছে কি ওটা!

চিনতে পারল জিনিসটাকে শহীদ। টিভি ক্যামেরা। নিচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরল শহীদ। দ্রুত চিন্তা করছে ও। টিভি ক্যামেরা—তারমানে বাড়ির ভিতর যারা আছে তারা এই মুহূর্তে টিভিতে দেখতে পাচ্ছে ওদেরকে।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দূরের বাড়িটার দিকে চেয়ে রইল শহীদ! কেউ না কেউ বেরুবে বাড়িটা থেকে, আশা করছে ও।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পরও কাউকে বাড়ি থেকে বেরুতে দেখল না শহীদ। মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে ও, ভিতরে ঢুকতে হবে। তবে গা ঢাকা দিয়ে। টিভি ক্যামেরার চোখকে ফাঁকি দিয়ে।

'শহীদ! মাগো! কী ওটা!' চেঁচিয়ে উঠল মহুয়া। পড়ে যাচ্ছিল সে, চট করে

ধরে ফেলল শহীদ।

মহুয়ার দৃষ্টি অনুসরণ করে পাঁচিলের ওপারের অপ্রশস্ত পাকা রাস্তাটার বাঁকের দিকে তাকাতেই গায়ের রক্ত বরফের মত ঠাণ্ডা হয়ে গেল শহীদের। আতঙ্কের হিমশীতল স্পর্শ উঠে আসছে শরীর বেয়ে উপর দিকে।

রাস্তার বাঁকে দাঁড়িয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে আছে মূর্তিমান একটা রাক্ষস। দেখতে হুবহু মানুষের মত হলেও আকারে মানুষের চেয়ে তিনগুণ বড়। হাত দুটো প্রায় মাটি ছুঁই ছুঁই করছে। মাথাটা সেই তুলনায় প্রকাণ্ড, সূর্যের আলো প্রতিফলিত হচ্ছে কামানো মাথা থেকে। চোখ দুটো যথাস্থানে থাকলেও আকারে এক একটা বড় সাইজের আপেলের মত। চোখমুখের চেহারায় কোন বিশেষ ভাব ফুটে নেই। শুধু চেয়ে আছে ওদের দিকে। ওটার দিকে তাকালে অসমসাহসী যে-কোন মানুষের বুকের রক্ত পানি হয়ে যেতে বাধ্য।

সংবিৎ ফিরে পেয়ে পকেট থেকে বের করে আনল শহীদ মিনি লেজারগানটা। পিছনের ক্যাপটা খুলতে গিয়ে লক্ষ্য করল, হাত দুটো কাঁপছে। ডায়ালের কাঁটা অ্যাডজাস্ট করে রাক্ষসটার দিকে মারণাস্ত্রটা তুলে ধরতেই মহুয়া চিলের মত ছোঁ মেরে কেড়ে নিল সেটা।

'না! মেরো না ওটাকে, শহীদ। ওটার সাথে নিশ্চয়ই আরও অনেক আছে! ওদেরকে ঘাঁটাবার দরকার নেই। যেমন আছে তেমনি থাক। চলো, এখান থেকে সরে যাই আমরা। এদিকে আর না এলেই হবে!'

তাকিয়ে আছে শহীদ রাক্ষসটার দিকে।

'মাগো, কী ভয়ঙ্কর!' মহুয়া চোখ বন্ধ করে ফেলল। থর থর করে সর্বশরীর কাঁপছে তার।

শহীদের হঠাৎ মনে হলো, রাক্ষসটা হাসছে দাঁত বের করে। ঠিক তাই। হলুদ দাঁত দেখা যাচ্ছে দু'সারি। এক একটা দাঁত এক একটা দিয়াশলাইয়ের বাক্সের সমান। হঠাৎ রাক্ষসটা ঘুরে দাঁড়াল। শিরশির করে উঠল শহীদের গা। লম্বা লম্বা পা ফেলে হাঁটছে অতিকায় মানুষটা। এক একটা পদক্ষেপে দু'গজ পেরিয়ে যাচ্ছে অনায়াসে। চলমান পেশীবহুল মাংসের পাহাড়টা অদৃশ্য হয়ে গেল গাছ-পালার আড়ালে।

একটা দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠল যেন ওরা। পরস্পরের দিকে তাকাল। কারও মুখে কথা ফুটল না।

সারাটা দিন অস্বাভাবিক উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠার মধ্যে রইল শহীদ। চোখ-কান খোলা রেখে মহুয়াকে নিয়ে ঘুরে বেড়াল দ্বীপটার এদিক ওদিক। পাঁচিলের পাশ ঘেঁষে হাঁটল। সমুদ্র থেকে শুরু হয়েছে পাঁচিলটা, শেষও হয়েছে সমুদ্রের মধ্যে গিয়ে। দ্বীপটার মাঝ বরাবর এই পাঁচিল।

দুপুরবেলা কলা আর জামরুল খেয়ে ক্ষুধার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে। রাতের জন্যও পেড়ে রেখেছে কিছু। ডাব প্রচুর। কিন্তু নির্ভেজাল পানির স্বাদ কি আর ডাবের পানিতে মেটে? কিন্তু উপায় কি, দুধের সাধ ঘোলেই মেটাতে হচ্ছে।

খুবই নার্ভাস হয়ে পড়েছে মহুয়া। শহীদ ওকে নানা ভাবে চেষ্টা করেছে সান্ত্বনা দেবার। অভয়দানের সব চেষ্টাই অবশ্য ব্যর্থ হয়েছে। মহুয়ার আতঙ্ক এবং দুর্ভাবনা, কোনটাই দূর করতে পারেনি ও।

দুপুর গড়িয়ে যাবার পর শহীদ কথাটা পাড়ল। খেপে উঠল মহুয়া। এতটা আশঙ্কা করেনি শহীদ। ও ভেবেছিল মহুয়া ভয় পাবে, আপত্তি করবে ঠিকই কিন্তু মরিয়া হয়ে উঠবে না।

'না-না-না-না! আমি তোমাকে কোন মতে যেতে দেব না! আমি বেঁচে থাকতে তুমি ওই পাঁচিলের ওপারে যেতে পারবে না! ওদিকে পা বাড়িয়ে দেখো, আমি আত্মহত্যা করব!'

বোঝাতে চেষ্টা করল শহীদ, 'উত্তেজিত হয়ো না, মহুয়া। আমার যুক্তিটা শোনো। তারপর না হয়···।'

'না! তোমার কোন কথাই আমি শুনতে চাই না। আমি জানি, আমার মন বলছে, পাঁচিলের ওপারে যাওয়া মানে মৃত্যুর হাতে নিজেকে সঁপে দেওয়া। জেনেশুনে আমি তোমাকে মরতে যেতে দিতে পারব না।'

কথা বাড়াল না শহীদ। কিন্তু এরপর সন্ধ্যার খানিক আগে, প্রসঙ্গটা আবার তুলল ও। এবার অন্যভাবে বলল, 'মহুয়া, এই দ্বীপে আমরা নিরাপদ নই, একথা তো বিশ্বাস করো?'

'করি।'

'পাঁচিলের ওপারে যারা আছে তাদের উদ্দেশ্য কি, ক্ষমতা কতটুকু কিছুই জানি না আমরা। হয়তো ওরা আমাদেরকে শত্রু বলে মনে করছে না। হয়তো···।'

'শত্রু বা মিত্র, যাই মনে করুক, আমরা ওদিকে যাব না।' দৃঢ় কণ্ঠে বলল মহুয়া।

শহীদ শান্তভাবে বলল, 'তোমার কথাতে যুক্তি আছে, স্বীকার করি। জেনে শুনে বিপদের মধ্যে পা বাড়ানো বোকামি। কিন্তু, ধরো, ওরা যদি আক্রমণ করে? আমাদেরকে বন্দী করতে আসে?'

'যখন আসবে তখন দেখা যাবে। সহজে পারবে না ওরা আমাদের সাথে। আমাদের হাতে লেজারগান আছে।'

শহীদ বলল, 'ঠিক বলেছ। লেজারগান থাকতে ভয় কি আমাদের। কিন্তু আমি ভাবছি এই দ্বীপ থেকে মুক্তি পাবার উপায় কি? জানো, আমার কি ধারণা? পাঁচিলের ওপারেও সমুদ্র আছে, শেষ মাথায়। ও দিকের সমুদ্রে থাকতে পারে কোন ইয়ট বা জাহাজ। যদি সেই ইয়ট বা জাহাজ দখল করতে পারি তাহলে দেশে ফেরা কোন সমস্যাই নয়। কিন্তু পাঁচিলের ওপারে না গিয়ে তো আর জাহাজ বা ইয়টের সন্ধান পাব না। লেজারগান রয়েছে আমাদের; কেউ বাধা দিতে এলেই তাকে খতম করে ফেলতে পারব। তুমি ভেবে দেখো দেখি ভাল করে।'

মহুয়ার সেই একই কথা, 'না। দেশে ফিরতে না পারি, না পারব। তাছাড়া জাহাজ বা ইয়ট ওদিকে আছে কিনা তাই বা নিশ্চয় করে জানছ কিভাবে তুমি?'

'থাকতেও তো পারে।'

'নাও তো থাকতে পারে?'

শহীদ হাল ছেড়ে দিয়ে বলল, 'নাহ্! তোমাকে বোঝানো আমার কম্ম নয়।'

সারাটা দিন হাঁটাহাঁটি করার ফলে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে ওরা। মানসিক শক্তির অপব্যয়ও কম হয়নি। মহুয়া সেই বটগাছের প্রশস্ত ডালে শুয়ে পড়ল সন্ধ্যার পরই। অনেক অনুরোধেও খাওয়া-দাওয়া করল না সে।

সিগারেটের প্যাকেট থেকে সর্বশেষ সিগারেটটা বের করে ধরাল শহীদ। মনে মনে ভেবে রেখেছে একটা কাজের কথা। কিন্তু কাজটা করা উচিত হবে কি হবে না ঠিক করতে পারছে না সে এখনও।

ঘুমিয়ে পড়েছে মহুয়া। শাড়ি দিয়ে ডালের সাথে তাকে বেশ মজবুত করে বেঁধেও ফেলেছে শহীদ। কিন্তু মনস্থির করতে পারছে না ও এখনও। উচিত হবে কি মহুয়াকে একা এই গাছের উপর রেখে যাওয়া? যদি কোন বিপদ দেখা দেয়। যদি একটা বাঘ বা সাপ গাছে চড়ে আক্রমণ করে মহুয়াকে? কিংবা হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে যদি পাশে ওকে দেখতে না পেয়ে গাছ থেকে নেমে খুঁজতে চেষ্টা করে?

না, মহুয়াকে একা রেখে যাওয়াটা বোধহয় উচিত হবে না। জানিয়ে যেতে পারলে এক কথা ছিল—কিন্তু জানলে মহুয়া ওকে যেতে দেবে না। অথচ চুপচাপ বসে থাকাও উচিত হচ্ছে না। পাঁচিলের ওপারে কারা আছে, কি করছে তারা, কি করতে চায়—সব জানা দরকার। ওদের সম্পর্কে জানা না জানার উপরই নির্ভর করছে বাঁচা মরার সমাধান, পরবর্তী কর্তব্য নির্ধারণের সূত্র।

রাত বাড়ছে ক্রমশ। সমুদ্রের গর্জন ভেসে আসছে দূর থেকে। ঝিঁঝি পোকার ডাক চারদিকে। অস্থিরতা অনুভব করছে শহীদ। কিছু একটা করা দরকার। এভাবে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা তার স্বভায় নয়।

শেষ পর্যন্ত মরিয়া হয়ে উঠল ও। ঝুঁকে পড়ে নক্ষত্র আর চাঁদের আলোয় আলোকিত মহুয়ার মুখটা দেখল। ঘুমাচ্ছে অঘোরে। নিঃশব্দে নড়ে উঠল শহীদ। নামতে শুরু করল গাছের উপর থেকে।

একটি কঠিন কণ্ঠস্বর বাধা দিল শহীদকে। 'নেমো না!'

সুড় সুড় করে উঠে এল শহীদ মহুয়ার পাশে, 'তুমি ঘুমাওনি?'

সংক্ষিপ্ত উত্তর মহুয়ার, 'না।'

রাতটা কেটে গেল। ভোরের দিকে চোখ দুটো আপনা থেকেই বুজে এসেছিল শহীদের। গাছের গায়ে হেলান দিয়ে বসা অবস্থাতেই নিদ্রাদেবীর কোলে ঢলে পড়েছিল ও। ঘুম ভাঙল একটা দুঃস্বপ্ন দেখে। গাছের নিচে সেই ভয়ঙ্কর রাক্ষসটা এসে দাঁড়িয়েছে। মহুয়া ভয়ে চিৎকার করছে···।

চোখ মেলে মৃদু হাসল শহীদ। পাশেই শুয়ে রয়েছে মহুয়া। ঘুমাচ্ছে বেঘোরে। একটা প্রজাপতি বসেছে তার এলো চুলে।

কোথায় রাক্ষস? স্বপ্নই। মাথাটা ঘুরিয়ে নিচের দিকে তাকাল শহীদ ছ্যাঁত করে উঠল বুক। ঠিক গাছের নিচেই দাঁড়িয়ে রয়েছে···।

দাঁত বের করে হাসছে অতিকায় মানুষটা। গাছের কাণ্ডের উপর অস্বাভাবিক

লম্বা একটা হাত, অপর হাতটা কোমরে। চোখেমুখে আত্মবিশ্বাসের ছটা ফুটে রয়েছে। মুখ হাঁ করল হঠাৎ, বিরাট একটা গহ্বরের সৃষ্টি হলো। গুরু গুরু মেঘের ডাকের মত শব্দ বেরিয়ে এল: 'তোমাদেরকে নিতে এলাম। নেমে পড়ো।'

প্যান্টের পকেটে শহীদের ডান হাতটা অতি সন্তর্পণে ঢুকে যাচ্ছে। মিনি লেজারগানটা বের করে আনল ও আলগোছে। ডায়ালের কাঁটা অ্যাডজাস্ট করাই আছে।

'কে তুমি? কে পাঠিয়েছে তোমাকে?' সাহসে বুক বেঁধে প্রশ্ন করল শহীদ।

'আমি সুপারম্যান। আমাকে পাঠিয়েছেন ব্রেইনী মাস্টাররা।'

'ব্রেইনী মাস্টার? কারা তারা?'

কণ্ঠস্বর তো নয়, যেন বাঁশ ফাটছে, 'তাঁরা আমার স্রষ্টা। তাঁরা অজেয়, অমর। তাঁদের মৃত্যু নেই, জরা নেই, শোক নেই, তাপ নেই, দুঃখ নেই, বোধ নেই! আছে শুধু উচ্চাশা! তাঁরা তোমাদেরকে চান। তোমাদের ওপর এক্সপেরিমেন্ট চালাবেন।'

কেঁপে উঠল শহীদের কণ্ঠ, 'তুমি ফিরে যাও, গিয়ে বলো, আমরা যাব না। আমরা তাদের হুকুমের চাকর নই।'

রাক্ষসটা বিকট শব্দে হেসে উঠল। বলল, 'তাঁরা চান তোমাকে আমার মত সুপারম্যানে রূপান্তরিত করতে। তাতে তুমিও উপকৃত হবে। ভয় থাকবে না তোমার, ঘৃণা থাকবে না। থাকবে না শোক, তাপ, দুঃখ, সুখ। অমর না হলেও মৃত্যু সহজে ঘায়েল করতে পারবে না তোমাকে। শত শত বছর বাঁচিয়ে রাখবেন ব্রেইনী মাস্টাররা তোমাকে। আর তোমার স্ত্রী—মিসেস মহুয়াকে নিয়ে ব্রেইনী মাস্টাররা নতুন ধরনের একটা এক্সপেরিমেন্ট করতে চান। ইতিমধ্যে হিংস্র জন্তুদের ওপর এই এক্সপেরিমেন্ট চালানো হয়েছে—অপারেশন সাকসেসফুল। কিন্তু এবার একজন মানুষের ওপর এক্সপেরিমেন্ট চালানো হবে। মিসেস মহুয়ার দেহটা ঠিকই থাকবে, শুধু কেটে ফেলে দেয়া হবে গলা থেকে উপরের অংশ অর্থাৎ মুণ্ডুটা। ওই জায়গায় নতুন একটা যান্ত্রিক মুণ্ডু বসানো হবে। এসবই ব্রেইনী মাস্টারদের সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছা মোতাবেক ঘটবে।'

শহীদের চোখ জোড়া কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে। হাতের তালু ঘামছে। লেজারগানটা হাত থেকে পিছলে পড়ে যাবে মনে করে আরও জোরে মুঠো করে ধরল ও। হাতটা কাঁপছে থরথর করে। ঘাড় না ফিরিয়েও বুঝতে পারল ও মহুয়ার ঘুম ভেঙে গেছে। খানিক পর পর সশব্দে হাঁপাচ্ছে সে।

'তোমাদের ব্রেইনী মাস্টারদেরকে গিয়ে বলো আমরা যাব না। পাগলদের পাগলামির শিকার হবার চেয়ে আমরা আত্মহত্যা করব!' মহুয়া চেঁচিয়ে উঠল শহীদের পাশ থেকে।

রাক্ষসটা গম্ভীর হলো, 'ব্রেইনী মাস্টারদের এ ব্যাপারে কিছু করার নেই। তাঁরা তাঁদের সৃষ্টিকর্তার কাছ থেকে নির্দেশ পেয়েছেন।'

'কে সে?'

রাক্ষসটা ভক্তিতে গদগদ হয়ে নামটা উচ্চারণ করল: 'প্রফেসর ওয়াই।'

শহীদ দাঁতে দাঁত চেপে বলে উঠল, 'ও, সেই শয়তানটার কারসাজি তাহলে! যাও, তুমি তাকে গিয়ে জানাও আমরা যাব না।'

'যেতে হবে। আমি তোমাদেরকে নিতে এসেছি।' রাক্ষসটা অবলীলায় গাছের উপর উঠে আসছে।

শহীদ মিনি লেজারগানটা তুলে ধরল রাক্ষসটার দিকে। মহুয়া ওর ডান হাতটা চেপে ধরতে এক ধাক্কায় সরিয়ে দিল তার হাতটা ও। রাক্ষসটা উঠে আসছে। পৌঁছে গেছে প্রায়। হাত বাড়ালেই ধরতে পারে সে শহীদকে। লাল বোতামে চাপ দিল শহীদ। এক নিমেছে গাছের মোটা মোটা কয়েকটা ডালসহ রাক্ষসটা বাষ্প হয়ে উড়ে গেল উপর দিকে।

দুই হাতে মুখ ঢেকে ডুকরে কেঁদে উঠল মহুয়া।

আধ ঘণ্টা ধরে বোঝাল শহীদ মহুয়াকে। শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ যাত্রায় রাজি হলো সে। শহীদের যুক্তিগুলো অকাট্য। রাক্ষসটা নিহত হয়েছে জানার পর স্বভাবতই প্রফেসর ওয়াইয়ের সৃষ্ট ব্রেইনী মাস্টাররা পাল্টা প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করবে। কিন্তু সে সুযোগ তাদেরকে দেয়া উচিত হবে না মোটেই। আচমকা পাঁচিলের ওপারের শত্রুদেরকে অপ্রস্তুত অবস্থায় আক্রমণ করে ধ্বংস করতে হবে। পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে এখন। যারা আগে আক্রমণ করবে জয়ের সম্ভাবনা তাদেরই বেশি। ওদের সাথে লেজারগান রয়েছে, সুতরাং ভয়ের কিছুই নেই।

পাঁচিলের নিচে পৌঁছুল ওরা। চারদিক নিস্তব্ধ, থমথমে। মাত্র সকাল, সূর্য এখনও মাথার ওপর উঠে আসেনি। শীতল ঠাণ্ডা ছায়ার মধ্যে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে শহীদ কান পেতে। পাশ থেকে মহুয়া কথা বলে উঠল, 'ব্রেইনী মাস্টাররাও বুঝি ওই রাক্ষসটার মত দেখতে?'

'ঠিক বলতে পারছি না। সম্ভবত অন্য রকম চেহারা হবে ওদের।'

'আরও ভয়ঙ্কর?'

উত্তর দিল না শহীদ। কোথাও কোন শব্দ নেই। গাছে চড়ে ভিতরটা একবার দেখে নিলে কেমন হয়? কিন্তু তার দরকারই বা কি। লেজারগান দিয়ে পাঁচিলের খানিকটা গায়েব করে দিলেই তো হয়।

তাই করল শহীদ। কাঁটা তারের বেড়াসহ পাঁচিলের খানিকটা অংশ লেজারগানের অদৃশ্য আলোয় ভস্মে পরিণত হলো। মহুয়ার হাত ধরে পাঁচিলের ওপারে প্রবেশ করল শহীদ। বনভূমির মধ্যে দিয়ে পা বাড়াল দ্রুত। শুকনো পাতার উপর দিয়ে হাঁটছে ওরা। মুড়মুড় করে ভাঙছে শুকনো পাতা। চঞ্চল দৃষ্টিতে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে শহীদ। গাছের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে অপ্রশস্ত পাকা রাস্তা। থমকে দাঁড়াল শহীদ। একটা গাছের উপরের ডালে বাঁধা রয়েছে একটা টিভি ক্যামেরা। লেজারগান তুলল ও। টিভি ক্যামেরাটাকে ভস্মে পরিণত করে পা বাড়াল আবার।

আচমকা একটা গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল···চকচকে ইস্পাত দিয়ে তৈরি পুরোপুরি মানুষের মত দেখতে একটা রোবট।

শহীদ অবাক হলো না। ব্রেইনী মাস্টাররা রোবট বা যান্ত্রিক মানুষ জাতীয় কিছু হবে তা সে আগেই অনুমান করেছিল।

আপাদমস্তক সম্পূর্ণ স্টেনলেস স্টীল দিয়ে তৈরি রোবট। পা দুটো ছোট ছোট।

লম্বার তুলনায় চওড়া একটু বেশি। জানালা-দরজাহীন কামরাটার কথা মনে পড়ল শহীদের। নিজেদেরকে ওখানে আবিষ্কার করার পর ছোট ছোট পায়ের চিহ্ন দেখেছিল ওরা।

রোবটটার পা দুটো মোটা পাইপের মত। হাঁটুর জয়েন্টগুলো স্ক্রু দিয়ে আঁটা, সাদা দুধের মত প্লাস্টিকের আচ্ছাদন সেখানে। উরু দুটো পুরোপুরি গোলাকার। মোটা ইস্পাতের বেল্ট কোমরটাকে বেড় দিয়ে রেখেছে। নাভির জায়গায় লাল টকটকে একটা বোতাম দেখা যাচ্ছে। বুকটা মসৃণ, চকচকে। কোমরের মোটা বেল্টের ভিতর থেকে বাঁকা রড বেড়িয়ে এসেছে, রডগুলোর অপর প্রান্ত গিয়ে প্রবেশ করেছে কাঠের ভিতর। গোটা বুকটা রডের জাল দিয়ে ঘেরা। গলার স্থান দখল করেছে কড়ে আঙুলের সমান মোটা তারের প্যাঁচানো কয়েল। তারের উপর তার জড়ানো, বেশ মোটা গলা।

রোবটের মুখটা চারকোনা। দু'পাশে দুটো গর্ত, কিন্তু ঢাকনি নেই। সামনের দিকটায় মুখের বদলে ইস্পাতের সরু তারের ঝাঁঝরি। নাকের জায়গায় একটা নীল প্লাস্টিকের লম্বা সুইচ। চোখ দুটোর মণি আছে, জবা ফুলের মত লাল, দামী পাথরের মত আলো ছড়াচ্ছে। চোখের পাতা নেই। কপালটা মসৃণ। মাথার মাঝখান থেকে দুটো মোটা তার বেরিয়ে এসে দুদিকে বেঁকে গিয়ে প্রবেশ করেছে কানের দুটো গর্তে। গালের দু'পাশে দুটো টর্চ লাইটের মত কাঁচ। কাঁচের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছে একটা থেকে হলুদ, অপরটি থেকে গোলাপী রঙের উজ্জ্বল আলো। সারাক্ষণ জ্বলছে, নিভছে; জ্বলছে, নিভছে।

শহীদ লক্ষ্য করল রোবটটার হাতে কোন অস্ত্র নেই। চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলে উঠল যান্ত্রিক মানুষ, 'স্বাগতম! আমি যাচ্ছিলাম তোমাদেরকে নিয়ে আসার জন্য। তোমরা নিজেরাই এসেছ দেখছি। গুড। এসো, আমার পিছু পিছু এসো।'

শহীদের হাতে লেজারগানটা প্রস্তুত। অধৈর্য হয়ে উঠেছে মহুয়া। নিচু গলায় বলে উঠল সে, 'শেষ করছ না কেন এখনও!'

শহীদ রোবটটার উদ্দেশ্যে বলল, 'নিজেরাই এসেছি আমরা। নিশ্চয়ই অনুমান করে নিয়েছ? তোমাদের সুপারম্যানকে গায়েব করে দিয়েছি আমি!'

'কাজটা ভাল করোনি। ও ছিল আমাদের একমাত্র সুপারম্যান। যাক, যা হবার হয়েছে। তোমাকেও আমরা সুপারম্যানে রূপান্তরিত করব। জানো নিশ্চয়ই, সুপারম্যান তৈরি করার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিটা কি? মানুষের শরীর হচ্ছে সেলের সমষ্টি। গ্রুপস অব সেলকে বলা হয় গ্ল্যাণ্ডস। সব গ্ল্যাণ্ডেরই কাজ হলো রাসায়নিক পদার্থ তৈরি করা। এই রাসায়নিক পদার্থের কোনটার নাম হরমোন, কোনটার নাম আইয়োডিন। বহুল আলোচিত এইরকম একটি গ্ল্যাণ্ড রয়েছে গলায়। এটার নাম, জানো নিশ্চয়, থাইরয়েড। থাইরয়েড যে কেমিক্যালস তৈরি করে সেটার রঙ ভায়োলেট, সবাই সেটার নাম দিয়েছে আইয়োডিন। থাইরয়েড যদি অস্বাভাবিক বেশি পরিমাণে আইয়োডিন তৈরি করতে শুরু করে তাহলে মানুষ তার স্বাভাবিক আকৃতির চেয়েও অনেক বড় হয়ে উঠবে। থাইরয়েড সাধারণত তা করে না। তা না করুক। আমরা তার ব্যবস্থা করতে সক্ষম হয়েছি। থাইরয়েডকে বাতিল করে তার

জায়গায় আমাদের আবিষ্কৃত একটা গ্ল্যাণ্ড জটিল অপারেশনের মাধ্যমে সংযুক্ত করে দিই। আমাদের থাইরয়েড প্রচুর পরিমাণে আইয়োডিন সরবরাহে সক্ষম। ফল সহজেই বোঝা যায়। যে মানুষের ওপর এই অপারেশন করা হয় সে দিনে দিনে বড় হতে থাকে। বাড়তে থাকে তার হাত-পা-মাথা—বাড়তে বাড়তে সাধারণ একটা মানুষের চেয়ে তিনগুণ, এমনকি চারগুণ বড় আকার লাভ করে সে। মোস্ট ইন্টারেস্টিং—তাই না? আমরা এই এক্সপেরিমেন্ট তোমার ওপর চালাব। তুমি ভাগ্যবান, মি. শহীদ। কংগ্রাচুলেশনস!'

শহীদ লেজারগান তুলল। লাল বোতামটার ওপর ওর একটা আঙুল ছোঁয়ানো। কঠিন গলায় কথা বলে উঠল শহীদ, 'তোমরা শয়তান প্রফেসরের পাগলামির শিকার। তোমরা প্রকৃতির অবদান সৃষ্টির সেরা একটা মানুষকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছ। আমি তোমাদের এলাকায় ঢুকেছি আত্মসমর্পণের জন্যে নয়, তোমাদেরকে ধ্বংস করার জন্যে।'

ছুটির ঘণ্টা যেমন দ্রুত তালে বাজে তেমনি দ্রুত ঘণ্টাধ্বনি বেরিয়ে আসতে লাগল রোবটটার ভিতর থেকে। অর্থাৎ অট্টহাসিতে ফেটে পড়ছে সে। হাসি থামিয়ে সে বলল, 'ওই একটা লেজারগান হাতে থাকায় এত বড় বড় কথা বলছ—কেমন? কিন্তু ওটার কোনই মূল্য নেই, মি. শহীদ।'

'দেখাচ্ছি, মূল্য আছে কি না···।'

লাল বোতামটায় আঙুলের চাপ দিতে গেল শহীদ। কিন্তু একি! কে যেন ছোঁ মেরে কেড়ে নিল তার হাত থেকে লেজারগানটা। ঘটনাটা এক সেকেণ্ডেরও কম সময়ের মধ্যে ঘটে গেল। বিদ্যুৎবেগে মহুয়ার হাতের দিকে তাকাল শহীদ। কিন্তু মহুয়ার হাত শূন্য, লেজারগানটা নেই তার হাতেও।

'ওটা আমার হাতে!' রোবটটা বলে উঠল যান্ত্রিক কণ্ঠে। তাকাল শহীদ। সবিস্ময়ে দেখল সত্যিই তাই, লেজারগানটা রোবটের বাঁ হাতে রয়েছে।

'ম্যাগনেটের যাদু! বুঝতে পারছ তো? এবার, মি. শহীদ, সস্ত্রীক এগিয়ে এসো।'

মহুয়া উপস্থিত বুদ্ধি খাটাল এই সময়। শহীদের একটা হাত শক্ত করে ধরে ছুট মারল পিছন দিকে। মহুয়ার সাথে ছুটল শহীদও। বন্দী হওয়া চলবে না, পালাতে হবে এদের আওতা থেকে।

পিছন থেকে তেড়ে আসছে রোবটের দ্রুত তালের ঘণ্টাধ্বনি—অট্টহাসিতে ফেটে পড়ছে সে।

ছুটছে ওরা। ঝোপঝাড় টপকে খিঁচে দৌড়ুচ্ছে। কিন্তু পিছন থেকে ওদের দু'জনের কাঁধ চেপে ধরল দুটো লোহার মত শক্ত হাত। বাধা পেয়ে দাঁড়াতে বাধ্য হলো ওরা। শহীদের একটা হাত নিজের ঘাড়ে গিয়ে উঠল। ঠাণ্ডা ধাতব পদার্থের স্পর্শ অনুভব করল ও।

ঘাড় বাঁকিয়ে পিছন দিকে তাকাল শহীদ। রোবটটা দাঁড়িয়ে আছে সেই একই জায়গায়। এক পাও এগোয়নি সে। কিন্তু নিজে না এগোলেও বাড়িয়ে দিয়েছে তার হাত দুটো। দুই হাতের কব্জি দুটো স্প্রীঙ-এর মাথায়, স্প্রীঙ দুটো বেরিয়ে এসেছে

দুই হাতের দুই পাইপের ভিতর থেকে। লম্বা প্রায় আট থেকে দশ গজ—শহীদ এবং মহুয়ার কাঁধ পর্যন্ত।

ছয়

ঢাকা।

তিন বিঘা জমির মাঝখানে সদ্য তৈরি সুউচ্চ হালফ্যাশনের অট্টালিকাটা দাঁড়িয়ে আছে। অট্টালিকার চারপাশে উঁচু পাঁচিল। শহরের প্রখ্যাত ব্যবসায়ী এমরান চৌধুরী এই অট্টালিকার মালিক। সম্প্রতি তিনি এটি নির্মাণ করেছেন।

অট্টালিকার আটতলায় এমরান চৌধুরী বাস করেন। এলিভেটর ছাড়া উপরে ওঠার আর কোন রাস্তা নেই। এমরান চৌধুরীর কড়া নির্দেশ, একটা পিঁপড়েও যেন এলিভেটরে চড়ে বা দেয়াল বেয়ে আটতলায় উঠতে না পারে।

প্রকাণ্ড একটা হলরুমের একপ্রান্তে একাধিক টেলিভিশনের পর্দার দিকে মুখ করে বসে আছেন এমরান চৌধুরী। ডান পাশে দাঁড়িয়ে আছে তার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ সহচর।

প্রকাণ্ড হলরুমের চারদিকে ছোট বড় নানা আকৃতির মহামূল্যবান জটিল, সূক্ষ্ম, ভারি যন্ত্রের সমাবেশ ঘটেছে। একাধিক কমপিউটর, ওয়্যারলেস সেট, ম্যাটার ট্র্যান্সমিশন ইকুইপমেন্ট, ট্র্যান্সমিটার রেডিও, টিভি, রাডার, ইন্টারকম ছাড়াও এমন সব ভারি ও হালকা যন্ত্রপাতি রয়েছে যেগুলোর সাথে বাইরের দুনিয়ার কোন বিজ্ঞানীর পরিচয় নেই।

এমরান চৌধুরী ওরফে প্রফেসর ওয়াই এই সব যন্ত্রপাতি ও মেশিনারীর আবিষ্কারক। এটা তাঁর কন্ট্রোলরুম।

রিভলভিং চেয়ারে বসে মুচকি মুচকি হাসছেন প্রফেসর ওয়াই। হাত দুটো ডেস্কের উপর লম্বা করে মেলে দেয়া। ডান হাতের কাছেই একটা বোর্ড। বোর্ডে ডজন দুয়েক নানা রঙের সুইচ। বাঁ হাতে ধরা একটা চুরুট। নীলচে ধোঁয়া উঠে যাচ্ছে এঁকেবেঁকে সিলিঙের দিকে।

প্রফেসর ওয়াইয়ের ডেস্কের সামনে অনেকগুলো টিভির একটি চালু রয়েছে। প্রফেসর টিভি দেখছেন। ক্ষণে ক্ষণে তাঁর মুখের চেহারা বদলে যাচ্ছে। কখনও অট্টহাসিতে ফেটে পড়ছেন, কখনও সকৌতুকে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ছেন, কখনও মুচকি হাসি ফুটছে ঠোঁটে।

টিভির পর্দায় দেখা যাচ্ছে মাঝারি আকারের একটি কামরা। কামরার মাঝখানে সামান্য ব্যবধান রেখে পাতা রয়েছে দুটো বেড। দুই বেডে শুয়ে আছে দু'জন। দুজনেরই হাত-পা লোহার বেডের সাথে বাঁধা। প্রথম বেডে শুয়ে রয়েছে মহুয়া। দ্বিতীয় বেডে শহীদ।

বেডের চারদিকে পাঁচ-ছয়টা রোবট ঘোরাফেরা করছে। ধীরস্থির ভঙ্গিতে এক একজন এক একটা কাজ করছে। কেউ মাইক্রোস্কোপে চোখ লাগিয়ে রক্তের নমুনা পরীক্ষা করছে, কেউ শহীদের হার্ট বিটের সংখ্যা জেনে নিচ্ছে বুকের উপর একটা যন্ত্র

চেপে ধরে, কেউ মহুয়ার বেডের পাশের টেবিলে সাজিয়ে রাখছে অপারেশনের জন্যে একান্ত প্রয়োজনীয় ছুরি, কাচি, সুচ এবং নানা রকম ওষুধপত্র।

বোঝা যাচ্ছে, শহীদ ও মহুয়ার অপারেশন একই সাথে শুরু হবে। তারই প্রস্তুতি চলছে।

প্রফেসর ওয়াই সাগ্রহে দেখছেন গোটা ব্যাপারটা। মাঝে মধ্যে তিনি সুইচ বোর্ডের বোতামে চাপ দিচ্ছেন। রোবটগুলোকে পরিচালিত করছেন রেডিও সিগন্যালের মাধ্যমে।

'ম্যাটাবর!'

চুরুটে টান দিয়ে ম্যাটাবর ম্যাটবেক মন্টোগোমারী ওরফে মাতবরের দিকে একমুখ নীলচে ধোঁয়া ত্যাগ করলেন প্রফেসর ওয়াই হুশ্ করে।

'ইয়েস, স্যর!'

ম্যাটাবরের জন্ম লণ্ডনে। লেখাপড়া শিখেছে অক্সফোর্ড এবং কেম্ব্রিজে। প্রফেসর ওয়াইয়ের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে সে উনিশশো আটষট্টি সালে। বিজ্ঞানের প্রতি নিবেদিত প্রাণ বলে প্রফেসর ওয়াই ম্যাটাবরকে ডান হাতের পদমর্যাদা দিয়ে প্রায় সর্বক্ষণ সাথে থাকার সুযোগ দিয়েছেন।

'দেখছ, শখের গোয়েন্দা, আইমীন, টিকটিকি মি. শহীদের অবস্থা। ফ্রম নাউ ইটস এ ম্যাটার অভ টেন মিনিট্স ওনলি, মি. টিকটিকির পরিবর্তন শুরু হয়ে যাবে। কয়েক দিনের মধ্যে চারগুণ আকার লাভ করবে সে। তার নাম হবে সুপারম্যান! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!' কেঁপে উঠল কন্ট্রোলরুমটা প্রফেসরের অট্টহাসিতে।

হাসি থামতে আবার কথা বলতে শুরু করলেন প্রফেসর ওয়াই, 'মি. কুয়াশার পর এই লোকটাকেই আমি একটু ভয় করতাম। আমার ক্ষতি করার কোন ক্ষমতা এর না থাকলেও বড্ড সাহসী এই টিকটিকি। কাজের ব্যাঘাত ঘটাতে ওস্তাদ। এবার একেও কাবু করে ফেলা যাচ্ছে। সুপারম্যান হওয়ার পর আমূল পরিবর্তন হবে ওর। দুঃখ থাকবে না, ঘৃণা থাকবে না, শোক থাকবে না—এককথায় বোধহীন, অনুভূতিহীন, আবেগহীন এক যন্ত্র হয়ে যাবে ও। নিজের বুদ্ধি বলে কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না ওর ভিতর। আমি যা বলব ও তাই পালন করবে অক্ষরে অক্ষরে। চমৎকার হবে, তাই না?'

'ইয়েস, স্যর।'

প্রফেসর চুরুটের দিকে তাকালেন ভুরু কুঁচকে। ডেস্ক থেকে লাইটারটা তুলে নিয়ে অগ্নিসংযোগ করলেন ধীরেসুস্থে, তারপর আবার বলতে শুরু করলেন, 'ওর স্ত্রী, আই মীন, মিসেস খানের ওপর নতুন একটা এক্সপেরিমেন্ট চালানো হচ্ছে। নতুন ঠিক নয়, এর আগেও এই এক্সপেরিমেন্ট চালিয়েছি আমি। তবে সেগুলো বাঘ আর গরুর মধ্যেই সীমিত ছিল। এক্সপেরিমেন্ট সবগুলোই সফল হয়েছে। হিংস্র বাঘ গোবেচারা ভাল মানুষে পরিণত হয়েছে। ঘাস দিলে ঘাস খায়, খেতে না দিলেও প্রতিবাদ জানায় না। হিংস্রতা একেবারেই নেই, গর্জন করার অভ্যাস তো ছেড়েছেই, টুঁ শব্দটিও করে না সাধারণত। ম্যাটাবর, আমি প্রথম প্রথম ভেবেছিলাম মানুষ নামের কোন প্রাণীকেই রাখব না এই পৃথিবীতে। কিন্তু পরে ভেবে ঠিক

করেছি, মানুষগুলোকে সম্পূর্ণ বাতিল না করে ওদের মুণ্ডুটা বাতিল করে দেব। নতুন যান্ত্রিক মুণ্ডু বসিয়ে মানুষ জাতটাকে আমি আরও উন্নত, বুদ্ধিমান করে গড়ে তুলব। এই পৃথিবী হবে যান্ত্রিক মাথাওয়ালা মানুষের রাজ্য।'

'কিন্তু, স্যার, তা কি সম্ভব?'

'হোয়াই নট? সম্ভব নয় কেন? কেউ বাধা দেবে ভাবছ আমার পরিকল্পনায়? নো, ম্যাটাবর, নো! আমাকে বাধা দেবার মত আর কেউ নেই। ছিল একজন, কিন্তু এখন সে কোথায়? বিলিভ মি, আই ডোন্ট নো! তার সৃষ্টিকর্তাই একমাত্র জানে কি দশা তার হয়েছে, কোথায় সে আছে কিংবা আদৌ সে আছে কিনা।'

'স্যার, আপনি কি মি. কুয়াশার কথা বলছেন?'

'সার্টেনলি! সেই পারত আমার কাজে বাধা দিতে। এতবড় দুনিয়ায় একমাত্র তাকেই আমি সত্যিকার অর্থে ভয় করতাম। এখন আর কোন ভয় নেই। মহাশূন্যে পাঠিয়ে দিয়েছি তাঁকে আমি। এখনও হয়তো তিনি মহাশূন্যের পথ ধরে আলোক গতিতে ছুটে চলেছেন, হয়তো এমনি ভাবেই ছুটতে থাকবে তাঁর দেহের বিচ্ছিন্ন অণুগুলো শত কোটি বছর ধরে। সে যাই হোক, ম্যাটাবর, একটা ব্যাপারে আমি সেন্ট পারসেন্ট শিওর, মি. কুয়াশা বেঁচে থাকুন বা মরে যান, এই পৃথিবীতে আর কোন দিন ফিরে আসা তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না।'

ম্যাটাবরের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে প্রফেসর ওয়াই তাকালেন টেলিভিশনের উজ্জ্বল পর্দার দিকে। চেঁচিয়ে উঠলেন: 'আহ্, ম্যাটাবর! লক্ষ্য করোনি, ওদিকে যে অপারেশনের সব প্রস্তুতি শেষ!'

দ্রুত কয়েকটা সুইচে চাপ দিলেন প্রফেসর।

টিভিতে দেখা যাচ্ছে, একটা রোবট একটা হাইপডারমিক সিরিঞ্জ হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মহুয়ার সামনে। আর একটা রোবট দাঁড়িয়ে আছে শহীদের বেডের সামনে। তার হাতেও একটা হাইপডারমিক সিরিঞ্জ। সিরিঞ্জের সূচটা প্রবেশ করিয়ে দিল সে শহীদের বাহুতে। হালকা হলুদ রঙের মেডিসিন সিরিঞ্জ থেকে সূচের মধ্যে দিয়ে প্রবেশ করছে শহীদের শরীরে, মিশে যাচ্ছে রক্তের সাথে। ইঞ্জেকশন দেয়া শেষ হতে রোবটটা সরে গেল, তার জায়গা দখল করল আর একটা রোবট। শহীদের চোখমুখে ফুটে উঠেছে তীব্র যন্ত্রণার ছাপ। হাত-পা ছোঁড়ার চেষ্টা করছে ও। কিন্তু নাইলনের কর্ড দিয়ে বাঁধা বলে নড়াচড়ার উপায় নেই। দ্বিতীয় রোবটের হাতে ধারাল একটা ছুরি দেখা যাচ্ছে।

মহুয়ার বাহুতেও ইঞ্জেশন দেয়া হলো। আর একটা রোবট মহুয়ার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। তার হাতেও ছুরি দেখা যাচ্ছে। ছুরি না বলে এটাকে ছোরা বলাই ভাল। এর সাহায্যে অনায়াসে জবাই করা চলে গরু-ছাগল।

ধীরে ধীরে অবশ হয়ে আসছে শহীদের শরীর। বুজে আসছে চোখের পাতা দুটো। নিঃশেষ হয়ে আসছে শক্তি।

জ্ঞান হারাল একসময় শহীদ। মহুয়াও চোখ বুজল, স্থির হয়ে গেল তার দেহটা।

প্রফেসর ওয়াইকে পরিপূর্ণ সন্তুষ্ট দেখাচ্ছে। অদ্ভুত একটা উজ্জ্বলতা খেলা করছে তাঁর মুখের চেহারায়। বিজয়উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি, 'এইবার!'

দ্রুত কয়েকটা বোতামে চাপ দিলেন আবার।

রোবটগুলো সচল হলো আবার। শহীদের গলার কাছে ছুরি নিয়ে দাঁড়িয়েছে একটা রোবট। মহুয়ার গলা দ্বিখণ্ডিত করার জন্য দ্বিতীয় রোবটটিও প্রস্তুত। এমন সময় কামরার ভিতর প্রবেশ করল আরও চার-পাঁচজন রোবট। তারা শহীদ এবং মহুয়ার চারপাশে বিভক্ত হয়ে দাঁড়াল।

প্রফেসর ওয়াই হাত বাড়ালেন ডেস্কের সুইচবোর্ডের দিকে। লাল কয়েকটা সুইচে চাপ দিতে যাচ্ছেন তিনি।

এমনসময় ঝন ঝন শব্দে ভেঙে পড়ল জানালার কাঁচের শার্সি! ঝট্ করে ঘাড় ফিরিয়ে জানালার দিকে তাকালেন প্রফেসর ওয়াই। জানালায় পর্দা ঝুলছে। দুলছে সেটা।

'ম্যাটাবর! কে ওখানে!'

প্রফেসর গর্জে উঠলেন। পরমুহূর্তে পড়পড় করে শব্দ উঠল। কে যেন টেনে ছিঁড়ে ফেলল জানালার ভারি পর্দার কাপড়টা।

জানালার পর্দা ছিঁড়ে যেতেই দেখা গেল অ্যাস্ট্রোনটের পোশাকপরা প্রকাণ্ডদেহী একজন আগন্তুককে। বাদুড়ের ডানার মত দীর্ঘ দুই হাত দুইদিকে মেলে দিয়ে লাফ দিয়ে পড়ল আগন্তুক কন্ট্রোলরুমের মেঝেতে। পা থেকে মাথা অবধি ভারি পোশাকে ঢাকা আগন্তুকের। চেহারা দেখার কোন উপায় নেই। মেঝেতে নেমেই দক্ষযজ্ঞ কাণ্ড শুরু করে দিল সে। জানালা গলে যেন একটা বজ্র প্রবেশ করেছে রুমের ভেতর। প্রবেশ করেই সজোরে ছুঁড়ে দেয়া টেনিসবলের মত দিগ্বিদিক ছুটে যাচ্ছে। আগন্তুক আধমণ ওজনের ঘুসি মেরে চুরমার করে দিল ডেস্কের উপরকার সুইচ বোর্ডটা। বাঁ হাতটা চলে গেল ডেস্কের নিচে। অসংখ্য তার মেঝে ফুঁড়ে চলে গেছে নিচের দিকে। সবগুলো তার মুঠোয় ধরে হেঁচকা টান মারল সে, ছিঁড়ে গেল সব তার। তড়াক করে লাফ দিয়ে ট্র্যান্সমিটার যন্ত্রের সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে। সুইচ অফ করল সেটার। এক পা পিছিয়ে এসে লাথি মারল অন করা প্রকাণ্ড এক যন্ত্রের কাঁচের ডায়ালে। সবেগে ছুটে গিয়ে ধাক্কা খেলো সেটা দেয়ালের সাথে। ক্যাঙ্গারুর মত লাফ মেরে কন্ট্রোলরুমের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে ছুটোছুটি করতে লাগল আগন্তুক। অফ করল অসংখ্য সুইচ, নামিয়ে ফেলল একাধিক যন্ত্রের হ্যাণ্ডেল, ভেঙে চুরমার করে দিল অন করা অনেকগুলো মেশিন।

ঘটনাগুলো ঘটল ন্যূনতম সময়ের মধ্যে। আগন্তুককে বাধা দেবার মত সময়ই পেলেন না প্রফেসর ওয়াই বা তাঁর সহচর ম্যাটাবর।

প্রফেসর ওয়াই রিভলভিং চেয়ার ত্যাগ করে উঠে দাঁড়াবার সময়টুকুর মধ্যে ঘটে গেছে এতগুলো কাণ্ড। টিভির পর্দায় দেখা যাচ্ছে এখনও রোবটগুলোকে। কিন্তু সবগুলো রোবট অচল, অনড়, দাঁড়িয়ে আছে—এতটুকু নড়ার ক্ষমতা নেই কারও। ওগুলোকে পরিচালনা করার জন্য যে-সব মেশিন কাজ করছিল সেগুলো এখন বিধ্বস্ত জঞ্জালে পরিণত হয়েছে।

আগন্তুক সোজা হয়ে দাঁড়াল। মাস্কের ভিতর থেকে কথা বলে উঠল সে, 'চিনতে পারো, ওয়াই?'

অবাক বিস্ময় ফুটে উঠল প্রফেসর ওয়াইয়ের দুই চোখে। অবিশ্বাসভরা দৃষ্টিতে আগন্তুকের দিকে চেয়ে রইলেন তিনি, 'মাই গড! ও মাই গড! হাউ ক্যান আই বিলিভ! ইটস কোয়াইট ইমপসিবল বাট মোর ট্রু দ্যান রিয়্যালিটি! ও মাই গড!'

'আমার পক্ষে সবই সম্ভব, ওয়াই। আশা করি ভবিষ্যতে আমার ব্যাপারে তুমি আরও সাবধান হবে। তোমাকে কঠিন কোন শাস্তি দিলাম না আজ। কিন্তু বাড়াবাড়িটা তোমার মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে, ওয়াই। সাবধান না হলে ভবিষ্যতে কঠিন শাস্তি অপেক্ষা করছে তোমার জন্যে। কথাটা মনে রেখো। আজ শুধু ধ্বংস করে দিলাম তোমার এই কন্ট্রোলরুম! চললাম!'

আগন্তুক কথাগুলো বলে এক লাফ দিয়ে জানালার উপর উঠে দাঁড়াল।

'ম্যাটাবর! স্টেনটা! স্টেনটা দাও আমাকে ম্যাটাবর!' প্রফেসর ওয়াই চিৎকার করে উঠলেন।

আগন্তুক লাফ দিল আবার। আটতলা উঁচু জানালা থেকে অন্ধকার শূন্যে মিলিয়ে গেল সে। ছুটে জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন প্রফেসর ওয়াই।

জানালার কাছ থেকে সরে যাচ্ছে প্রকাণ্ড পিরিচের মত একটা স্পেসক্রাফট, ক্রমশ উপরে উঠে যাচ্ছে সেটা।

বিমূঢ় বিস্ময়ে উপর দিকে চেয়ে রইলেন প্রফেসর। সসারের মত আকৃতিবিশিষ্ট স্পেসক্রাফট প্রায় পাঁচশো গজ উপরে উঠে গিয়ে শূন্যে ভাসছে।

'সর্বনাশ! ম্যাটাবর! সর্বনাশ হতে যাচ্ছে!'

'কি হলো স্যার!' পাশে এসে দাঁড়াল ম্যাটাবর।

প্রফেসর ওয়াই কাঁপছেন, 'ম্যাটাবর! ভ্যানিশিং রে? জলদি দাও! ওহ গড! ওহ গড! দেরি কোরো না, ম্যাটাবর! ভ্যানিশিং রে! ভ্যানিশিং রে।'

কামানের ছুটন্ত গোলার মত কন্ট্রোলরুম থেকে বেরিয়ে গেল ম্যাটাবর।

প্রফেসর ওয়াই জানালা দিয়ে মাথা গলিয়ে দিয়ে উপর দিকে তাকিয়ে চেঁচাচ্ছেন অবিরাম, 'ম্যাটাবর! কোথায় তুমি! এখনও আনতে পারলে না!'

মাথার চুল ছিঁড়ছেন প্রফেসর ওয়াই, 'ম্যাটাবর! সর্বনাশ হয়ে গেল, ম্যাটাবর! হলো না শেষ রক্ষা! সব ধ্বংস হয়ে গেল! সব ধ্বংস হয়ে গেল! বড্ড দেরি করে ফেললে তুমি, ম্যাটাবর!'

উন্মাদের মত জানালার কাছ থেকে সরে এলেন প্রফেসর ওয়াই! দুই হাত দিয়ে মাথার চুল ছিঁড়ছেন। টলছে বিশাল দেহটা। টলতে টলতে একটা দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। দরজার গায়ে লেখা 'এলিভেটর!'

দরজা খুলে এলিভেটরে ঢুকলেন প্রফেসর ওয়াই।

পরমুহূর্তে বোমাটা পড়ল।

প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ কাঁপিয়ে তুলল চারদিকের পাঁচ সাত মাইল এলাকা।

ধোঁয়া এবং আগুনের লেলিহান শিখা গ্রাস করল প্রফেসর ওয়াইয়ের সুউচ্চ অট্টালিকাকে।

আধঘণ্টা পর বাতাসের সাথে ধোঁয়ারাশি সরে যেতে দেখা গেল প্রফেসর ওয়াইয়ের সুউচ্চ অট্টালিকাটি মিশে গেছে মাটির সাথে। ইঁট-কাঠ-ইস্পাতের

ভস্মীভূত স্তূপ ছাড়া সেখানে কিছুই নেই আর।

সাত

এভারেস্ট। পৃথিবীর উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গ।

শতবর্ষেরও আগের ঘটনা, তৎকালীন সার্ভে জেনারেল অব ইণ্ডিয়া এর উচ্চতা নির্ণয় করেন এবং প্রমাণ করেন যে এই গিরিশৃঙ্গটিই পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু শৃঙ্গ। ভদ্রলোকের নাম ছিল স্যার জর্জ এভারেস্ট। তাঁর সম্মানার্থেই পৃথিবীর এই সর্বোচ্চ শৃঙ্গের নামকরণ করা হয় মাউন্ট এভারেস্ট। স্যার জর্জ এভারেস্টের হিসেব অনুয়ায়ী মাউন্ট এভারেস্টের উচ্চতা ২৯০০২ ফিট।

সাড়ে পাঁচ মাইল উঁচু এই মহাকায় পর্বতের উপরিভাগ বছরের সর্বক্ষণ তুষার আর বরফে ঢাকা থাকে। পর্বতগাত্রের উপর স্তূপীকৃত তুষার ভারি হয়ে উঠলে ধস নামে। সৃষ্টি হয় তুষার নদের। সেই তুষারের নদী সশব্দে নামতে থাকে নিচের দিকে। তিব্বত হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত, তুষার নদ তিব্বতের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়। এই তুষার নদের নাম রাঙবাক। অনেকসময় এই স্তূপীকৃত তুষার শক্ত বরফে পরিণত হয়। তারপর যখন উত্তাপ পেয়ে এই বরফ গলতে শুরু করে, সৃষ্টি হয় হিমবাহের। কোটি কোটি টন জমাট বরফ উপর থেকে ধেয়ে নামতে শুরু করে নিচে।

হিমালয়ের উপরের দিকে তুষার ঝড় বয়ে চলেছে সারাক্ষণ। অসংখ্য অভিযাত্রীদল এভারেস্টকে জয় করতে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছে। সর্বপ্রথম শেরপা তেনজিং এবং স্যার এডমণ্ড হিলারী এভারেস্টের চূড়ায় আরোহণ করে প্রমাণ করেন মানুষের অসাধ্য কোন কাজ নেই।

এভারেস্টের উপর দাঁড়িয়ে নিচের পৃথিবীর কিছুই দেখা যায় না। কারণ মেঘের রাজ্য এভারেস্টের অনেক নিচে। তাছাড়া তুষার এবং হিমবাহ থেকে উত্থিত বাষ্প এবং কুয়াশা ঢেকে রাখে নিচের পৃথিবীকে।

এভারেস্টের বাতাসে অক্সিজেনের দারুণ অভাব। কিন্তু কামাল এবং ডি. কস্টার কোন অসুবিধেই হলো না এভারেস্টে পৌঁছে। দুজনেরই পিঠে অক্সিজেন সিলিণ্ডার বাঁধা রয়েছে, মুখ-মাথা প্লাস্টিকের ফাঁপা মাস্কে ঢাকা।

ছোট একটা গুহার মধ্যে নিজেদেরকে আবিষ্কার করল ওরা। ধপ্ করে ডি. কস্টা একটা কাঠের বাক্সের উপর বসল। মাস্কের ভিতর থেকেই কথা বলে উঠল সে, 'প্রফেসর ওয়াই আনডাউটেডলি ব্লাফ ডিয়াছে। টকেটিভ, পুওর ফেলো! বলে কিনা টোমাডেরকে এভারেস্ট পাঠাইয়া ডিব! যট্টোসব! এভারেস্টে গুহা ঠাকিটে পারে? ইহাকে কি এভারেস্ট বলিয়া মনে হইটেছে! যট্টোসব ইডিয়োটিক কঠা-বার্টা! ম্যাটার ট্রান্সমিশন যন্ত্র—ব্লাফ!'

গুহার ভিতর কয়েকটা কাঠের মুখ বন্ধ করা বাক্স, পাটের দড়ির গোটাচারেক বাণ্ডিল, শাবল, ইস্পাতের রড, চটের ব্যাগ ভর্তি হাতুড়ি, একপোয়া ওজনের বড় বড় পেরেক, ইত্যাদি যন্ত্রপাতি ছাড়াও টুকিটাকি আরও কিছু জিনিসপত্র দেখা যাচ্ছে।

গুহার মুখের সামনে বড় একটা পাথর। ফলে বাইরেটা ভাল দেখা যাচ্ছে না।

কামাল ফিরে এল গুহায়। এইমাত্র বাইরেটা দেখার জন্য বেরিয়ে গিয়েছিল সে।

'ডি. কস্টা, উঠুন! আমরা সত্যিই এভারেস্টে রয়েছি! মাত্র আধঘণ্টা সময় হাতে, অক্সিজেনের অভাবে এবার মারা যাব দম বন্ধ হয়ে!'

দেয়ালে হেলান দিয়ে পায়ের উপর পা তুলে দিয়ে ডি. কস্টা মুচকি হাসল। বলল, 'প্রফেসর ওয়াইয়ের কঠা মাইণ্ড ঠেকে বহিষ্কার করিটে পারিটেছেন না, কেমন? আপনার কমনসেন্স অ্যাণ্ড বুড্ডি লাপাত্তা হইয়া গেছে ডেকিটেছি! ফর গডস সেক, নার্ভাস হইবেন না, মি. কামাল! আমি হাপনাকে নিশ্চয়টা ডিটেছি, দিস ইজ নট এভারেস্ট।'

মাস্কের ভিতর দাঁতে দাঁত চাপল কামাল, 'মরতে চান বুঝি! বেশ মরুন। আমি চললাম।'

কামাল দ্রুত চটের ব্যাগ থেকে বের করে নিল কয়েকটা একপোয়া ওজনের পেরেক, একটা হাতুড়ি। লম্বা পেরেকগুলো পকেটে ভরল সে। তুলে নিল দুটো দড়ির বাণ্ডিল। পিছন দিকে না তাকিয়ে বেরিয়ে গেল সে গুহার বাইরে।

ডি. কস্টার নড়ার নাম নেই। কামালের গমন পথের দিকে তাকিয়ে মাথা দোলাতে দোলাতে আপনমনেই বলে উঠল, 'বেচারা! প্রফেসর ওয়াই ইহার ব্রেনটা স্পয়েল করিয়া ডিয়াছে— পুওর ফেলো!'

কাঠের বাক্সগুলোর দিকে তাকাল সে। বাক্সগুলোর উদ্দেশ্যে বলে উঠল, 'পেটের ভিটর গোল্ড অর সামথিং লাইক দ্যাট, আছে, টাই না? ওয়েট, স্যার, ওয়েট—আই উইল সি!'

উঠে দাঁড়াল ডি. কস্টা। দেয়ালে খাড়া করে রাখা একটা ভারি শাবল তুলে নিয়ে ঘা মারল একটা বাক্সের গায়ে।

বাক্সের উপরকার কাঠ ফেটে গেল। আবার ঘা মারল ডি. কস্টা। ভেঙে গেল বাক্সটা।

'মাই গড! ইউরেনিয়াম!'

আসলেও তাই। বাক্সের ভিতর দেখা গেল বড় বড় ইস্পাতের অনেকগুলো টিউব। টিউবের গায়ে লেখা, 'ইউরেনিয়াম।'

ডি. কস্টা দুই বাহু শূন্যে তুলে লাফাতে শুরু করল, 'মি. কামাল! মি. কামাল! আই অ্যাম কিং নাউ! সাট রাজার ঢন!' চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটল ডি. কস্টা।

গুহার বাইরে বেরিয়ে এসে থমকে দাঁড়াল ডি. কস্টা। আনন্দের উচ্ছ্বাস একনিমেষে উবে গেল। চারদিকে দিশেহারার মত তাকাল সে। একি দৃশ্য! আকাশ একেবারে মাথার কাছাকাছি নেমে এসেছে। নিচের দিকে দেখা যাচ্ছে ভাসমান মেঘের রাজ্য। যেদিকে দৃষ্টি পড়ছে সেদিকেই মেঘ, মেঘ আর মেঘ। কিন্তু মেঘ নিচে কেন? মেঘ তো মাথার উপর ভেসে বেড়ায়!

কামালের দিকে তাকাল ডি. কস্টা। পাথরের গায়ে পেরেক পুঁতে তার সাথে দড়ির একটা প্রান্ত বেঁধে দিয়েছে সে। দড়িটা ঝুলিয়ে দিয়েছে নিচের দিকে।

'মি. কামাল! হামি কি ড্রিম ডেকিটেছি?'

কামাল ডি. কস্টার কাছে এসে দাঁড়াল, 'কি, বিশ্বাস হচ্ছে তো এবার!'

ডুকরে কেঁদে উঠল ডি. কস্টা। কাঁদতে কাঁদতে জড়িয়ে ধরল সে কামালকে, 'মি. কামাল! হায়, হায়! এটো উঁচুটে হামি উঠিটে চাই নাই, ফর গডস সেক। অ্যামবিশন হামার ছিল, নো ডাউট, কিন্টু এটো উঁচুটে উঠিটে চাই নাই···।'

কামাল ধমকে উঠল, 'কাঁদলে কোন লাভ নেই। প্রতিটি সেকেণ্ড এখন কাজে লাগাতে হবে আমাদের। আধঘণ্টা পর ফুরিয়ে যাবে অক্সিজেন। তাড়াতাড়ি করে যত নামতে পারব ততই বাঁচার আশা বাড়বে।'

'নামিটে হইবে? মাই গড, এভারেস্ট হইটে নামিব—হাউ? যেখানে উঠি নাই সেখান হইটে নামিব, কি ভাবে···!'

কামাল বলল, 'এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না?'

ডি. কস্টা আরও শক্ত করে জড়িয়ে ধরল কামালকে, 'নো-নো। বিশ্বাস না করিয়া উপায় ডেকিটেছি না। বাট, নিজের চেষ্টায় উঠি নাই এভারেস্টে, মি. কামাল! বাট নামিটে হইবে নিজের চেষ্টায়! পারিব না, আপন গড, হামি পারিব না! পা ফসকাইয়া ভূপাটিট হইব, রশি ছিঁড়িয়া ঢরাশায়ী হইব···'

'কিচ্ছু হবে না। আপনার জন্য দেখছি আমাকেও দমবন্ধ হয়ে মরতে হবে। আপনি নাটক করুন, আমি চললাম।' নিজেকে জোর করে ছাড়িয়ে নিয়ে পা বাড়াল কামাল কিনারার দিকে।

'ওয়েট এ মিনিট! গুহার ভিটর ইউরেনিয়াম আছে হামার! প্লীজ, ওয়েট মি. কামাল! হামার ইউরেনিয়াম মিলিয়নস অফ ডলার মূল্য···।'

কামাল বলল, 'ইউরেনিয়াম না ছাই! আর থাকলেই বা কি, প্রাণ আগে না ইউরেনিয়াম আগে?'

'টবু, হাটের ঢনকে পায়ে ঠেলিটে নাই। ওয়েট···।'

ঘুরে দাঁড়াল কামাল। কয়েক পা এগিয়ে ডি. কস্টার একটা হাত চেপে ধরে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে গেল তাকে চূড়ার কিনারায়, 'নামুন! খুব সাবধানে! রশি ছাড়বেন না ভুলেও। প্রথমে আস্তে আস্তে নামতে শুরু করুন। তারপর যত দ্রুত সম্ভব। মনে থাকে যেন, সাড়ে পাঁচ মাইলের মত নামতে হবে আমাদেরকে।'

'ফাইভ অ্যাণ্ড হাফ মাইলস! প্যান্ট খারাপ করিয়া ফেলিব, বিলিভ মি.!'

'ফের কথা! কথা বলবেন না। কই, রশি ধরুন!'

ডি. কস্টা রশি ধরে ঝুলে পড়ল। কামালের চোখ ছানাবড়া হয়ে উঠল পরমুহূর্তে।—সর্বনাশ! দড়ি ধরে সবেগে নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে ডি. কস্টা। জ্ঞান নেই লোকটার। ভয়ে দিশেহারা হয়ে গেছে। কামালও রশি ধরে ঝুলে পড়ল। নামতে নামতে নিচের দিকে তাকিয়ে ছ্যাৎ করে উঠল ওর বুক। ডি. কস্টাকে দেখা যাচ্ছে না। মাত্র কয়েক মুহূর্তে তীরবেগে নামতে নামতে দৃষ্টির আড়ালে চলে গেছে সে।

মিনিট তিনেক অবিরাম নামার পর ডি. কস্টাকে দেখতে পেল কামাল। লম্বা হয়ে পড়ে আছে পাথরের উপর। নড়ছে না। রশির শেষ প্রান্তটা এখানে। এরপর

নামতে হলে নতুন রশি এখান থেকে নিচের দিকে ঝুলিয়ে দিতে হবে।

কামালের শব্দ পেয়ে ডি. কস্টা বলে উঠল, 'মরি নাই! জাস্ট টায়ার্ড।'

রশির দ্বিতীয় বাণ্ডিলটা উপর থেকে নিচের দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল কামাল। সেটা অদূরেই পাওয়া গেল। পকেট থেকে পেরেক আর হাতুড়ি বের করে কাজে লেগে গেল সে।

আবার রশি ঝোলানো হলো।

ধাক্কা দিয়ে ধমক মারতে ডি. কস্টা উঠে দাঁড়াল। কি করতে হবে বুঝিয়ে দিল কামাল। প্রথম রশিটা ধরে প্রাণপণ শক্তিতে টানাটানি শুরু করল ওরা। খানিকক্ষণের অক্লান্ত পরিশ্রমে এভারেস্টের চূড়ায় বরফের গায়ে পোঁতা পেরেকটা বিচ্ছিন্ন হলো। পেরেক সহ রশিটা পড়ল ওদের পায়ের কাছে। দুজনে সেই রশি ধরে উপরে তুলল, আবার ছুঁড়ে দিল নিচের দিকে।

নিচে নেমে আবার কাজে লাগাতে হবে রশিটাকে।

'চুলকাইটেছে!'

ডি. কস্টার দিকে তাকাল কামাল। রবারের দস্তানা পরা ডান হাতের আঙুল দিয়ে বাঁ হাতের আঙুল চুলকাচ্ছে ডি. কস্টা। এমন জীবন মরণ সমস্যার মধ্যেও হেসে ফেলল কামাল, 'আপনার কাণ্ড দেখে এভারেস্টও নড়ে উঠবে হাসি চাপতে না পেরে। রবারের উপরে চুলকালে কি আঙুলের চুলকানির উপশম হবে?'

ডি. কস্টা কাঁদো কাঁদো গলায় বলে উঠল, 'টাহলে উপায়? বড্ড বেশি চুলকাইটেছে যে! প্লীজ, হাপনি ডয়া করিয়া একটু চুলকাইয়া ডিন।'

'সেই একই তো কথা! সাধারণ একটা ব্যাপার মাথায় ঢুকছে না আপনার? রবারের উপর রবার দিয়ে চুলকালে কোন ফায়দা নেই। ইস! সময়ই নষ্ট হচ্ছে শুধু। কই, আগে বাড়ুন, আবার নামতে হবে। খুব সাবধানে। হাত ফসকালেই···!'

ডি. কস্টা ঝুলে পড়ল আবার। দেখতে দেখতে রশি ধরে নিচের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল সে। কামালের কথা সে শুনতেই পায়নি।

মেঘের নিচে ওরা। ঝড়ে বাতাসে দুলছে রশি। দুলছে সেই সাথে ওরা দুজন। চারদিকে তুষার, তুষার আর তুষার। হালকা তুষার কণা উপর থেকে তুলোর মত পড়ছে। পিঠের অক্সিজেন সিলিণ্ডার এবং মুখের মাস্ক খোলেনি ওরা।

ভিজে রশি রবারের দস্তানা পরা হাত দিয়ে ধরা মুশকিল।

'পেচ্ছাব পাইয়াছে, মি. কামাল!'

কান দিল না কামাল। এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে রশি ধরে নামছে সে। ডি. কস্টা তার উপরে। ঝড়ো বাতাসে দুলছে রশি। নিচের দিকে তাকিয়ে বোঝা যাচ্ছে না, দাঁড়াবার জায়গা আরও কতটা নিচে।

একঘণ্টার বেশি এই ঝড়ের কবলে পড়ে হিমশিম খাচ্ছে ওরা। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় শরীরের রক্ত জমাট বেঁধে যাবে যেন। কনকন করছে প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় শরীরের জয়েন্টগুলো। অসাড় হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ হাতের আঙুল। অথচ হাত একটু ঢিলে করলেই ভিজে দোদুল্যমান রশি ছুটে যাবে মুঠো থেকে। তার মানে, নির্ঘাৎ মৃত্যু।

'চাপিটে পারিটেছি না, মি. কামাল!' কথাটা বলেই ডি. কস্টা ছেড়ে দিল হাতের রশি। কামাল কিছু টের পাবার আগেই হুড়মুড় করে ওর মাথার উপর এসে পড়ল ডি. কস্টার দেহটা। ফসকে গেল কামালের হাতের রশি।

শূন্যে ডিগবাজি খাচ্ছে ডি. কস্টা। গোটা দেহটা ডিগবাজি খেতে খেতে তীরবেগে নেমে যাচ্ছে হিমালয়ের উপর থেকে নিচের দিকে। নামছে তো নামছেই, নামছেই, নামছেই···

কামালেরও সেই একই অবস্থা।

ডি. কস্টার হাত দুটো যতদূর সম্ভব প্রসারিত করা, অবলম্বন খুঁজছে সে, ধরতে চাইছে কিছু একটা, ধরে এযাত্রা রক্ষা করতে চাইছে প্রাণটা। কিন্তু শূন্যে নিক্ষিপ্ত ঢিলের মত নেমেই চলেছে ওর দেহটা নিচের দিকে। পাচ্ছে না সে কোন অবলম্বন, পাবেও না সে, পাওয়া সম্ভব নয়।

আরও অনেক নিচে পর্বতের গা একটু ফুলে উঠেছে। সেখানে জমেছে শত শত মণ তুষার। ডি. কস্টা আর কামাল পড়ল সেই স্তূপীকৃত তুষারের উপর।

কিন্তু ভাগ্য বিরূপ হলে যা হয় তাই হলো। তুষারের উপর পড়ল ওরা ঠিকই, নড়েচড়ে, এপাশ ওপাশ করে উঠেও দাঁড়াল, একমুখ হাসিতে উজ্জ্বলও হয়ে উঠল ডি. কস্টা, কামালের উদ্দেশ্যে বলল, 'গড একজন আছেন, বুঝিলেন, ব্রাদার! এ যাট্রা লাইফটা সেভ হয়ে গেল। আর একটু হইলে খরচা হইয়া যাইটাম। কিন্তু কটো কুইক নামিয়াছি ডেখিলেন?'

কিন্তু ওই পর্যন্তই। স্তূপীকৃত তুষার নড়ে উঠল। ধস নামল তুষারের। নরম তুষার সবেগে ধসে যাচ্ছে। তলিয়ে গেল ডি. কস্টা তুষারের নিচে। একমুহূর্ত পর দ্বিধা বিভক্ত তুষারের গভীর তলদেশে ঢুকে গেল কামালও।

জ্ঞান ফিরে আসতে চোখ পিটপিট করে তাকাল ডি. কস্টা। এ কোথায় পড়ে রয়েছে সে? শাঁ শাঁ করে ও কিসের শব্দ? গড! ঝড় বহিটেছে?

সব কথা মনে পড়ে গেল ডি. কস্টার। মুচকি হাসল সে। উঠে বসল। ধূসর রঙের পাথরের উপর শুয়ে ছিল সে এতক্ষণ। তুষারের চিহ্ন নেই কোথাও। তবে পাথর ঢাকা পড়ে রয়েছে কোথাও কোথাও সাদা, কঠিন বরফে।

'হাজার হোক হামি ইংরাজের জাট! কই মাছের জান। টাই টিকিয়া আছি। বাট, মি. কামাল, যেহেটু ভেটো বাঙালী, টাই অক্কা লাভ করিয়াছেন। গড, প্লীজ, টাহাকে নরকে ঠাঁই ডিটে মিসটেক, থুড়ি, স্বর্গে ঠাঁই ডিটে মিসটেক করিবেন না। আমেন।'

কামালের জন্য প্রার্থনা শেষ করে পা বাড়াল ডি. কস্টা। ভিজে পিচ্ছিল পাথরের উপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে নিজেকে সতর্ক করল বারবার বিড়বিড় করে, 'পড়িয়াছ কি মরিয়াছ! অটি সাবধানে প্রসিড অন, মাই ফ্রেণ্ড! নিশ্চয় টুমি মি. কামালের সাঠে ডেকা করিটে নরকে যাইটে চাও না!'

খানিক পর ব্যাখ্যা দেবার ভঙ্গিতে সে বলল, 'হামি চাহিলে কি হইবে, মি. কামাল নরকেই যাইবে। স্বর্গ টাহার কপালে নাই।'

মিনিট পাঁচেক প্রলাপ বকতে বকতে হাঁটার পর একটা গুহা দেখতে পেল ডি. কস্টা। 'ইউরেকা!' বলে ভিতরে ঢুকল সে। তারপরই চিৎকার করে উঠল, 'হাউ স্ট্রেঞ্জ!'

মুচকি হেসে গুহার এক কোণ থেকে উঠে দাঁড়িয়ে কামাল বলে উঠল, 'বেঁচে আছেন তাহলে!'

'সেই কোশ্চেন টো হামারও! হামি আপনার জন্য প্রার্থনা করছিলাম কটো! গডকে বলিলাম, বিলিভ মি···। বাড ডিন। খাবারডাবার সামথিং ডিন টো। বড্ড ক্ষিডে পাইয়াছে।'

'খাবার? খাবার কেথায় পাব?' কামাল খেঁকিয়ে উঠল। আবার বলল, 'ভাগ্যটা বড় সাহায্য করছে, বুঝলেন? জ্ঞান ফেরার পর এই গুহায় ঢুকি আমি। কোন অভিযাত্রী দলের ক্যাম্প ছিল এটা। কম্বল, শাবল, রশি, অক্সিজেন, মাস্ক—এইসব আছে। কিন্তু খাবার নেই।'

গুহার প্রবেশ পথের দিকে তাকাল ডি. কস্টা। ফিসফিস করে বলল, 'প্রবেশ পঠটা বণ্ড করিয়া ডিবার কুনো উপায় করিটে পারা যায় না?'

চোখ কপালে উঠল কামালের, 'কেন? গুহার মুখ বন্ধ করতে চাইছেন কেন?'

'ক্যাম্পটা যাহাডের টাহারা যডি ফিরিয়া আসে? টাহারা যডি ঘাড় চড়িয়া বাহির করিয়া ডেয় হামাডেরকে এই ডুর্যোগে···।'

'দূর! আপনি দেখছি বোকার হদ্দ। এই ক্যাম্প কি আজকের? যারা এখানে ক্যাম্প করেছিল তারা মরে ভূত হয়ে গেছে কবে!'

ডি. কস্টা খুশিতে আত্মহারা, 'টবে টো কঠাই নাই! ভূত হইয়া ঠাকিলে টাহাদের আর কুনো অটিকার নাই এই ক্যাম্পের উপর।'

'রাত নামবে একটু পর, বুঝলেন? ঘুম দিতে হবে। হিমালয়ের এই এলাকায় ঝড়-তুফান বছরের সবসময়ই লেগে থাকে। এই তুমুল ঝড় থামবে সে আশা না করাই ভাল। তবে কমতে পারে, কমলেই বেরিয়ে পড়তে হবে। বুঝতে পারছেন আমার কথা?'

'লাউড অ্যাণ্ড ক্লিয়ার! বাট, মি. কামাল, উহা কিসের শব্দ হইটেছে?'

শব্দটা কামাল শুনতে পাচ্ছিল। কান পাতল ও। কিন্তু কান পাতবার দরকার নেই, ক্রমশ বাড়ছে শব্দটা।

দেখতে দেখতে অস্পষ্ট শব্দটা বাড়তে বাড়তে একটানা গর্জনে পরিণত হলো। শুধু শব্দই নয়, সেই সাথে শুরু হলো কম্পন। কাঁপতে শুরু করল গুহার মেঝে, দেয়াল, ছাদ।

'মি. কামাল! হিমালয় ভাঙিয়া যাইটেছে—বিলিভ মি.!'

মুখ শুকিয়ে গেল কামালের। সর্বনাশ! যা সে আশঙ্কা করেছিল মনে মনে, তাই শেষ পর্যন্ত ঘটতে চলেছে। হিমবাহ নামছে উপর থেকে।

শিউরে উঠল কামাল। হিমবাহ নামতে কোনদিন দেখেনি সে। কিন্তু হিমবাহ নামার ভয়ঙ্কর পরিণতির কথা অজানা নেই তার। কোটি কোটি টন কঠিন বরফ হুড়মুড় করে একবার নামতে শুরু করলে আর রক্ষে নেই। পর্বতের গা ভেঙে, ছোট

বড় পাথরের খণ্ডকে সাথে নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন সেই যে হিমবাহের পতন শুরু হয় তার আর থামার লক্ষণ দেখা যায় না। কোন কোন হিমবাহ নাকি মাসাধিককাল শুধু নামতেই থাকে।

খানিক পরই চাক্ষুষ করল ওরা হিমবাহের স্বরূপ। গুহার সামনে দিয়ে নিচের দিকে পড়ছে বরফের টুকরো। প্রথমে অল্প অল্প। তারপর হাজার হাজার বরফের খণ্ড, আরও পরে বরফের খণ্ড সংখ্যায় এত বেশি পড়তে লাগল যে আলাদা করে দেখার উপায় রইল না একটাকেও। বরফের একটা নদী যেন কেউ উপুড় করে দিয়েছে, সেই নদীর বরফ নামছে নিচের দিকে।

কানে আঙুল দিল কামাল। বিকট গর্জনে কানের পর্দা ফেটে যেতে পারে। ডি. কস্টা হঠাৎ লাফ দিয়ে চলে গেল কামালের পিছনে। আত্মগোপন করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে সে।

অসংখ্য বরফের খণ্ড গুহামুখের সামনে স্তূপীকৃত হচ্ছে। চেয়ে চেয়ে দেখছে কামাল নিজেদের সর্বনাশ। করার কিছুই নেই তাদের। চুপচাপ বসে দেখতে হবে প্রকৃতি কি নির্মমভাবে মৃত্যুফাঁদ তৈরি করছে তাদের জন্য।

দেখতে দেখতে গুহামুখটা বন্ধ হয়ে গেল।

'বড্ড অন্ধকার ঠেকিটেছে!'

কামাল থমথমে গলায় বলল, 'এই অন্ধকার থেকে এ জীবনে আর আলোর মাঝখানে যেতে পারবেন বলে মনে হয় না!'

মহাপ্রলয় ঘনিয়ে এসেছে। সহ্য হয় না আর এই একটানা কম্পন আর গর্জন।

কেটে গেছে তিন তিনটে দিন। গত বাহাত্তর ঘণ্টা ধরে সহ্য করছে ওরা এই গাঢ় অন্ধকার, সহ্য করছে হিমবাহের দুনিয়া কাঁপানো অবিরাম গর্জন, সহ্য করছে জঠরের তীব্র জ্বালা! তিন দিন—পেটে একটা দানাও পড়েনি ওদের।

'মি. কামাল!'

জবাব দিল না কামাল। পাগল হয়ে যাবে ও। চিন্তা শক্তি হারিয়ে ফেলছে ক্রমশ। ডি. কস্টা এর আগে জ্ঞান হারিয়েছিল একবার। খানিক আগে জ্ঞান ফিরেছে তার। জ্ঞান সে-ও হারাবে। আর সহ্য করবার শক্তি নেই, দেহ মন পরাজয় মেনে নিতে চাইছে।

'মি. কামাল!'

'বলুন।' ডি. কস্টা হাঁপাচ্ছে। কষ্ট হচ্ছে তার। বুকটা মোচড় দিয়ে উঠল কামালের। কিন্তু করার কিছু নেই ওর।

'হামাডের মধ্যে একটা চুক্তি হয়ে যাওয়া ডরকার!'

'চুক্তি? কিসের চুক্তি?'

আস্তে আস্তে কথা বলছে ডি. কস্টা, 'ক্ষিডে একটা নীটিহীন শয়টান, মি. কামাল! এই ক্ষিডের টাড়নায় মানুষ মানুষকেও খাইয়া ফেলিটে পারে!'

কামাল চুপ করে রইল। ডি. কস্টা কি পাগল হয়ে যাচ্ছে শেষ পর্যন্ত?

'আমরা ভড্ডরলোক, টাই না? হামাডের মধ্যে একটা ভড্ডরলোকের প্যাক্ট

হইয়া যাক।'

'কি প্যাক্ট?'

ডি. কস্টা বলল, 'প্যাক্টের মূল বিষয় হইবে—হামরা পরস্পরকে খাইব না। এগ্রী?'

কামাল বলল, 'হুঁ।'

ডি. কস্টা হাসল তবু, 'বাট, এই চুক্তি কার্যকরী ঠাকিবে দুইজন বাঁচিয়া ঠাকা পর্যন্ত। দুইজনের একজন যডি অন্য যে-কোন কারণে মারা যাই টাহা হইলে চুক্তি বাটিল হইয়া যাইবে।'

'তার মানে?'

ডি. কস্টা বলল, 'টারমানে, হামি মরিয়া গেলে হাপনি হামাকে খাইটে পারিবেন এবং হাপনি মরিয়া গেলে···ইত্যাদি ইত্যাদি, বুঝিটে পারিটেছেন টো?'

কামাল উত্তর দিতে পারল না। জ্ঞান হারিয়েছে সে।

একা বিড়বিড় করল ডি. কস্টা আরও খানিকক্ষণ। শক্তি পাচ্ছে না সে শরীরে। মাথা ঘুরছে। কম্বলেও নিষ্কৃতি মিলছে না ঠাণ্ডার হাত থেকে। প্রচণ্ড খিদেতে ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছে সে···এরপর আর কিছু মনে নেই ডি. কস্টার।

আট

চারদিকে ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় একাকার। দশ পনেরো হাতের বেশি দূরের জিনিস দেখা যায় না। কিন্তু ধোঁয়া বলে মনে হলেও আসলে ওগুলো ধোঁয়া নয়—বাষ্প। বরফ থেকে উঠছে হু হু করে। চারদিক থেকে। আর তার সাথে গাঢ় কুয়াশা। কুয়াশার জাল ভেদ করে সূর্যের আলোও আসতে পারছে না স্বাধীনভাবে।

আবির্ভূত হবার পর চব্বিশ ঘণ্টারও উপর এই শীতল নরকে কেটে গেছে মি. সিম্পসনের। সূর্য অস্ত যায়নি একবারও, ঠিক যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে। গ্রীনল্যাণ্ডের দস্তুরই এই।

খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এগোচ্ছেন মি. সিম্পসন। বাঁ পা'টা অসাড় হয়ে গেছে। ঘণ্টাখানেক থেকে চিমটি কেটেও সাড়া পাচ্ছেন না এতটুকু। হাড়, মাংস, চর্বি, রক্ত-সহ পা'টা বরফে পরিণত হলেও অবাক হবার কিছু নেই। এমন ঘটনা সচরাচর ঘটেই থাকে এখানে।

উৎকট একটা দুর্গন্ধে বমি এল মি. সিম্পসনের। ব্যাপার কি! সশব্দে থুথু ফেললেন তিনি। ছানাবড়া হয়ে উঠল চোখজোড়া, 'মাই গড!'

নিচের বরফের উপর দুই টুকরো বরফ টক্ টক্ শব্দে পড়ল, ড্রপ খেয়ে খানিকটা দূরে গিয়ে থামল। থুথু মুখ থেকে বেরিয়েই বরফে পরিণত হয়ে গেছে।

গ্রীনল্যাণ্ড। প্রায় এক হাজার মাইল প্রস্থ এবং দুই হাজার মাইল দৈর্ঘ্যের প্রকাণ্ড একটা বরফাচ্ছাদিত ভূখণ্ড। মাটি, পাথর, বালি অতবড় ভূখণ্ডে নেই বললেই চলে। যেদিকে তাকাও বরফ, বরফ আর জমাট বরফ।

সূর্য গ্রীষ্মকালে অস্ত যায় না মাসের পর মাস। আবার শীতকালে মাসের পর

মাস এস্কিমোরা অন্ধকারে থাকে, সূর্য ওঠে না তখন গ্রীনল্যাণ্ডের আকাশে।

বরফের দেয়াল দিয়ে ঘেরা জানালাহীন দরজাহীন গোলাকার একটা জায়গায় নিজেকে আবিষ্কার করলেন মি. সিম্পসন। বাইরে বেরুবার জন্য একটা গর্ত দেখতে পান তিনি। বরফের তৈরি ঘর দেখেই রহস্যটা বুঝতে পারেন তিনি। শয়তান প্রফেসর ওয়াই মিথ্যে গর্ব করেনি। সত্যি সে তাকে গ্রীনল্যাণ্ডে পাঠিয়ে দিয়েছে।

উলের গরম কাপড়ে আপাদমস্তক ঢাকা থাকলেও প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় ঠকঠক করে কাঁপছিলেন মি. সিম্পসন। খাবার দুটো প্যাকেটও দিয়েছিল শয়তান প্রফেসর গরম কাপড়ের পকেটে ভরে। কিন্তু বেঁচে থাকতে হলে এই বরফের তৈরি ঘরে বসে থাকলে চলবে না। বসে থাকলে রক্ত চলাচলের গতি শ্লথ হয়ে পড়বে, ফলে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা তার দেহটাকে কঠিন বরফে রূপান্তরিত করে ছাড়বে। শূন্য ডিগ্রীর চেয়ে নিচেই নয় শুধু, এখানকার তাপমাত্রা শূন্য ডিগ্রীর চেয়ে পঞ্চাশ ডিগ্রী নিচেই থাকে সব সময়। প্যাকেটের খাবারও শেষ হয়ে যাবে একবার পেট ভরে খেলে। সুতরাং বেরিয়ে পড়তে হবে এখান থেকে।

এস্কিমোদের সাহায্য পাবার আশাই একমাত্র সম্বল। সভ্য দুনিয়ায় ফিরে যাবার কথা এই মুহূর্তে ভাবা বাতুলতা। গ্রীনল্যাণ্ডের সাথে নিয়মিত কোন যোগাযোগ নেই সভ্য দুনিয়ার। এই বিশাল ভূখণ্ডে শুধুমাত্র বৃহৎ শক্তিদ্বয়ের একটি কি দুটি রিসার্চ সেন্টার আছে—ব্যস। সেই রিসার্চ সেন্টারে যারা কাজ করে তারাই এখানে সভ্য দুনিয়ার প্রতিনিধি। তারাই বছরে একবার সভ্য দুনিয়ায় যায় বা সেখান থেকে এখানে আসে।

গ্রীনল্যাণ্ডের আকাশে সূর্য দেখে মি. সিম্পসন বুঝতে পারেন, এখানে এখন গ্রীষ্মকাল।

বরফের তৈরি ঘর থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে মি. সিম্পসন আবিষ্কার করেছিলেন একটা পাহাড়ের উপর রয়েছেন তিনি। আধঘণ্টা পর পাহাড় থেকে নেমে তীব্র ঠাণ্ডার দরুন সারা শরীরে অসহ্য ব্যথা অনুভব করে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন তিনি। হায় কপাল, শেষ পর্যন্ত বরফ হয়ে যাবে তাঁর দেহটা!

মাইলখানেক হাঁটার পর কয়েকটা সীল দেখতে পেলেন মি. সিম্পসন। সীল সম্পর্কে অনেক কথাই মনে পড়ল মি. সিম্পসনের।

বড় অদ্ভুত প্রাণী এই সীল। সীলরা অতি প্রাচীনকালে, ডাঙায় বসবাস করত। কালক্রমে তারা পানিকেই নিজেদের আবাসস্থল হিসেবে গ্রহণ করেছে। কিন্তু তাদের স্বভাব, প্রকৃতি, দৈহিক বৈশিষ্ট্য এখনও স্থলচর প্রাণীদের মতই রয়ে গেছে। সীলদের ধমনীতে উষ্ণ রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। সীলদের শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া সম্পন্ন করে ফুসফুস। সীলরা ডিম পাড়ে না, জ্যান্ত বাচ্চা প্রসব করে। পানিতে জীবনযাপন শুরু করার পর অবশ্য কিছু পরিবর্তনও এসেছে ওদের মধ্যে। যেমন পাগুলো রূপান্তরিত হয়ে সাঁতার কাটার সুবিধার জন্যে হাঁসের পায়ের মত হয়েছে। সীলরা একান্নবর্তী পরিবার। প্রত্যেক সীল পরিবারে একজন কর্তা থাকে। তার থাকে একাধিক স্ত্রী এবং অনেক বাচ্চা-কাচ্চা। মেয়ে-সীল বাচ্চা প্রসব করে ডাঙায়। বাচ্চারা জন্মেই সাঁতার কাটতে পারে না। ওদের বাবা-মা ওদেরকে সাঁতার শেখায়। মাসখানেকের চেষ্টায়

বাচ্চারাও বড়দের মত অভিজ্ঞ সাঁতারু হয়ে ওঠে।

সীলরা গান গাইতেও পারে। নিজেদের কণ্ঠস্বরকে তারা নানা ছন্দে, নানা সুরে পরিবর্তিত করতে ওস্তাদ।

এই সীলের মাংস এস্কিমোদের প্রধান খাদ্য। সীলের চর্বি ব্যবহার করে তারা আলো জ্বালার জন্য। সীলের চামড়ায় গরম কাপড় তৈরি হয়। এস্কিমোরা সীলের চামড়া দিয়ে নৌকাও তৈরি করে।

গ্রীনল্যাণ্ডের নদীতে সীল ছাড়াও বিরাটাকার সী-এলিফ্যান্ট, সী-লায়ন, সী-কাউ-এর দেখা পাওয়া যায়। এস্কিমোরা হার্পুণ-এর সাহায্যে এইসব জলচরপ্রাণী শিকার করে বরফমোড়া এই ভূখণ্ডে টিকিয়ে রেখেছে নিজেদের অস্তিত্ব।

দিক হারিয়ে কঠিন বরফে ঢাকা বিস্তীর্ণ এলাকায় একা তীব্র শীতের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন মি. সিম্পসন। একটা ব্যাপারে এখন আর কোন সংশয় নেই তাঁর—মৃত্যু দ্রুত এগিয়ে আসছে, এখান থেকে বেঁচে ফিরে যাওয়া অসম্ভব। প্রফেসর ওয়াই তাঁকে এখানে পাঠিয়েছে বিনা উদ্দেশ্যে তা মনে করার কারণ নেই। এই বরফের রাজ্যে তিনি প্রাণ হারাবেন, প্রফেসর ওয়াই তাই চায়। শয়তানটা নিশ্চয়ই তাঁকে এমন জায়গায় পাঠায়নি যেখানে কারও সাহায্য পাওয়া যেতে পারে। এস্কিমোরা যেখানে নেই, যেখানে বাস করে না, সেখানেই তাকে পাঠানো হয়েছে।

বিপদ বিকট রূপ ধারণ করতে শুরু করল খানিক পর। দেখতে দেখতে কুয়াশা আরও গাঢ় হয়ে নামে চারদিকে। দুই হাত দূরের জিনিসও দেখা যায় না। তারপর শুরু হয় তুষারপাত। সেই সাথে কনকনে বাতাস।

প্রমাদ গুণলেন মি. সিম্পসন। উপায় কি হবে? কোথায় আশ্রয় নেবেন তিনি?

খাবারের প্যাকেটে এক শিশি ব্র্যাণ্ডি ছিল। সেটা পান করে একটু আরাম পেলেন যেন, একটু যেন গরম হলো শরীরটা। কিন্তু খানিক পরই আবার শুরু হলো যন্ত্রণা আর ব্যথা।

কতক্ষণ স্থায়ী ছিল ঝড় হিসেব করেননি মি. সিম্পসন। থেমেছে মাত্র ঘণ্টা দুয়েক আগে। প্রায় চার-পাঁচ ঘণ্টা হাত-পা গুটিয়ে পড়েছিলেন তিনি প্রকাণ্ড একটা তিনমানুষ সমান উঁচু বরফখণ্ডের পাশে। বাতাসের হাত থেকে রক্ষা করেছে তাঁকে এই পাথর।

ঝড় থেমে যাবার পর আবার হালকা হয়ে গেছে কুয়াশা। তুষারপাত বন্ধ হয়েছে। সূর্যের আলো দেখতে পাচ্ছেন তিনি। শীতের প্রকোপ হয়তো কমেছে একটু। যদিও তা টের পাচ্ছেন না মি. সিম্পসন। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় এখনও ব্যথা করছে তার শরীরের হাড়গুলো।

দূরে একটা উঁচু মত কিছু দেখা যাচ্ছে। সেদিকেই হাঁটছেন মি. সিম্পসন। ঘণ্টাচারেক পর কালো হয়ে গেল মি. সিম্পসনের মুখ। একি আবহাওয়া এখানকার!

আবার নামছে তুষার। আবার গাঢ় হচ্ছে কুয়াশা। দমকা বাতাসও দেখা দিয়েছে হঠাৎ।

উঁচু মত জিনিসটা আসলে পাহাড়। মি. সিম্পসন আরও বিশ মিনিট হাঁটার পর উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। এই পাহাড়েই তিনি আবিষ্কার করেছিলেন নিজেকে আর

কিছু না হোক, পাহাড়ের উপর একটা বরফের তৈরি ঘর তো আছে। ঘরের ভিতর দুটো কাঠের বাক্সও দেখেছিলেন মি. সিম্পসন। সেগুলো খুলে দেখার কথা চিন্তা করেননি তিনি তখন।

সেগুলো খুলে দেখবেন এবার। ভাগ্য ভাল হলে, শুকনো কিছু খাবার, একটা ম্যাপ, কম্বল, ব্র্যাণ্ডি বা হুইস্কির ক'টা বোতল···। চিন্তার লাগাম টেনে ধরলেন মি. সিম্পসন। বড় বেশি আশা করছেন তিনি।

পাহাড়ে উঠতে গিয়ে প্রকৃত সমস্যার মুখোমুখি হলেন মি: সিম্পসন। পুরোদমে শুরু হয়ে গেছে ঝড়। পাহাড়ের উপর থেকে সবেগে নেমে আসছে তুষার-ধস কোথায় পা রাখবেন স্থির করতে গিয়ে হিমশিম খেয়ে গেলেন তিনি। পঞ্চাশ গজের মত উঠলেন অমানুষিক পরিশ্রম করে। পা রাখলেন সামনে অনেক বাছ-বিচার করে। ভাগ্য বিরূপ, স্তূপীকৃত তুষারের উপর পড়ল পা।

তাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেলেন তিনি। তুষারের ধস নামল সেই সাথে। তুষারের সাথে গড়াতে গড়াতে একেবারে পাহাড়ের পাদদেশে নেমে এলেন তিনি।

নতুন করে পাহাড়ে চড়বার সংগ্রাম শুরু হলো তাঁর। পুলিসের লোক তিনি, পরাজয় কাকে বলে জানেন না। বিজয়ী হতে তিনি বদ্ধপরিকর।

শেষ পর্যন্ত জিতলেন মি. সিম্পসন। সেই বরফের তৈরি ঘরে ঢুকলেন অবশেষে হামাগুড়ি দিয়ে।

অতিরিক্ত আশা তিনি করেননি। বাক্স দুটো ভেঙে যতটুকু আশা করেছিলেন তার চেয়েও বেশি পেলেন সব জিনিসই।

কিন্তু ঝড়-তুফান ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল। আড়াই ঘণ্টার মধ্যে মি. সিম্পসনের ঘরের উপর এবং চারদিকে তুষারের স্তর পঁচিশ গজ মোটা দেয়ালের সৃষ্টি করল।

বরফের নিচে চাপা পড়ে গেলেন মি. সিম্পসন।

নয়

'হাঃ! হাঃ! হাঃ!'

কেঁপে উঠল প্রফেসর ওয়াইয়ের অট্টহাসিতে প্রশস্ত হলরুমের চার দেয়াল। হাসি থামল। চেহারাটা তাঁর হয়ে উঠল পরক্ষণে বাঘের মত ভয়ঙ্কর হিংস্র। চোখের দৃষ্টি যেন আগুনের শিখা। বজ্রকণ্ঠে গর্জে উঠলেন প্রফেসর ওয়াই, 'চিনেছি! তাকে আমি চিনতে ভুল করিনি জর্মন শেখ! কুয়াশা। নিশ্চয়ই এ তারই কাণ্ড!'

'স্যার! কুয়াশা কিভাবে পৃথিবীতে ফিরে আসবে?'

প্রফেসর ওয়াই দাঁতে দাঁত চেপে কড়কড় করে শব্দ তুললেন। সিলিঙের দিকে খ্যাপাদৃষ্টিতে তাকিয়ে কথা বলে উঠলেন। যেন কুয়াশা রয়েছে সেখানে।

'সাবাশ! সাবাশ, মি. কুয়াশা! কংগ্রাচুলেশনস্! সত্যি, আপনি বিশ্বের সেরা বৈজ্ঞানিক! যা কারও পক্ষে সম্ভব নয় আপনি তাই সম্ভব করেছেন। ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করিনি আমি, আপনি আবার ফিরে আসতে পারবেন পৃথিবীতে! ব্রাভো, মি. কুয়াশা,

ব্রাভো! কিন্তু—সাবধান, মি. কুয়াশা, খুব সাবধান! মারাত্মক পরিণতি ঘটতে যাচ্ছে আপনার। খেপে গেছি আমি! কেউ রক্ষা করতে পারবে না এবার আপনাকে আমার হাত থেকে আপনি যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন আমার বিরুদ্ধে—কী সাংঘাতিক স্পর্ধা আপনার! প্রস্তুত হোন, মি. কুয়াশা, আপনি আক্রমণের সূচনা করেছেন, আমি পাল্টা আঘাত হানব! হাঃ! হাঃ! হাঃ! হাঃ! ভেবেছিলেন স্পেসক্রাফট থেকে বোমা মেরে আমাকে খতম করে দেবেন! হাঃ! হাঃ! হাঃ! হাঃ! হাসি পায়, মি. কুয়াশা, আমার হাসি পায়। প্রফেসর ওয়াইকে খতম করা অত সহজ নয়, মি. কুয়াশা! জর্মন শেখ!'

'ইয়েস, স্যার।' প্রফেসর ওয়াই অগ্নিদৃষ্টিতে তাকালেন সহকারী জর্মন শেখের দিকে, 'আমাদের এই কন্ট্রোলরুমের অবস্থান কেউ যেন টের না পায়। এই বিল্ডিংয়ের আশপাশে সন্দেহজনক যাকে দেখবে তাকেই ধরে এনে গায়েব করে দেবে ভ্যানিশিং রে দিয়ে—এই আমার হুকুম। এই হুকুম পালনে বিচ্যুতি দেখলে আমি খুন করব তোমাকে।'

'ইয়েস, স্যার।'

প্রফেসর কি যেন ভাবলেন মাথা নিচু করে। কয়েক মুহূর্ত পর ঝট করে মাথা তুললেন আবার, 'আমি জানি মি. কুয়াশা এরপর কি করতে যাচ্ছেন। ভারত মহাসাগরের দ্বীপ থেকে তিনি ইতিমধ্যেই হয়তো উদ্ধার করেছেন মি. টিকটিকি আর তার স্ত্রীকে।'

জর্মন শেখ অবিশ্বাস ভরা গলায় প্রশ্ন করল, 'কিন্তু, স্যার, মি. কুয়াশা জানলেন কিভাবে ওই দ্বীপের সন্ধান?'

প্রফেসর ওয়াই বললেন, 'কিভাবে সন্ধান পেয়েছেন তা-ও আমি জানি। মি. কুয়াশা তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের প্রত্যেকের শরীরের রক্তে VNR-5 এর একটা করে কণা প্রবেশ করিয়ে রেখেছেন বহুদিন আগেই। একটা ইণ্ডিকেটর যন্ত্রও ফিট করে নিয়েছেন হাতঘড়ির সাথে। VNR-5-এর কণা যার শরীরে থাকবে তার অবস্থান সম্পর্কে এই ইণ্ডিকেটর পরিষ্কার একটা ধারণা দিতে সক্ষম। পাঁচশো মাইল দূর থেকেও কাজ করতে পারে এই ইণ্ডিকেটর যন্ত্র। মহাশূন্য থেকে ফিরে তিনি এই যন্ত্রের সাহায্যে টিকটিকি শহীদ আর মিসেস খানের সন্ধান পান। মি. কুয়াশা আগেই শুনেছিলেন আমি ওদেরকে ভারত মহাসাগরের একটি দ্বীপে পাঠাব। এই যন্ত্রের সাহায্যে তিনি খুঁজে বের করবেন বাকি সবাইকে। কামাল আর ডি. কস্টা, তারা বোধহয় মারা গেছে এভারেস্টের ওপর থেকে নামতে গিয়ে। মি. সিম্পসন—সে-ও হয়তো এতক্ষণে—জর্মন শেখ, তোমার দক্ষিণ হস্ত ডেভিলকে আনো। ওকে আমার দরকার হবে এখুনি।'

'ইয়েস, স্যার!' জর্মন শেখ পা বাড়াল।

প্রফেসর বললেন, 'থামো। মি. কুয়াশাকে বন্দী করতে হবে আমাদের। বড় বেশি বেড়ে গেছেন তিনি। আমি জানি পরবর্তী পরিকল্পনা কি তাঁর। সবাইকে উদ্ধার করার চেষ্টা করবেন তিনি আগে। তারপর যাবেন আফ্রিকায়। আফ্রিকার রহস্যপুরী থেকে শত শত মণ স্বর্ণ উদ্ধার করার লোভ ত্যাগ করতে পারবেন না তিনি। জর্মন শেখ, ফাঁদ পাতো। আমার শত্রুদের কবর রচিত হবে ওই আফ্রিকাতেই। যারা

মরে গেছে তারা বেঁচে গেছে, আর যারা বেঁচে আছে তাদেরকে অসহ্য কষ্ট দিয়ে মেরে ফেলতে হবে। জর্মন শেখ, ব্যবস্থা করো। তারা সবাই যেন আগুনে পুড়ে মরে, দাবাগ্নি যেন তাদের সবাইকে ভস্ম করে দেয়। আর মি. কুয়াশা—তাঁকে আমি জীবন্ত চাই। তাঁকে আমি জীবন্ত হাতে পেতে চাই। নিজের হাতে তিলে তিলে কষ্ট দিয়ে তাঁকে আমি খুন করব!' উন্মাদের মত দেখাচ্ছে প্রফেসর ওয়াইকে। ঠকঠক করে উত্তেজনায় কাঁপছেন তিনি।

'জর্মন শেখ!'

'ইয়েস, স্যার।'

প্রফেসর বললেন, 'মি. সিম্পসন গ্রীনল্যাণ্ডে আছে, না?'

'ইয়েস, স্যার।'

প্রফেসর নির্দেশ দিলেন ডেভিলকে, 'সঙ্গে করে নিয়ে এসো তাহলে এখুনি। আর শোনো, ফাঁদ কিভাবে পাততে হবে জানাব আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে। যাও!'

ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল জর্মন শেখ প্রফেসর ওয়াইয়ের কন্ট্রোলরুম থেকে।

পায়চারি শুরু করলেন প্রফেসর ওয়াই। হাত দুটো মুষ্টিবদ্ধ।

বিড়বিড় করছেন তিনি, 'আমাকে খেপিয়ে তোলার মজাটা এবার দেখাব! পুড়িয়ে মারব সবাইকে! দাবাগ্নি ঘিরে ধরবে চারপাশ থেকে—কোথায় পালাবে বাছাধনেরা? কে এবার বাঁচাবে তোমাদেরকে? কুয়াশা? হাঃ! হাঃ! হাঃ! হাঃ! মি. কুয়াশা তখন নিজের প্রাণ বাঁচাতেই হিমশিম খাবে। উপায় নেই, কোন উপায় নেই এবার তোমাদের আমার হাত থেকে বাঁচার। নিখুঁত পরিকল্পনা তৈরি করেছি আমি মনে মনে…!'

- o -

কুয়াশা ৪৮

প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারি, ১৯৭৬

এক

জ্ঞান ফিরে পেয়ে পিটপিট করে চোখ মেলে তাকাল ডি. কস্টা। গড, ওহ গড! থ্যাঙ্কস, মেনি থ্যাঙ্কস ফর ন্যায় বিচার! পৃথিবীতে হামি মানুষের এত উপকার করিয়াছি যে হেভেনে হামাকে জায়গা না ডিয়া উপায় ছিল না টোমার।

সুন্দর একটা হলরুমের নরম বিছানায় শুয়ে আছে ডি. কস্টা। বাতাসে অদ্ভুত সুন্দর একটা সুগন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে। সুমধুর সঙ্গীতের অস্পষ্ট শব্দ ভেসে আসছে কোথাও থেকে। অদূরের একটা টেবিলের উপর থরে থরে সাজানো রয়েছে পাকা আপেল, আঙ্গুর, কলা, আনারস, পেঁপে, কালো জাম প্রভৃতি ফলমূল। মাথা উঁচু করে পাশের টেবিলটার উপর দিকে তাকাল সে। জল এসে গেল জিভে তার। চাইনিজ আর ইংলিশ ডিশ সাজানো রয়েছে টেবিলের উপর।

হলরুমের খোলা জানালার ধারে একটা আরাম কেদারায় বসে রয়েছে অপরূপ সুন্দরী এক যুবতী। উঠে বসল ডি. কস্টা। বিড় বিড় করে আপন মনেই বলে উঠল, 'নো ডাউট, দিস ইজ হেভেন! দ্যাট বিউটিফুল গার্ল—সুন্দরী নিশ্চয়ই হেভেনের পরী! এই পরিবেশ পৃথিবীর কোঠাও ঠাকিটে পারে না! টারমানে, আমি মারা গিয়াছি হিমালয়ের সেই গুহার ভিটর, এবং টারপর গড হামাকে এই হেভেনে টুলিয়া আনিয়াছেন।'

ঘাড় ফিরিয়ে পিছনদিকে তাকাল ডি. কস্টা। ভুরু কুঁচকে উঠল তার। পাশের বিছানায় শুয়ে রয়েছে মি. সিম্পসন। তার পাশের একটা বেডে আর একজন—আরে! মি. কামাল না?

'ওহ গড! রহস্যটা কোঠায়! মি. কামাল কি করিটেছেন আমাডের হেভেনে! ইহা যে স্বর্গ টাহাটে কোন সণ্ডেহ নাই। বাট, কোশ্চেন ইজ, ইহা মুসলমানডের জান্নাত, না খ্রিস্টানদের হেভেন?'

মি. সিম্পসন নড়েচড়ে উঠলেন। মাথা তুলে দেখলেন তিনি ডি. কস্টাকে। এইমাত্র জ্ঞান ফিরে এসেছে বলে মনে হচ্ছে তাঁর।

'কোথায় রয়েছি আমি।'

ডি. কস্টা হাসল, 'হেভেনে।'

এক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন মি. সিম্পসন ডি. কস্টার দিকে। তারপর মুচকি হেসে উঠে বসলেন বিছানার উপর।

'হোয়াটস্ দ্য ম্যাটার, মি. সিম্পসন? হাসিলেন যে, হোয়াই!'

মি. সিম্পসন সহাস্যে বললেন, 'জায়গাটা কার, এখানে কিভাবে এলাম তা এখনও বুঝতে না পারলেও একটা ব্যাপারে আমি নিশ্চিত যে এটা হেভেন বা স্বর্গ বা জান্নাত কোনটাই নয়।'

'হোয়াট! হেভেন নয় বলিটেছেন? হেভেনে ঠাকিয়া হেভেনকে ডিনাই করিটেছেন?'

মি. সিম্পসন বললেন, 'হেভেনকে অস্বীকার করছি না। আমি শুধু বলতে চাইছি এটা হেভেন নয়। হেভেন হলে তুমি এখানে থাকতে না। তুমি মানুষকে এত জ্বালিয়েছ যে হেভেনে তোমার ঠাঁই হতে পারে না। তোমার ঠাঁই হবে হেলে অর্থাৎ নরকে। সুতরাং, তুমি যখন এখানে রয়েছ তখন এই জায়গা কোনমতেই হেভেন হতে পারে না।'

'টবে কোঠায় রহিয়াছি হামরা? হেলে? নরকে!'

হলরুমের সর্বশেষ প্রান্তের বিছানা থেকে ভেসে এল শহীদের কণ্ঠস্বর, 'ওহে ডি. কস্টা, এটা হেভেনও নয়, হেলও নয়। আমরা কুয়াশার স্পেসক্রাফটে রয়েছি। মাটি থেকে তিন মাইল উঁচু দিয়ে যাচ্ছি আমরা। আফ্রিকা মহাদেশ সম্ভবত এখন আমাদের নিচে।'

বিছানা থেকে নেমে পড়লেন মি. সিম্পসন। তড়াক করে ডি. কস্টাও নামল। মি. সিম্পসনকে পিছনে ফেলে পাটখড়ির মত পা নিয়ে ছুটল সে শহীদের দিকে। কামাল উঠে বসল তার বিছানায়, তার দৃষ্টি দূরের একটি বেডের দিকে। সে বেডে বসে আছে মহুয়া। উজ্জ্বল হাসিতে ভরা মুখ।

কামাল চেঁচিয়ে উঠল, 'মহুয়াদি! আমি কি স্বপ্ন দেখছি!' নিজের গায়ে চিমটি কাটল কামাল, 'মাগো! ব্যথা তো লাগে!'

সবাই ঘিরে ধরল শহীদকে।

কামাল বলল, 'শহীদ, আমার প্রশ্নের উত্তর দে তুই আগে। এখানে কে উদ্ধার করে আনল আমাদেরকে। তুই?'

শহীদ বলল, 'না। কুয়াশা। আমাদের প্রত্যেকের শরীরে কুয়াশা VNR-5 এর একটা করে কণা প্রবেশ করিয়ে দিয়েছিল বহুদিন অগে, জানিস তো? সেই কণা যেখানে থাকে প্রয়োজনে সেইখানে কুয়াশাকে নিয়ে যাবার জন্য কুয়াশা একটা যন্ত্র আবিষ্কার করেছিল। সেই ইঞ্জিকেটর যন্ত্রের সাহায্যে সে আমাদের সবাইকে মুমূর্ষু অবস্থায় উদ্ধার করেছে। তুই আর ডি. কস্টা অক্সিজেনের অভাবে মরে যাচ্ছিলি। তোরা যে গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলি সেই গুহায় প্রবেশ করতে প্রায় এক হাজার টন বরফ গলাতে হয়েছে কুয়াশাকে। আর মি. সিম্পসনকে উদ্ধার করার জন্য বরফ গলাতে হয়েছে আড়াইশো টন। প্রফেসর ওয়াইয়ের রোবটরা আমাকে সুপারম্যানে রূপান্তরিত করছিল, মহুয়ার মুণ্ডু কেটে ফেলে দিয়ে সেই জায়গায় বসাচ্ছিল যান্ত্রিক মুণ্ডু। অপারেশনের কাজ শুরু করে দিয়েছিল রোবটরা। কিন্তু কুয়াশার সময়োচিত হস্তক্ষেপে রোবটরা অচল হয়ে যায়, আমরা বেঁচে যাই। পরে কুয়াশা ভারতমহাসাগরের একটা দ্বীপ থেকে আমাদের দুজনকে উদ্ধার করে।'

শহীদ থামতে সবাই এক সাথে কথা বলে উঠল। কুয়াশার বুদ্ধি, সাহস,

দায়িত্ববোধ এবং মহানুভবতার প্রশংসায় পঞ্চমুখ সবাই।

মি. সিম্পসন বললেন, 'সত্যি, প্রতিভা বটে একটা! যতই শত্রুতা থাক তার সাথে আমার, তার মহত্ত্বকে অস্বীকার করতে পারি না আমি।'

কামাল বলল, 'আমরা এখন তাহলে আফ্রিকার উদ্দেশে যাচ্ছি!'

শহীদ বলল, 'হ্যাঁ। রহস্যপুরীর কথা মনে আছে তো?'

সবাই একযোগে চেঁচিয়ে উঠল, 'নিশ্চয়ই মনে আছে।'

শহীদ বলল, 'সেই রহস্যপুরীতেই যাচ্ছি আমরা। সেখানে কোটি কোটি টাকার গুপ্তধন আছে। আমাদের উদ্দেশ্য সে-সব উদ্ধার করা।'

মি. সিম্পসন জানতে চাইলেন, 'শয়তান প্রফেসর ওয়াই—তার খবর কি?'

সকলের পিছন থেকে অপরূপ সুন্দরী আনতারার রাজকুমারী ওমেনা বলে উঠল, 'প্রফেসর ওয়াই মারা গেছে।'

'হোয়াট! মারা গেছে!' চমকে উঠে সবাই রাজকুমারীর দিকে তাকাল।

মি. সিম্পসন প্রশ্ন করলেন, 'আপনি কে! আপনাকে তো চিনলাম না, মিস…?'

রাজকুমারী বলল, 'আমি টুইন আর্থ আনতারার রাজকুমারী। কুয়াশা আমাদের গ্রহে গিয়েছিলেন। আমি তাঁর সাথে চলে এসেছি আপনাদের পৃথিবীতে।'

'মাই গড! এসব কি শুনছি আমি শহীদ! কুয়াশা…কুয়াশা মানুষ না অতিমানব! সত্যিই তাহলে শয়তান প্রফেসর ওয়াই তাকে মহাশূন্যের কোন এক গ্রহে পাঠিয়েছিল? কিন্তু তা না হয় হলো, কুয়াশা ফিরল কিভাবে!'

শহীদ বলল, 'সে-সব অনেক বিচিত্র আর দীর্ঘ কাহিনী। পরে শুনবেন।'

কামাল রাজকুমারী ওমেনার দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল, 'প্রফেসর ওয়াই মারা গেছে সত্যি! আপনি দেখেছেন তার লাশ?'

রাজকুমারী বলল, 'না লাশ দেখিনি। তবে তার বাড়িতে বোমা ফেলছেন মি. কুয়াশা। এবং বাড়িটা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে আগুনে।'

ভারি একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল ঠিক এমন সময়, 'শহীদ!'

সবাই ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। কন্ট্রোল রুমের দরজা পেরিয়ে হলরুমে প্রবেশ করছে দীর্ঘদেহী, কালো আলখেল্লা পরিহিত স্বয়ং কুয়াশা।

দীর্ঘ পদক্ষেপে শহীদের সামনে এসে দাঁড়াল কুয়াশা। হাতে একটা ক্ষুদ্র চারকোণা রেডিওর মত যন্ত্র ধরা রয়েছে। মুখের চেহারায় একটু যেন উদ্বেগের ছাপ।

'সবাই সুস্থ তো?' মায়াময় চোখ ঘুরিয়ে সকলের দিকে একবার করে তাকাল কুয়াশা।

সকলের আগে চেঁচিয়ে উঠল ডি. কস্টা, 'ওহ্ বস্! থ্যাঙ্কস, মেনি থ্যাঙ্কস ফর সেভিং মাই ভ্যালুয়েবল লাইফ! টা, মহাশূন্যের জার্নিটা উপভোগ্য হইয়াছিল টো?'

কুয়াশা মৃদু হাসল। বলল, 'খুবই উপভোগ্য হয়েছিল ফিরতি অভিযানটা। যাবার সময় তো টেরই পাইনি।'

শহীদ বলল, 'কি ব্যাপার, কুয়াশা? তোমাকে যেন চঞ্চল মনে হচ্ছে?'

'ঠিকই ধরেছ তুমি, শহীদ! আমরা এখন আফ্রিকার ওপর রয়েছি, বুঝলে। স্পেসক্রাফট দাঁড়িয়ে আছে শূন্যে।'

'কেন! রহস্যপুরীর কাছে পৌঁছে গেছি নাকি?'

কুয়াশা বলল, 'না। রহস্যপুরী আরও একটু দূরে। থামার কারণ কি জানো, আমার এই ইণ্ডিকেটর যন্ত্র বলছে, নিচে আমাদের পরিচিত কোন শুভানুধ্যায়ী রয়েছে।'

'সেকি!'

কুয়াশা বলল, 'খুবই অবাক ব্যাপার। আফ্রিকার জঙ্গলে আমাদের কে থাকতে পারে? আমি অতি পরিচিত এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের সবার রক্তেই শুধু VNR-5 এর কণা প্রবেশ করিয়েছিলাম। সুতরাং নিচের জঙ্গলে আমার ঘনিষ্ঠ কেউই আছে।'

মি. সিম্পসন বললেন, 'আশ্চর্য লাগছে। কুয়াশা, তোমার যন্ত্রে গোলমাল নেই তো?'

'অসম্ভব।'

শহীদ বলল, 'কে হতে পারে বলে মনে করো তুমি?'

কুয়াশা বলল, 'রাসেলের কথা মনে হচ্ছে। কিন্তু রাসেল আফ্রিকার জঙ্গলে আসবে কেন? তাছাড়া ইণ্ডিকেটর যন্ত্রের সিগন্যাল দেখে আমি বুঝতে পারছি জঙ্গলের মধ্যে যে-ই থাকুক, সে খুব বিপদে আছে।'

'কি করতে চাও তুমি?'

কুয়াশা বলল, 'কি করতে চাই ঠিক করে ফেলেছি। স্পেসক্রাফট নামিয়ে সন্ধান নিতে হবে। আমি একাই যাব।'

'আমিও যাব তোমার সাথে।'

কুয়াশা বলল, 'না, শহীদ। এটা একটা ফাঁদও হতে পারে। সবাইকে রেখে আমরা দুজনই যেতে পারি না। রাত এখন, বিপদের কথা কিছুই বলা যায় না।'

শহীদের চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল, 'ফাঁদ? কে ফাঁদ পাততে পারে, কুয়াশা?'

কুয়াশা বলল, 'আমার শত্রুর কি অভাব আছে, শহীদ?'

'প্রফেসর ওয়াই?'

'নট ইমপসিবল!' কথাটা বলে ঘুরে দাঁড়াল কুয়াশা।

পিছন থেকে মি. সিম্পসন বললেন, 'কিন্তু মিস ওমেনা যে বললেন, তুমি তার বাড়ি ধ্বংস করে দিয়েছ বোমা মেরে?'

কুয়াশা দাঁড়াল না। কন্ট্রোলরুমের দরজার কাছে গিয়ে পিছন ফিরে তাকাল সে। বলল, 'বাড়িটা ধ্বংস হয়েছে বোমার আঘাতে। কিন্তু প্রফেসর ওয়াই মারা গেছে কিনা সেটা আমরা কেউ দেখিনি।' কন্ট্রোলরুমে অদৃশ্য হয়ে গেল কুয়াশা কথাটা বলে।

কুয়াশা চলে যেতেই প্রফেসর ওয়াই বেঁচে আছে কি মরে গেছে এই নিয়ে তুমুল আলোচনা শুরু হয়ে গেল মি. সিম্পসন, ডি কস্টা, কামাল এবং মহুয়ার মধ্যে।

রাজকুমারী ওমেনাও ওদের আলোচনায় যোগ দিল। তার বক্তব্য, 'বাড়িটা সম্পূর্ণ ধূলিসাৎ হয়ে গেছে, নিজের চোখে দেখেছি আমি। তা সত্ত্বেও যদি ওই বাড়ির

কেউ বেঁচে থাকে তাহলে আমি বলব সে মানুষ নয়, আর কিছু।'

তিন মিনিট পর কুয়াশার মহাশূন্যযান আফ্রিকার গভীর অরণ্যে নামল। কুয়াশা বলল, 'আমি এক ঘণ্টার মধ্যে না ফিরলে মনে করবে বিপদে পড়েছি।'

হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের বিচরণ ক্ষেত্রে একা নামল কুয়াশা অ্যালুমিনিয়ামের সিঁড়ি বেয়ে। গাঢ় অন্ধকারে চারদিক ঢাকা। অদৃশ্য হয়ে গেল কুয়াশা।

মহুয়া জানালা দিয়ে তাকিয়ে ছিল। কুয়াশা অদৃশ্য হয়ে যেতেও নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল সে। দূরে কোথাও ডাকছে একটা বাঘ। হঠাৎ একদল নেকড়ে এক যোগে ডেকে উঠল কাছে পিঠে কোথাও থেকে। শিউরে উঠল মহুয়া।

রাজকুমারী ওমেনা মহুয়ার পিছনে এসে দাঁড়াল। মহুয়াকে টেনে নিল সে কাছে। বলল, 'আপনার দাদাকে আপনি এখনও বুঝি চিনতে পারেননি? কেন শুধু শুধু কষ্ট দিচ্ছেন নিজেকে? ওঁর ক্ষতি কেউ করতে পারবে না। এ ব্যাপারে আপনি নিশ্চিত থাকুন।'

অপর জানালার সামনে দাঁড়িয়ে আছে কামাল, মি. সিম্পসন, ডি. কস্টা। শহীদ কন্ট্রোলরুমে ঢুকেছে কুয়াশা চলে যাবার পর।

হঠাৎ স্পেসক্রাফটের চারদিকে উজ্জ্বল আলোর বন্যা দেখা দিল।

শোরগোল উঠল হলরুমের ভিতর। ডি. কস্টা হাঁপাতে হাঁপাতে চেঁচাচ্ছে বাইরের দিকে তাকিয়ে, 'মি. সিম্পসন! রাইফেলটা কোঠায় বলুন টো! বাঘ শিকারের সাঢটা এই চান্সে মিটাইয়া লই। এমোন চান্স লাইফে আর মিলিবে না, ফর গডস সেক! ডেকছেন, কেমন হলুড ডোরাকাটা বাঘটা···উই মা, হাটি! কট্টোবড় হাটি রে বাপ!'

শহীদ হলরুমে ঢুকল। আলো জ্বেলে দিয়েছে সে-ই। জানালার সামনে দাঁড়াল সে। মি. সিম্পসন কোথায় জিজ্ঞেস করতে কামাল বলল, তিনি সম্ভবত কন্ট্রোলরুমে গেছেন। স্পেসক্রাফটের চারদিকে দারুণ খেলা জমে উঠেছে। বুনো জন্তুগুলো ঘুর ঘুর শুরু করছে চারদিকে। উজ্জ্বল আলোয় দেখা যাচ্ছে বাঘ, হাতি, হায়েনা, বুনো মোষও চোখে পড়ল কয়েকটা।

সবাই মেতে উঠল ছেলেমানুষের মত। সবচেয়ে উঁচু গলা ডি. কস্টার, 'এই ব্যাটা নেকড়ে, হামার ডিকে টাকিয়ে ফেস বাঁকা করিটেছিস কোন্ সাহসে! এক চড় দিয়ে মাঠা ঘুরিয়ে ডেবো···'

সময়টা কেটে গেল দেখতে দেখতে। কন্ট্রোলরুমের বৈশিষ্ট্য দেখার কৌহূহলে মি. সিম্পসন গিয়েছিলেন ভিতরে একবার। খানিক আগে বেরিয়ে এসেছেন তিনি।

শহীদ পায়চারি করছে উত্তেজিত ভাবে। হঠাৎ বলে উঠল ও, 'একঘণ্টা প্রায় হয়ে এসেছে। কুয়াশার দেখা নেই এখনও!'

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে মি. সিম্পসন ডাকলেন হঠাৎ, 'শহীদ!'

থমকে দাঁড়াল শহীদ। মি. সিম্পসন, কামাল, ডি. কস্টা, মহুয়া, রাজকুমারী—সবাই চুপ হয়ে গেছে। ব্যাপার কি!

দ্রুত জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল শহীদ।

'তাকিয়ে থাকো। দেখতে পাবে,' বললেন মি. সিম্পসন

অপেক্ষা করতে হলো না বেশিক্ষণ। শহীদ দেখতে পেল, এক গাছের আড়াল থেকে আরেক গাছের আড়ালে দ্রুত চলে গেল চারপাঁচজন নিকষ কালো জংলী। হাতে বল্লম, কাঁধে তীর ধনুক, মুখে রঙ, মাথায় পাখির পালক গোঁজা। কদাকার মুখের চেহারায় হিংস্রতার ছাপ।

'ঘিরে ফেলেছে ওরা আমাদেরকে!' কামাল উত্তেজিত।

মি. সিম্পসন বললেন, 'আমি ভয় করছি···।'

চুপ করে গেলেন মি. সিম্পসন কথাটা শেষ না করেই।

কামাল জিজ্ঞেস করল, 'কি ভয় করছেন?'

শহীদ বলল, 'ওরা স্পেসক্রাফটের কোনরকম ক্ষতি করার চেষ্টা করবে কিনা?'

মি. সিম্পসন বললেন, 'হ্যাঁ। সেই ভয়ই করছি আমি।'

শহীদ বলল, 'কন্ট্রোলরুমে যাচ্ছি আমি। দেখি জংলীদেরকে ভয় দেখিয়ে তাড়াবার কোন ব্যবস্থা করা যায় কিনা। সবাই সাবধান, ওরা তীর ছুঁড়তে পারে। ওদের তীরের ডগায় বিষ মেশানো আছে। চামড়া ছুঁলেই মৃত্যু!'

দ্রুত কন্ট্রোলরুমে গিয়ে ঢুকল শহীদ।

শহীদ যাবার পর দুই মিনিটও কাটল না, জংলীরা অপ্রত্যাশিতভাবে চারদিক থেকে চিৎকার জুড়ে দিল। শুধু তাই নয়, গাছের আড়াল থেকে লাফাতে লাফাতে বেরিয়ে এসে যে যেদিকে পারল ছুটল সবাই।

'কি ব্যাপার! অমন পাগলের মত ছুটোছুটি করছে কেন ওরা!'

'মৌমাছির চাকে ঢিল মারিয়াছে বোধহয়···'

কামাল গর্জে উঠল, 'থামুন আপনি! বুদ্ধিশুদ্ধির মাথা একেবারে খেয়ে বসে আছেন দেখছি!'

মি. সিম্পসন বললেন, 'শহীদ বোধহয় কন্ট্রোলরুম থেকে এমন কিছু করেছে যা দেখে ভয় পেয়েছে ওরা···।'

এমন সময় আবার ফিরে এল শহীদ হলরুমে, 'কামাল, ব্যাপার কি বল তো? জংলীরা হঠাৎ অমন আতঙ্কিত হয়ে ছুটোছুটি শুরু করল কেন!'

'তুমি কিছু করোনি তাহলে?'

'না!'

কামাল বলল, 'ভারি অবাক কাণ্ড তো!'

শহীদ জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। জংলীরা গলা ছেড়ে চেঁচাচ্ছে। ছুটোছুটির বিরাম নেই তাদের। দিক হারিয়ে ফেলেছে সবাই, কেউ ছুটছে দক্ষিণ দিকে, কেউ ছুটছে উত্তর দিকে। দলবদ্ধভাবে, দল ছাড়া, যে যেভাবে পারছে ছুটছে।

শহীদ হঠাৎ কেঁপে উঠল।

'মি. সিম্পসন! কামাল! চেয়ে দেখ, আকাশের দিকে চেয়ে দেখ!'

সবাই তাকাল শহীদের কথা মত।

কথা ফুটল না কারও মুখে। রাতের কালো আকাশ লাল হয়ে উঠেছে। গাছপালার উপরের আকাশে যেদিকে তাকাচ্ছে ওরা সেদিকেই দেখতে পাচ্ছে লালচে একটা আভা।

'শহীদ!' কামাল শহীদের দিকে ঘুরে দাঁড়াল।

'আগুন!' মি. সিম্পসন বললেন ঢোক গিলে।

শহীদ বলল, 'সর্বনাশ! বনভূমির চারদিকে কেউ আগুন ধরিয়ে দিয়েছে!'

মি. সিম্পসন বললেন, 'কিন্তু এই রকম দাবাগ্নির কথা কখনও শুনিনি। চারদিকে একই সময়...।'

শহীদ দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'এ নিশ্চয়ই প্রফেসর ওয়াইয়ের কাণ্ড! কুয়াশাকে কৌশলে সে বনভূমিতে নামিয়েছে। এটা তার ফাঁদ!'

রাজকুমারী এবং মহুয়া কাছে এসে দাঁড়াল।

'শহীদ, কি হবে!'

রাজকুমারী আশ্বাস দিল মহুয়াকে, 'কিছুই নেই ভয়ের! আগুন কোন ক্ষতিই করতে পারবে না আমাদের। স্পেসক্রাফট অপারেট করতে জানি আমি। মি. শহীদও সম্ভবত জানেন। আমরা উঠে যাব ওপরে।'

শহীদ বলল, 'দেরি করে লাভ নেই, ওমেনা, চলো, বনভূমি ছেড়ে শূন্যে উঠে যাবারই ব্যবস্থা করি।'

কন্ট্রোলরুমে গিয়ে ঢুকল ওরা।

মি. সিম্পসন একটা চুরুট ধরালেন। রীতিমত চিন্তিত দেখাচ্ছে তাঁকে।

মহুয়া কামালের একটা হাত ধরে বলল, 'দাদার কি হবে?'

কামাল বলল, 'কুয়াশা বোকা নয়, মহুয়াদি। এটা যে একটা ফাঁদ তা সে আগেই অনুমান করেছিল। সুতরাং নিজেকে রক্ষা করার উপায়ও ঠিক করে রেখেছিল সে মনে মনে। প্রফেসর ওয়াই কোন ক্ষতিই করতে পারবে না তার।'

মিনিট পাঁচেক পর হলরুমে ছুটে প্রবেশ করল ওমেনা এবং শহীদ। শুকিয়ে গেছে শহীদের মুখ। ওমেনা হাঁপাচ্ছে।

'স্পেসক্রাফট নষ্ট হয়ে গেছে! কামাল, আর একমুহূর্ত দেরি না করে নেমে পড় সবাই! আগুনের বেড় থেকে গা বাঁচিয়ে যেমন করেই হোক বেরিয়ে যেতে হবে আমাদেরকে।'

'বাট দ্যাটস ইম্পসিবল, মাই বয়!' মি. সিম্পসন বলে উঠলেন।

শহীদ স্পেসক্রাফটের দরজা খুলতে খুলতে বলল, 'সম্ভব কি অসম্ভব সেটা এখন ভেবে লাভ নেই। এছাড়া উপায় নেই এখন। স্পেসক্রাফট সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে। ফুয়েল ট্যাঙ্ক শূন্য, ইনস্ট্রুমেন্ট প্যানেলের সব কানেকশন বিচ্ছিন্ন, রাডারের তার ছেঁড়া, কমপিউটার কন্ট্রোল সম্পূর্ণ নষ্ট। উড়বে না, উড়বে না এটা আর।'

মহুয়া বলল, 'কিন্তু নষ্ট হলো কিভাবে?'

শহীদ কি যেন বলতে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগেই ওমেনা বলে উঠল, 'আমাদের মধ্যে থেকেই কেউ এই শত্রুতামূলক কাজটা করেছেন। শুধু তাই নয়, স্পেসক্রাফটে একটা মেয়াদী বোমাও রয়েছে। টাইম বোমা আমাদের কারও সাথেই ছিল। পিন তুলে, কাঁটা নির্দিষ্ট সময়ের ঘরে ঘুরিয়ে দেয়া হয়েছে। নির্দিষ্ট সময়টা কখন তা আমরা জানতে পারছি না। এই শত্রুতামূলক কাজ যিনি করেছেন একমাত্র তার পক্ষেই তা জানা সম্ভব। বোমাটা যে-কোন মুহূর্তে বিস্ফোরিত হতে পারে।

আমাদের ইণ্ডিকেটর যন্ত্রে বোমাটার অস্তিত্ব ধরা পড়েছে। সেটাকে খুঁজে বের করা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। খুঁজে পাবার আগেই সেটা ফেটে যেতে পারে।'

মি. সিম্পসন বলে উঠলেন, 'হোয়াট! মাই গড! এসব কি শুনছি! টাইম বোমা! কে··· কে···?'

শহীদ বাধা দিয়ে বলল, 'তা না-ও হতে পারে, মি. সিম্পসন। আমার ধারণা সম্পূর্ণ অন্যরকম। যাক্, এ বিষয়ে কথা বলার সময় এটা নয়। চারদিক্ থেকে দ্রুত এগিয়ে আসছে দাবাগ্নি। স্পেসক্রাফটে আর একমুহূর্ত থাকাও নিরাপদ নয়। এই দুই বিপদের হাত থেকে বাঁচব কি মরব জানি না—কিন্তু চেষ্টা করতে হবে আমাদেরকে!'

আর সময় নষ্ট করল না ওরা।

সিঁড়ি বেয়ে শহীদের পিছু পিছু বনভূমিতে নামল সবাই।

দুই

সাবেক বেলজিয়ান কঙ্গো-বর্তমানে ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক অভ কঙ্গো। আফ্রিকার গর্ব কঙ্গো। অকুতোভয় শিকারীদের তীর্থভূমি কঙ্গো। কঙ্গো—পৃথিবীর সবচেয়ে গহীন অরণ্য। গরিলা, শিম্পাঞ্জী, ওরাংওটাংদের আবাস ভূমি; সিংহ, বাঘ, গণ্ডার, হায়েনা, নেকড়ে আর বুনো হাতির অবাধ বিচরণ ক্ষেত্র; অসভ্য জংলী বর্বর উপজাতিদের জন্মভূমি এই বিশাল অরণ্য।

বনভূমি কোথাও কোথাও এমনই গভীর যে সূর্যের আলো ঘনসন্নিবেশিত গাছপালার শাখা প্রশাখা ও পাতা ভেদ করে নিচে পর্যন্ত পৌঁছুতে পারে না। এই গভীর বনভূমিতে—কত শত দুর্ধর্ষ শিকারী যে যুগ যুগ ধরে প্রাণ হারিয়েছে তার হিসেব করা সম্ভব নয়।

কঙ্গোর অরণ্যে এখন নিকষ কালো গভীর রাত। হিংস্র, মাংসখেকো জীবজন্তুরা অভিযানে বেরিয়েছে। খাদ্য চাই।

আহারের তালিকা এক এক পশুর এক এক রকম। বাঘের চাই হরিণ, শিয়ালের বাচ্চা, খরগোস। তবে খিদে যদি প্রচণ্ড হয়ে ওঠে, বুনো মোষের উপরও হামলা চালাতে দ্বিধা করবে না সে। কিংবা যদি চোখে পড়ে এক-আধটা মানুষ, তবে তো কথাই নেই। সিংহের চাই মোষ, বুনো ছাগল, উপাদেয় হরিণের মাংস, এবং মানুষ। হায়েনারও চাই ছাগল, হরিণ, ধাড়ী শিয়াল। মানুষ দেখলে আনন্দে হেসে খুন হবে সে, তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে তার দেহের মাংস।

আট মণ ওজনের অজগর গুহা থেকে বেরিয়ে এঁকেবেঁকে ধীর গতিতে চলেছে শিকারের সন্ধানে। বড় আকারের হরিণ বা একটা ছাগল হলেই তার চলবে। মানুষকে গিলে খাবার সাধ তার থাকলেও, চলার গতি মন্থর বলে সচরাচর সে মানুষকে বাগে আনতে পারে না।

রাত নামলেই এই সব শক্তিশালী হিংস্র সরীসৃপ এবং পশুকুল যে যার আস্তানা ছেড়ে বেরিয়ে আসে। পেট পূজার তাগিদে ওত পেতে থাকে ঝোপ-ঝাড়ে, অপেক্ষা করতে থাকে শিকারের জন্য।

রাতের বনভূমি জেগে উঠেছে। দুর্বলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে সবল। বাঘের পেটে যাচ্ছে শিয়ালের বাচ্চা, সিংহের পেটে যাচ্ছে বুনো মোষ। অরণ্যের সর্বত্র ভোজ শুরু হয়ে গেছে যেন।

সিংহের গর্জন, বাঘের হাঁক, হায়েনার কর্কশ হাসি, রাত জাগা বিচিত্র সব পাখিদের পাখা ঝাপটাবার শব্দ, দুর্বল পশুদের আর্তরব, চারদিকে নারকীয় কাণ্ড।

কঙ্গোর এই রাতের অরণ্যের কথা ভাবলেই আত্মা খাঁচা ছাড়া হয়ে যায় মানুষের। আধুনিকতম মারণাস্ত্রে সজ্জিত কোন মানুষও এই অরণ্যে বেশিক্ষণ বেঁচে থাকার কথা ভাবতে পারে না। কখন কোনদিক থেকে বিপদ আসবে তা পূর্ব মুহূর্তেও জানা সম্ভব নয়। একবার আর্নেস্ট হেমিংওয়ে এই অঞ্চল থেকে শিকার করে ফিরবার পর তাঁর ভক্তরা তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'আচ্ছা, শুনেছি রাতের বেলায় জঙ্গলের মধ্যে টর্চ হাতে নিয়ে চললে নাকি হিংস্র জন্তু জানোয়াররা কিছু বলে না? টর্চ হাতে চলা নাকি খুবই নিরাপদ?'

তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, 'ঠিকই শুনেছেন, তবে সেটা নির্ভর করে টর্চ হাতে কত দ্রুত চলেছেন, তার ওপর।'

চারদিক অন্ধকার। কিন্তু অন্ধকারে চোখ জ্বলে পশুকুলের। তারা সব দেখতে পায়।

দীর্ঘদেহী মানুষটাকে। দেখতে পেল অরণ্যের হিংস্র বাসিন্দারা। কে যায়! কে যায়! কার এত সাহস! কী আনন্দ, কী আনন্দ—একটা মানুষ যায়! একটা শিকার যায়।

সাড়া পড়ে গেল গভীর অরণ্যে। মানুষ যায়! একটা শিকার যায়!

দীর্ঘ পদক্ষেপে দ্রুত হাঁটছিল কুয়াশা। কালো আলখেল্লা উড়ছে তার। কখনও লাফ দিয়ে ছোট ছোট ঝোপঝাড় টপকে, স্যাঁৎ করে সরে দিক পরিবর্তন করে, কখনও গাছের ঝুরি ধরে ঝুলতে ঝুলতে পুব দিক থেকে পশ্চিম দিকে এগিয়ে চলেছে সে। কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই তার। মাথা উঁচু করে বীরোচিত ভঙ্গিতে অকুতোভয়ে অগ্রসর হচ্ছে। একদল নেকড়ে পড়ল সামনে। কুয়াশাকে দেখে উল্লসিত হয়ে বিকট কণ্ঠে হাঁক দিয়ে ছুটে এল দলটা, হঠাৎ কি যে হলো, আঁৎকে উঠে দৌড়ে পালাল সবগুলো নেকড়ে দলছাড়া হয়ে নানাদিকে।

কিছুই যেন ঘটেনি। আগের মতই এগিয়ে চলেছে কুয়াশা। মুখে তার নিজের আবিষ্কৃত একটা মুখোশ। মুখোশের উপরিভাগে একটা টর্চের সামনেটার মত বস্তু আটকানো। একটা টর্চই ওটা। তবে আলো দেখা যায় না। এই টর্চের আলো দেখতে হলে চোখে পরতে হবে বিশেষ একটা চশমা। মুখোশের সাথে ফিট করা রয়েছে নিজের আবিষ্কৃত চশমার কাঁচ দুটো। ফলে অন্ধকারেও পরিষ্কার সব দেখতে পাচ্ছে কুয়াশা।

কুয়াশা এগোয়। পশুরা সব ছুটে পালায়। একটা জেব্রাকে ধরাশায়ী করে একটা বাঘ সবেমাত্র আহারে মনোযোগ দিয়েছে, হঠাৎ সেখানে দেখা গেল কুয়াশাকে। গর্জে উঠল বাঘ। আহারের সময় বিঘ্ন সৃষ্টি করে, এত সাহস কার? লাফ দিয়ে কুয়াশার ঘাড়ে পড়তে গিয়েও থমকে গেল বাঘটা। বিকট গর্জনে চারদিকের বনভূমি

কাঁপিয়ে দিয়ে দিশেহারার মত লাফ দিল সে ঠিকই, কিন্তু কুয়াশার উপর নয়। চোখের পলকে কুয়াশার পথ ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে গেল সে।

চলার গতি বাড়িয়ে দিল কুয়াশা। আফ্রিকার জঙ্গলে তার পরিচিত কোন মানুষ বিপদে পড়েছে। ইণ্ডিকেটর যন্ত্র দেখে ব্যাপারটা টের পেয়েছে সে। মানুষটা যে কে, তা সে জানে না। তবে সুপরিচিত কেউ তাতে কোন সন্দেহ নেই। শুধু মাত্র সুপরিচিত ব্যক্তিদের রক্তেই VNR-5 সামান্য পরিমাণে মিশিয়ে দিয়েছিল কুয়াশা। এটা যাদের শরীরের রক্তে থাকবে তারা যেখানেই থাকুক, কুয়াশার ইণ্ডিকেটর যন্ত্রে তাদের অবস্থান ধরা পড়বেই। পাঁচশো মাইলের মধ্যে এই পদ্ধতি কার্যকরী।

জঙ্গলের মাইল আড়াইয়ের মধ্যেই, পশ্চিম দিকে, সেই ব্যক্তি আছে।

ব্যাপারটা প্রথম ধরা পড়ে স্পেসক্রাফটে থাকার সময়।

শহীদ ও মহুয়া, কামাল ও ডি. কস্টা এবং মি. সিম্পসনকে পৃথিবীর বিভিন্ন দুর্গম এলাকা থেকে উদ্ধার করে কুয়াশা তার স্পেসক্রাফটে চড়ে উড়ে যাচ্ছিল জঙ্গলের উপর দিয়ে রহস্যপুরীর দিকে।

রহস্যপুরী সত্যিই রহস্যপুরী। ভাবছে কুয়াশা।

এই রহস্যপুরীকে কেন্দ্র করে শতশত কিংবদন্তী প্রচলিত আফ্রিকার বিভিন্ন রাজ্যে। কিন্তু দুর্গম অরণ্যের কোথায় যে আছে রহস্যপুরী তা আজও কেউ জানতে পারেনি। সভ্য জগতের কোন মানুষ রহস্যপুরী দেখে ফিরে যেতে পারেনি।

একমাত্র ব্যতিক্রম আবিদ। ভাগ্যক্রমে আজও বেঁচে আছে সে। কিন্তু আবিদকে বন্দী করে রেখেছে প্রফেসর ওয়াই।

আবিদই সর্বপ্রথম রহস্যপুরী সম্পর্কে বাস্তব তথ্য দিতে সক্ষম হয়। রহস্যপুরী সত্যি আছে। নিজের চোখে দেখেছে সে। আফ্রিকার জঙ্গলে এক যুগেরও বেশি কাল ছিল সে। অদ্ভুত সব অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। কিশোর বয়সে ভাগ্যের তাড়া খেয়ে ঢাকা থেকে এই গহীন জঙ্গলে আশ্রয় নেয় আবিদ ও শ্বেতাঙ্গিনী লিজা। গরিলাদের সাথে বসবাস করে তারা। গড়ে তোলে আবিদ বিরাট গরিলাবাহিনী। সে এক দীর্ঘ কাহিনী।*

জংলী অসভ্যদের চল্লিশটা উপজাতি প্রতি দশ বছর অন্তর সদলবলে যাত্রা করে সেই রহস্যপুরীর উদ্দেশে। সাথে করে নিয়ে যায় সভ্য জগতের বন্দীদেরকে। রহস্যপুরীতে দেবতাদের বসবাস। দেবতাদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য জংলীরা বলি দেয় বন্দীদের ধরে নিয়ে গিয়ে। সাথে করে নিয়ে যায় জংলীরা দশবছর ধরে সংগৃহীত স্বর্ণ, মূল্যবান পাথর এবং রূপা। এই সব মূল্যবান জিনিস তারা দেবতাদের আশীর্বাদ লাভের জন্য রেখে আসে রহস্যপুরীতে। প্রতি বছরই আসে কয়েকটা করে দল।

জংলীরা এই নিয়ম পালন করে আসছে হাজার বছর ধরে। আজও সেই নিয়ম অটুট।

---

* সেই চমকপ্রদ কাহিনী জানতে হলে পড়ুন কুয়াশা-৪৫

জংলীজাতি ছাড়া সভ্য দুনিয়ার কোন লোক বা দল রহস্যপুরীতে প্রবেশের অনুমতি পায় না। তেমন কেউ যদি রহস্যপুরীতে প্রবেশ করে কখনও, সেইখানেই তার মৃত্যু। আজ পর্যন্ত রহস্যপুরীতে প্রবেশ করে প্রাণ নিয়ে ফিরে আসতে পারেনি কেউ।

ইথিওপিয়ার সম্রাট হাইলে সেলাসী, উগাণ্ডার প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল ইদি আমিন, সউদী আরবের বাদশা সউদ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অভিযাত্রী দল পাঠান। অভিযাত্রীরা সবাই আধুনিক মারণাস্ত্রে সজ্জিত ছিল। কিন্তু অভিযাত্রীদের কেউই রহস্যপুরীর ধারে কাছেও পৌঁছুতে পারেনি।

আবিদ রহস্যপুরীর সঠিক অবস্থানের কথা জানে, এই খবর দুনিয়াময় ছড়িয়ে পড়ে। ফিল্ড মার্শাল ইদি আমিন আবিদকে উগাণ্ডার নাগরিকত্ব দান করেন এবং রহস্যপুরীতে অভিযান চালাবার জন্য একটি অভিযাত্রীদলের নেতা হিসেবে তাকে নির্বাচন করেন। কিন্তু আবিদকে কাম্পালা থেকে কিডন্যাপ করে গ্রেট ম্যাজিশিয়ান, ওরফে প্রফেসর ওয়াই।

প্রফেসর ওয়াইয়ের উদ্দেশ্য অতি পরিষ্কার। রহস্যপুরীতে হাজার হাজার বছর ধরে যে স্বর্ণের পাহাড় গড়ে উঠেছে তা হস্তগত করতে চায় সে।

স্বর্ণের সেই পাহাড়ের মালিক হতে চায় কুয়াশাও।

তাই এই অভিযান।

জঙ্গলের উপর দিয়ে যাচ্ছিল কুয়াশার স্পেসক্রাফট। হঠাৎ ইণ্ডিকেটর যন্ত্রে নজর পড়ে। চমকে ওঠে কুয়াশা। বুঝতে পারে জঙ্গলের ভিতর তার পরিচিত কেউ আছে? মানুষটা যে-ই হোক, সে খুব বিপদে আছে। তার হার্টবিট স্বাভাবিকের চেয়ে দ্রুত গতিতে কাজ করছে। স্পেসক্রাফট নামিয়ে ফেলে কুয়াশা। শহীদ, মি. সিম্পসন, কামাল, ডি. কস্টা, মহুয়া এবং আনতারার রাজকুমারী ওমেনাকে স্পেসক্রাফটে রেখে চলে এসেছে কুয়াশা কর্তব্যের খাতিরে। একঘণ্টার মধ্যে ফিরবে, শহীদকে জানিয়ে এসেছে সে। কিন্তু তা বোধহয় সম্ভব নয়। যে লোক এই জঙ্গলে আছে সে ক্রমশ সরে যাচ্ছে দূরে।

ইণ্ডিকেটরের রিডিং অনুযায়ী লোকটা আরও মাইল দুয়েক পশ্চিমে আছে। কিন্তু কুয়াশা যতই এগোচ্ছে, লোকটাও তত দূরে সরে যাচ্ছে। খানিক পর পর ঘড়ির সাথে ফিট করা ইণ্ডিকেটর যন্ত্রটা দেখে নিচ্ছে সে। সেই একই অবস্থা। দূরত্ব আগের মতই থাকছে, কমছে না।

ফাঁদ? প্রফেসর ওয়াই তার পরিচিত কাউকে বন্দী করে এই গহীনতম অরণ্যে নিয়ে এসেছে ফাঁদ পাতবার জন্য?

অসম্ভব নয়। বোমা মেরে প্রফেসরের ঢাকার কন্ট্রোলরুম সহ আটতলা উঁচু বাড়িটা মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়ে এসেছে কুয়াশা। এত তাড়াতাড়ি প্রফেসর ভোলেনি সে-কথা নিশ্চয়ই। প্রতিশোধ নেবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করবে সে তাতে আর আশ্চর্য কি!

ভয় করে না কুয়াশা। অবাধ্য প্রফেসর যখন তখন তার ভয়ঙ্কর হিংস্র থাবা

মারতে পারে কুয়াশাকে লক্ষ্য করে। কুয়াশা সেজন্যে সদা প্রস্তুত। অবাধ্য প্রফেসরের ভয়ে কর্তব্য পালনে পিছিয়ে যাবার কথা ভাবতেই পারে না সে। ফাঁদই যদি হয়, হোক। দেখা যাক ফাঁদে ফেলে প্রফেসর ওয়াই তার কোন ক্ষতি করতে পারে কিনা।

তবে এমনও তো হতে পারে এই ঘটনার সাথে প্রফেসর ওয়াইয়ের কোন সম্পর্কই নেই। তার পরিচিত লোকটি হয়তো ঘটনাচক্রে এসে পড়েছে কঙ্গোর এই অরণ্যে। বিপদে পড়েছে সে, তাই পালাচ্ছে। কিংবা জংলীদের হাতে বন্দী হয়েছে, জংলীরা তাকে নিয়ে যাচ্ছে ধরে নিজেদের গ্রামের দিকে।

ছোট একটা নালা পড়ল সামনে। দীর্ঘ লাফ দিয়ে নালাটা অতিক্রম করে স্যাঁৎ করে সরে গেল কুয়াশা। কালো একটা তিনহাত লম্বা ফ্লাইং স্নেক কুয়াশার মাথার পাশ দিয়ে উড়ে গেল। আর একটু হলে বিষ দাঁত বসিয়ে দিত কুয়াশার কপালে।

ঘড়ি দেখল কুয়াশা। রাত আড়াইটা। হঠাৎ থামল সে। প্রায় একঘণ্টা কেটে গেছে। এই প্রথম দাঁড়াল কুয়াশা।

রাতের জঙ্গল। চারদিকে ঘন কালো অন্ধকার। ঝোপ-ঝাড় কেঁপে উঠছে। প্রকাণ্ডদেহী বাঘ, নেকড়ে আর হায়েনার দল লাফ দিয়ে সরে যাচ্ছে সামনের চলার পথ থেকে। কোন হিংস্র জন্তুই আক্রমণ করেনি কুয়াশাকে এখনও। কেউ পিছু পিছু আসছেও না।

কুয়াশা জোরে শ্বাস গ্রহণ করল। ভুল হয়নি তার। একটা ঝাঁঝাল টকটক গন্ধ নাকে ঢুকেছে বলেই দাঁড়িয়ে পড়েছে সে। এ গন্ধ তার চেনা। আফ্রিকার জঙ্গলে এর আগে বহুবার অভিযান চালিয়েছে সে। এ গন্ধ চিনতে ভুল হবার কথা নয়।

অসভ্য জংলীরা বিভিন্ন উপজাতি, গোষ্ঠী, দল এবং উপদলে বিভক্ত। এদের আলাদা আলাদা নামও আছে। জুজু উপজাতির লোকসংখ্যা সবচেয়ে বেশি। তাদের প্রিয় মদ হলো চুচুন। গন্ধটা যে চুচুনের তাতে কোন সন্দেহ নেই।

সামনের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল কুয়াশা। ডান হাতে শক্ত করে ধরা মিনি লেজারগান। টর্চের মত দেখতে। বাঁ হাতে একটা স্প্রে মেশিন। কিছুক্ষণ পর পর বোতাম টিপে বিষাক্ত গ্যাস স্প্রে করে বাতাসে ছড়িয়ে দিচ্ছে সে। এই গ্যাস আবিষ্কারক সে নিজেই। বাঘ-ভালুক, সিংহ প্রভৃতি হিংস্র পশুরা এই গ্যাসের গন্ধ সহ্য করতে পারে না। এর আগেই পরীক্ষা করে সুফল পেয়েছে কুয়াশা। ল্যাবরেটরিতে তিনমাস অক্লান্ত রিসার্চ করার পর এই গ্যাস আবিষ্কার করে সে। নাক দিয়ে এই গ্যাস ফুসফুসে প্রবেশ করার সাথে সাথে তীব্র জ্বালা শুরু হয়ে যায় শরীরের ভেতর। আগুন জ্বলে ওঠে যেন পশুদের শরীরের রক্তে মাংসে।

অন্ধকার হলেও দিবালোকের মত পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে সব কুয়াশা। কোথাও কেউ নেই। কিন্তু চুচুনের গন্ধ তো আর মিথ্যে নয়। নিঃশব্দে এগোল কুয়াশা।

হঠাৎ গতি রুদ্ধ হয়ে যায়। বানরের মত গাছের ডালে বসে আছে জংলীটা।

তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে থাকে কুয়াশা। একজন নয়। অন্তত চারজনকে দেখতে পাচ্ছে সে চারটে গাছের ডালে।

চেহারা ইত্যাদি দেখেই কুয়াশা বুঝল এরা জুজু উপজাতির লোক। গরিলার মত প্রকাণ্ড শরীর। সারা গায়ে এবং মুখে লাল এবং সাদা রঙের লম্বা লম্বা ডোরা। মাথায় সাপের চামড়া জড়ানো। সেই চামড়ায় গোঁজা ঈগল পাখির পালক। সম্পূর্ণ উলঙ্গ ওরা। কোমরে বেল্টের মত বাঁধা গো-সাপের চামড়া। হাতে তীর-ধনুক। গাছের ডালে গেঁথে রেখেছে বর্শা।

ধনুকে তীর লাগিয়ে তৈরি হয়ে আছে জংলী চারজন। একটু অবাকই হলো কুয়াশা। জংলীদের মুখের চেহারায় ফুটে উঠেছে অধীর উত্তেজনা। অপেক্ষা করছে ওরা। কার জন্য?

কঙ্গোর জঙ্গলে এমন কি জংলীরাও গ্রাম ছেড়ে বেরোয় না রাতে। হিংস্র পশুদের হাতে প্রাণ হারাতে কে চায়। জংলীরাজের জরুরী আদেশ পেলে অবশ্য করার কিছু থাকে না কারও। কিন্তু জংলীরাজ কেনই বা এই রাতে তার প্রজাদের পাঠাবে জঙ্গলে? বিষাক্ত তীর নিয়ে কার জন্যে অপেক্ষা করছে ওরা! তার জন্যে···কিন্তু সে এই পথে আসছে তা এরা জানল কিভাবে?

হঠাৎ খেয়াল হলো কুয়াশার, সময় নষ্ট হচ্ছে। পকেট থেকে নিঃশব্দে একটা পিস্তল বের করল সে। গাছের ডালে বসা জংলীরা কুয়াশাকে ছাড়িয়ে আরও দূরের দিকে তাকিয়ে আছে। সামনের গাছের জংলীর দিকে পিস্তল তাক করল কুয়াশা। ট্রিগারে আঙুল চেপে বসল।

কোন শব্দ হলো না। জংলীটা তীব্র ব্যথায় নীল হয়ে গেল। চিৎকার করার অবসরও পেল না সে। গাছের উঁচু ডাল থেকে ঢলে পড়ে গেল সে নিচে। নিঃসাড় হয়ে গেল দেহটা।

একে একে বাকি তিনজনেরও সেই একই অবস্থা হলো। কুয়াশা পিস্তল তুলে আঙুল দিয়ে ট্রিগারে টান মারতে লাগল, একটা করে জংলী জ্ঞান হারাতে লাগল।

দুজন আটকে রইল গাছের ডালেই। বাকি দু'জন সশব্দে পড়ল মাটিতে। কুয়াশা অচেতন দেহগুলোর মাঝখান দিয়ে হন হন করে এগিয়ে যেতে শুরু করল আবার।

সব অস্ত্র কুয়াশার নিজের আবিষ্কৃত। খানিক আগে যে পিস্তল ব্যবহার করল সেটিও তাই। কুয়াশা স্বয়ং যেমন অভিনব বুদ্ধির অধিকারী, রহস্যে ভরা তার জীবন, তেমনি তার আবিষ্কৃত অস্ত্রগুলোও রহস্যময় এবং অভিনব। দেখতে অস্ত্রটা পিস্তলের মত হলেও, এর ভিতর বুলেট নেই। বুলেটের পরিবর্তে এই পিস্তল থেকে ছুটে যায় ক্ষুদ্র একটা সুচ। সুচের আগায় মাখানো আছে ওষুধ। এই ওষুধ যার রক্তের সাথে মিশবে সে জ্ঞান হারাবে সাথে সাথে। ঘণ্টা দুয়েকের আগে সে জ্ঞান ফেরার আর কোন সম্ভাবনা নেই।

অজ্ঞান জংলীগুলোকে বাঘ ভালুক বা নেকড়ের দল যাতে হজম করে না ফেলে তার ব্যবস্থাও করে গেছে কুয়াশা। স্প্রে করে দিয়েছে সে চারপাশে স্ব আবিষ্কৃত গ্যাস। কয়েকটা ঘণ্টা কেউ এদিকে ঘেঁষতে পারবে না।

পিস্তলটা পকেটে রেখে দিয়েছে কুয়াশা। হাতে লেজারগান। চলার গতি একটু মন্থর এখন। কপালে চিন্তার রেখা। জংলীদের ব্যাপারটা মন থেকে মুছে ফেলতে পারছে না সে।

কার নির্দেশে মাত্র চারজন জংলী তার জন্য বিষাক্ত তীর নিয়ে অপেক্ষা করছিল? খুঁত খুঁত করছে মন। প্রফেসর ওয়াইয়ের হাত আছে কি? কিন্তু প্রফেসর এমন কাঁচা কাজ করার চীজ নয়। সে জানে চারজন বা আটজন জংলী তার কোন ক্ষতিই করতে পারবে না।

সাবধান হয়ে গেছে কুয়াশা। হয়তো ওই চারজন অগ্রবর্তী দলের ক্ষুদ্র অংশ মাত্র! সামনে বাকি সবাই তৈরি হয়ে আছে।

দাঁড়াল কুয়াশা। পকেট থেকে বের করল ইণ্ডিকেটর যন্ত্রটা। সর্বনাশ। দূরত্ব কমা তো দূরের কথা, আরও বেড়েছে। পরিচিত অথচ নাম-না জানা লোকটা দূরে সরে গেছে আরও।

পকেটে ঢুকিয়ে রাখল কুয়াশা যন্ত্রটা। রাত তিনটে। কান পেতে কিছু শোনার চেষ্টা করল সে। বহু দূর থেকে ভেসে আসছে পশুদের গর্জন।

খটকা লাগল। স্থির দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে কি যেন শোনার চেষ্টা করল সে। পিছনে ফেলে আসা বনভূমির দিক থেকে ভেসে আসছে অদ্ভুত সব ধ্বনি। বাঘের ডাক, সিংহের গর্জন, নেকড়েদের সম্মিলিত কর্কশ ট্রাম্পেট সঙ্গীত। ব্যাপার কি! বনের পশুরা অমন ভয়ার্ত রবে হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি শুরু করেছে কেন?

চিন্তিত হয়ে উঠল কুয়াশা। কি এমন ঘটতে পারে? পশুদের মধ্যে লড়াই শুরু হলেও এমন হবার কথা নয়। এ যেন বনের সব পশু পাখি একযোগে বিপদে পড়ে আর্ত রবে কাঁপিয়ে তুলছে দূরের বনাঞ্চল।

দাবাগ্নি? হতে পারে। একমাত্র চারদিকে আগুন ছড়িয়ে পড়লেই পশুরা এমন অসহায় ভাবে চিৎকার জুড়ে দেয়। এর আগের অভিজ্ঞতা সে-কথাই বলে।

শহীদদের কথা ভেবে চিন্তা হলো কুয়াশার। পরমুহূর্তে প্রবোধ দিল নিজেকে—শহীদ জানে কিভাবে আত্মরক্ষা করতে হয়। তাছাড়া স্পেসক্রাফট তো আছেই। বনভূমিতে আগুন লাগলে স্পেসক্রাফট নিয়ে উঠে যাবে ওরা শূন্যে।

পা বাড়াল আবার কুয়াশা। ফিরে যাবার কথা ভাবতেও রাজি নয় সে। একজন লোক বিপদে পড়ে আছে, তাকে উদ্ধার করতেই হবে।

আরও আধঘণ্টা অবিরাম হাঁটার পর কুয়াশা থামল। লক্ষণ ভাল নয়। জুজু উপজাতিরা যুদ্ধ করতে প্রস্তুত দেখা যাচ্ছে। গভীর বনভূমির যতটা দেখা যায়, কেউ কোথাও নেই। কিন্তু সামনে গাছের ডালে ঝুলছে একটা নরকঙ্কাল। কঙ্কালের মাথাটা নিচের দিকে, পা দুটো গাছের ডালের সাথে বাঁধা। বড় অশুভ লক্ষণ। জুজুরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হবার পর এইভাবে গাছের ডালে ঝুলিয়ে রাখে নরকঙ্কাল, এটা তাদের একটা প্রাচীন রীতি।

খসখস করে উঠল ডানদিকের ঝোপঝাড়। লেজারগান তুলল কুয়াশা। থেমে গেল ঝোপটা আর নড়ছে না। শুকনো পাতা মাড়িয়ে কারা যেন এগিয়ে আসছে সামনের দিক থেকে।

এক মুহূর্ত পর ঝট্ করে পিছন দিকে তাকাল কুয়াশা। পাতা মাড়িয়ে পিছন থেকেও আসছে কারা যেন।

অথচ কাউকে এখনও দেখতে পাচ্ছে না কুয়াশা। সড়াৎ করে সরে গেল সে। বাতাসে শিস কেটে বেরিয়ে গেল একটা তীর।

মানুষ সমান উঁচু একটা ঝোপের ভিতর প্রবেশ করল কুয়াশা। বিপদ ঘিরে ধরেছে তাকে চারদিক থেকে। জুজু উপজাতির অসভ্যরা ফাঁদ পাততে ওস্তাদ। কুয়াশা বুঝতে পারছে ফাঁদের মাঝখানে আটকা পড়ে গেছে সে।

কোথাও কিছু নেই হঠাৎ বনভূমি থর থর করে কেঁপে উঠল ঢাক-ঢোল আর করতাল, জংলীদের বিকট চিৎকার আর উল্লাসধ্বনিতে।

তিন

ঝোপ-ঝাড় আর গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল জংলীরা। জ্বলে উঠল তাদের হাতে বিশ-পঁচিশটা মশাল। লালচে আলোয় জেগে উঠল যেন বনভূমি। ঢাক-ঢোল বাজাতে বাজাতে এগিয়ে আসছে চারদিক থেকে অসভ্যরা। নাচতে নাচতে, বাতাসে এলোপাতাড়ি হাত-পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে, বিকট চিৎকারে আনন্দ প্রকাশ করতে করতে ঝোপটার দিকে এগিয়ে আসছে সবাই।

মুখোশটা খুলে দ্রুত ভাঁজ করে পকেটে ভরে ফেলল কুয়াশা। হাতের লেজারগানটার দিকে তাকাল একবার। জংলীরা সংখ্যায় দুই থেকে আড়াইশোর কম হবে না। সকলের হাতেই বর্শা কিংবা তীর-ধনুক। লেজারগানের কাছে ওগুলো কোন অস্ত্রই নয়। কিন্তু কুয়াশার মাথায় তখন অন্য চিন্তা।

নরকঙ্কাল উল্টো করে গাছের ডালে ঝুলিয়ে রেখেছে জুজুরা। তারমানে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত এরা। যুদ্ধে হয় এরা জিতবে, নয় হারবে। পিছপা হবার উপায় নেই, পালাবার কোন জায়গা নেই। যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালানো মানে রাজার হাতে খুন হওয়া।

হয় এরা কুয়াশাকে মারবে, নয়ত কুয়াশার হাতে খুন হবে। কুয়াশা ভাবছে অন্য কথা। এতগুলো নিরীহ অসভ্যকে হত্যা করতে চাইছে না সে। কে এদেরকে পাঠিয়েছে জানা নেই। যে পাঠিয়েছে তার উদ্দেশ্যও অজানা। রাজা যদি পাঠিয়ে থাকে—কিন্তু জুজুদের রাজা তার আগমনের কথা টের পাবে কিভাবে? রাজাকে কি কেউ আগেভাগেই জানিয়েছে তার কথা? কে জানাতে পারে? রহস্যপুরীর উদ্দেশে কঙ্গোর এই বনভূমির উপর দিয়ে স্পেসক্রাফট নিয়ে যে সে উড়ে যাবে একথা একমাত্র প্রফেসর ওয়াইয়ের পক্ষেই অনুমান করা সম্ভব। সেই কি জুজুদের রাজার সাথে বন্ধুত্ব পাতিয়ে প্ররোচিত করেছে জংলীরাজকে এই নির্দেশ দিতে?

প্রফেসর ওয়াই এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে আছে। এটা অনুমান করে নেয়া যায়। কিন্তু অবাধ্য প্রফেসরের ষড়যন্ত্রের শিকার সে হবে না। জুজু উপজাতির অসভ্যরা তাকে ঘিরে ফেলেছে ঠিক, কিন্তু যে-কোন মুহূর্তে সে পারে এই শ'দুয়েক জংলীকে লেজারগানের সাহায্যে বাতাসের সাথে মিশিয়ে দিতে। ওদের রক্ত-মাংস, হাড়-

মজ্জা বাষ্প হয়ে এক নিমিষে উড়ে যাবে আকাশের দিকে। দুই বা আড়াইশো, সংখ্যায় ওরা যতই হোক, একজনেরও চিহ্ন থাকবে না এই বনভূমিতে।

কিন্তু সেটা কি উচিত কাজ হবে?

এরা অসভ্য জংলী হলেও মানুষ তো। প্রফেসর ওয়াইয়ের অসৎ পরামর্শে প্রভাবিত হয়ে জংলী রাজা তাকে বন্দী বা হত্যা করতে ওদেরকে পাঠিয়েছে। ওরা নির্দোষ। হুকুমের দাস মাত্র। ওদের প্রাণ কেড়ে নেয়া মানবিক কাজ হতে পারে না।

কিন্তু তাছাড়া উপায়ই বা কি? দ্রুত চিন্তা করছিল কুয়াশা। জংলীরা নৃত্যে মেতে উঠেছে। ঘিরে ফেলেছে তারা শত্রুকে। তার আর পালাবার কোন উপায় নেই। তাড়া কিসের, একটু নেচেগেয়ে আনন্দ করে নেয়া যাক না!

লেজারগানটা তুলল কুয়াশা। কিছু গাছপালা ধ্বংস করে দিয়ে দেখা যাক। চোখের সামনে থেকে আকাশে মাথা ঠেকিয়ে দণ্ডায়মান মহীরূহগুলো এক নিমেষে নেই হয়ে গেলে জংলীরা ভয় পাবে নিশ্চয়ই। ভয় পেয়ে পালাতেও পারে।

লেজারগানের বোতামে চাপ দিতে গিয়ে জীবনের সবচেয়ে বড় সমস্যার মুখোমুখি হলো কুয়াশা। ভোজবাজির মত কাণ্ড ঘটে গেল একটা। হাতের লেজারগান ধরে কেউ যেন হেঁচকা টান মারল। সর্বশক্তি দিয়ে ধরে রাখার চেষ্টা করতে গিয়েও পারল না কুয়াশা। ছুটে গেল হাত থেকে। তীরবেগে ঝোপের ভিতর থেকে ছুটে গেল সেটা।

অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল কুয়াশা ঝোপের ভিতর থেকে বাইরের দিকে। লেজারগানটা কোন্ দিকে গেল বুঝতে পারল না সে।

প্রফেসর ওয়াই! জংলীদের সাথে সে-ও তাহলে উপস্থিত এখানে? প্রমাদ গুণল কুয়াশা। পকেটে হাত ভরল সে। কিন্তু পরক্ষণে স্থির হয়ে গেল সেই হাত। খালি হাতটা পকেট থেকে বের করে আনল সে। প্রফেসর ওয়াইয়ের কাছে অদ্ভুত একটা চুম্বক দণ্ড আছে। রিসার্চ করে ওয়াকিং স্টিকের মত একটা যন্ত্র আবিষ্কার করেছে সে। ভীষণ শক্তিশালী ম্যাগনেটিক পাওয়ার সেই যন্ত্রের। লোহা বা ইস্পাত জাতীয় যে-কোন জিনিসকে পাঁচশ গজ দূর থেকে আকর্ষণ করার শক্তি আছে এই ম্যাগনেটিক স্টিকের। পকেট থেকে অস্ত্র বের করার আর কোন মানে হয় না। সবই হাত থেকে ছুটে চলে যাবে ম্যাগনেটিক স্টিকের কাছে।

কিন্তু কোথায় প্রফেসর ওয়াই? দেখা যাচ্ছে না কেন তাকে? লুকিয়ে আছে?

না, অসম্ভব! লুকিয়ে থাকার মত ভীতু তো সে নয়। আর আত্মরক্ষার জন্য লুকিয়ে থাকলেও, মুখ বুজে থাকার স্বভাব তার নয়। এতক্ষণে অট্টহাসিতে কাঁপিয়ে তোলার কথা তার চারদিক। নিদেন পক্ষে, নাতিদীর্ঘ একটা বক্তৃতা তো দান করতই।

তবে কি প্রফেসর স্বয়ং উপস্থিত নেই। ম্যাগনেটিক স্টিক জংলীদের হাতে তুলে দিয়েছে বুদ্ধি করে?

করার কিছু নেই। অসভ্যদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ব্যবহার করা সম্ভব নয়, তা চায়ও না সে। পরবর্তী কর্তব্য স্থির করে ফেলল কুয়াশা। ধরা দেবে সে। বন্দী হবে জংলীদের হাতে। জংলীরা যদি তাকে হত্যা করতে চায় শুধুমাত্র তখনই আত্মরক্ষার জন্য চেষ্টা

করবে সে। বন্দী হলে লাভ বই লোকসান নেই। যে-কোন শক্তিশালী শত্রুর হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করার মত বুদ্ধি ও সাহস তার আছে। বন্দী হলে প্রফেসর ওয়াইয়ের কাছে নিশ্চয়ই নিয়ে যাওয়া হবে তাকে। তাই সে চায়। প্রফেসরের মুখোমুখি হলে তার পরবর্তী কর্মসূচী সম্পর্কে কিছু না কিছু জানা যাবে। জানা যাবে তাঁর পরিচিত কোন্ ব্যক্তিকে সে ধরে নিয়ে এসেছে এই গভীর বনভূমিতে।

জংলীরা ঘিরে ফেলেছে ঝোপটা। প্রকাণ্ডদেহী, কুৎসিত দর্শন অসভ্যরা মশালের লালচে আলোয় অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাত-পা নেড়ে অবিরাম নাচছে।

একটা গাছের উপর নজর পড়ল কুয়াশার। একটা জংলী বসে আছে ডালের উপর। তার হাতে তীর নেই, ধনুক নেই। তীর-ধনুক-বর্শার বদলে তার হাতে দেখা যাচ্ছে একটা লম্বা ছড়ি।

ম্যাগনেটিক স্টিক।

ঝোপের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল কুয়াশা। জংলীরা একযোগে উল্লাসধ্বনিতে ফেটে পড়ল। তীব্র বেগে ছুটে এল কয়েকটা তীর। কুয়াশার মাথার উপর দিয়ে বাতাসে শিস কেটে উড়ে গেল সেগুলো। পঞ্চাশ-ষাটজন অসভ্য বর্শা উঁচিয়ে ঘিরে ফেলল তাকে।

হাসছে কুয়াশা। চেয়ে আছে সামনের গাছের উঁচু ডালের দিকে। হঠাৎ ভারি কণ্ঠে কথা বলে উঠল সে, 'কোচেন!'

গাছের ডাল থেকে গরিলা সদৃশ্য জংলীটা গর্জে উঠল, 'কোচেন?'

কুয়াশা হাসছে। বলে উঠল সে আবার, 'কোচেন, হিরি কিরি নাচা! নাচা, হিরি কিরি। পানচা, তিরি—রুকু সুকু হালাকু। লোচে ভে! লোচে ভে? হিরি কিরি—আশা, হিরি কিরি কুয়াশা। কোচেন!'

'নাচা! নাচা! নাচা! আশা! কুয়াশা!'

বাদুড়ের মত গাছের ডাল থেকে শূন্যে লাফ দিল জংলীদের সর্দার। ঝুপ করে শুকনো পাতার উপর পড়ল সে। ছুটল সাথে সাথে। জংলীরা সবাই নিশ্চুপ। চোখে মুখে বিস্ময় এবং উদ্বেগ। সর্দারকে পথ ছেড়ে দিল তারা। ছুটে এসে কুয়াশার বুকের উপর পড়ল কোচেন। কুয়াশার বিশাল বুকে মুখ ঘষতে ঘষতে ছেলে মানুষের মত ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে সে। তার হাতে ম্যাগনেটিক স্টিক এবং লেসারগানটা কুয়াশার পায়ের কাছে পড়ে গেল।

কোচেনের গলা দিয়ে একটা মাত্র শব্দ বেরুচ্ছে, 'নাচা! নাচা···নাচা···নাচা!'

অর্থাৎ—বন্ধু। 'আশা—অর্থাৎ কুয়াশা। কোচেন—জংলী সর্দারের নাম। কুয়াশা আজ বছর দশেক আগে এই বনভূমিতে একদল শ্বেতাঙ্গ শিকারীর হাত থেকে প্রাণে বাঁচিয়েছিল কোচেনকে। কুয়াশার প্রতি সেই থেকে কৃতজ্ঞ সে। আজ দশ বছর পর রাজার নির্দেশে যাকে বন্দী করতে এসেছে সে তিনি যে স্বয়ং তার রক্ষাকর্তা তা সে জানত না।

হাসছে কুয়াশা। কোচেনের ঘামে ভেজা পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

'হয়েছে, কোচেন, হয়েছে। কাঁদবার কি হলো? তুমি কি জানতে নাকি যে আমি এই পথে আসছি? মুখ তোলো, কোচেন। তোমার কাছ থেকে অনেক কথা জানবার

আছে আমার। হোচেন কেমন আছে। তোমার ছেলে? তোমার বউ, আজি? রাজা অমেনটোট?'

মুখ তুলল কোচেন। প্রকাণ্ড মুখ। কানের সর্বত্র ফুটো, ফুটোয় স্বর্ণের রিঙ ঝুলছে। কপালে চামড়ার পট্টি বাঁধা, মাথায় ধবধবে সাদা পাখির পালক গোঁজা। সারা শরীর এবং মুখে লাল-সাদা রঙ মাখানো।

'সবাই মরে গেছে। রাজা দীর্ঘজীবী হোন,' কোচেন নিজের ভাষায় কথা বলল।

'সে কি! কিভাবে?'

'আজি গেছে রাজার মেয়ের সাথে লড়তে গিয়ে। হোচেন গেছে সিংহের পেটে। এসব কথা থাক, 'আশা। তোমার কথা বলো। তুমি কোত্থেকে এলে? কোথায় যাচ্ছ? তোমার বিরুদ্ধে আমাদের রাজা কেন এত খেপে গেছে? রাজার হাত থেকে বেঁচে ফিরবে কিভাবে তুমি?'

কুয়াশা বলল, 'কিছুই তো আমি জানি না। তোমাদের রাজা আমার কথা জানল কিভাবে?'

কোচেন যা বলল তার সংক্ষিপ্ত মর্ম এই রকম—গত দু'দিন থেকে ওদের রাজা অমেনটোট অলৌকিক ক্ষমতা অর্জন করেছেন। অবিশ্বাস্য সব যাদু দেখাচ্ছেন তিনি। যাদুকররাও তাজ্জব হয়ে গেছে রাজার অদ্ভুত ক্ষমতা দেখে। কোত্থেকে কে জানে, নানারকম অস্ত্র পেয়েছেন তিনি। এক একটা অস্ত্রের এক এক রকম যাদু। কোন অস্ত্র একশো গজের দূরের মানুষ, গাছ, পশু বা যে-কোন জিনিসের গায়ে আগুন ধরিয়ে দিতে পারে। যে-কোন জিনিসকে চোখের পলকে গায়েব করে দেবার মত ক্ষমতাসম্পন্ন অস্ত্রও আছে তাঁর কাছে। এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে রাজা অমেনটোট তাদেরকে জানিয়েছে, রহস্যপুরীর দেবতারা তাঁকে দেখা দিয়েছিল। সেই দেবতারাই দিয়ে গেছে এইসব ভয়ঙ্কর অস্ত্র। দেবতারা রাজাকে বলে গেছেন জঙ্গলের উত্তর দিকের হেলা পর্বতের গুহায় একজন লোককে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পাওয়া যাবে। তাকে ধরে এনে বলি দিতে হবে রহস্যপুরীতে নিয়ে গিয়ে। এরপর দেখা যাবে নদীর তীরে একদল সভ্য মানুষকে। তারাও ঐ লোকটার মত রহস্যপুরীর পবিত্রতা নষ্ট করে স্বর্ণ এবং দামী দামী পাথর চুরি করার জন্য এই জঙ্গলে এসেছে। তাদেরকেও বন্দী করতে হবে। বলি দিতে হবে রহস্যপুরীর ভিতর, দেবতা রোটেনহেপো হেমনোমান ক্যানক্যান-এর পদমূলে।

সবশেষে আসবে আর একজন লোক। তার কাছে থাকবে ভয়ঙ্কর সব মারণাস্ত্র। যেমন সে বুদ্ধিমান, তেমনি তার বীরোচিত সাহস। রাজা আসলে কুয়াশার কথাই বলতে চেয়েছে। সেই লোকও নাকি রহস্যপুরীর পবিত্রতা নষ্ট করতে চায়। তাকে রাজা স্বয়ং হত্যা করবেন গ্রামের ভিতর। দেবতাদের নির্দেশ নাকি সেই রকমই।

কুয়াশার প্রশ্নের উত্তরে কোচেন জানাল, 'না, 'আশা গত দু'দিনের মধ্যে কেন, গত একহপ্তার মধ্যেও কোন সভ্য বা অসভ্য লোক আমাদের গ্রামে আসেনি। তবে, হ্যাঁ, রাজা শিকারে বেরিয়েছিলেন বটে তিনদিন আগে। পথ হারিয়ে ফেলেন রাজা অমেনটোট এবং তাঁর দশজন দেহরক্ষী। পরদিন অবশ্য গ্রামে ফেরেন তাঁরা। গ্রামে

ফেরার পর থেকেই যাদু দেখাতে শুরু করেন রাজা।'

কুয়াশা গম্ভীর, চিন্তিত।

'কি ভাবছ, 'আশা?'

কুয়াশা বলল, 'কোচেন, কথাটা বললে তুমি হয়তো বিশ্বাস করবে না। তবু বলছি। আমার অনুমান এটা। অনুমান কখনও মিথ্যে হয় না আমার।'

'তুমি মন খুলে কথা বলো, 'আশা।' কোচেন অধীর হয়ে উঠল।

'কোচেন, আমার ধারণা রাজা অমেনটোট বিপদে পড়েছেন।'

'তারমানে!'

কুয়াশা বলল, 'তোমরা এখন যাকে রাজা বলে মনে করছ সে হয়তো তোমাদের রাজা নয়। আমার ধারণা এই লোক প্রফেসর ওয়াই। তাকে তুমি চিনবে না। আমাদের দেশের একজন বিজ্ঞানী সে, ধরে নাও। কিন্তু মাথায় গোলমাল আছে। ভয়ানক লোক। তার উদ্দেশ্য খারাপ হয়তো নয়, কিন্তু সে যা-ই করে মানুষের তাতে মন্দ বই ভাল হয় না। এই প্রফেসর ওয়াই আমার প্রাণের শত্রু। আমাকে হত্যা করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে সে। আমার বিশ্বাস, তোমাদের রাজাকে সে বন্দী করে আটকে রেখেছে কোথাও। রাজার ছদ্মবেশ নিয়ে সে তোমাদের কাছে এসেছে। তোমরা তার বা তার অনুচরদের ছদ্মবেশ ধরতে পারনি।'

বোবা হয়ে গেল কোচেন। এসব কি শুনছে সে। দলের সকলের উদ্দেশে কোচেন কুয়াশার সন্দেহের কথা বলল। জংলীরা প্রতিহিংসায় খেপে উঠল। কুয়াশার সন্দেহ সত্য বলেই মনে করে তারা।

কোচেনকে ভারি উৎকণ্ঠিত দেখাল। বলল, 'রাজা যদি বেঁচে থাকে এই জঙ্গলের কোথাও তাহলে তাঁকে আমরা ঠিকই খুঁজে বের করব। এই নকল রাজাকে খুন করে খেয়ে ফেলতে খুব একটা সমস্যা হবে না। কিন্তু সন্দেহের উপর নির্ভর করে তো কিছুই করা উচিত নয়, 'আশা।'

কুয়াশা বলল, 'তা ঠিক। তাছাড়া, এই নকল রাজার বিরুদ্ধে লড়ে সহজে জয়ী হতে পারবে না তোমরা। ওর ক্ষমতা যেমন ভয়ঙ্কর, হৃদয় তেমনি দয়ামায়াহীন পাষাণের মতো। দরকার হলে শয়তানটা তোমাদের গ্রাম জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিয়ে পালিয়ে যাবে, তোমাদের সবাইকে খুন করে রেখে চলে যাবে। সে ক্ষমতা ওর আছে।'

কোচেন বলল, 'সেটা আমাদের সমস্যা। কিভাবে এর সমাধান করা যায় পরে ভেবে দেখব। সবচেয়ে আগে চাই প্রমাণ। প্রমাণ পেতে হলে খুঁজে বের করতে হবে আমাদের আসল রাজাকে। 'আশা, আমি তোমার কথা ভাবছি।'

কুয়াশা হাসল। বলল, 'দূর পাগল! নিজেকে কিভাবে রক্ষা করতে হয় আমি জানি।'

'জানি তা। কিন্তু, 'আশা, গ্রামের দিকে যাওয়া চলবে না তোমার।'

'কেন?'

'রাজার নির্দেশে তোমাকে বন্দী করার জন্য আমাদের এই দলটাই শুধু আসেনি। আরও দল ওত পেতে আছে জঙ্গলের ভিতর। ওরা আছে জানি, কিন্তু ঠিক কোথায় আছে, কিরকম ফাঁদ পেতে রেখেছে তা জানি না। রাজা একদলের কাজ আর একদলকে জানতে দেয়নি।'

'কিন্তু কোচেন, একটা কথা ভেবে দেখো। আমারই একজন লোককে বন্দী করে রেখেছে নকল রাজা তোমাদের গ্রামে।'

কোচেন বলল, 'হ্যাঁ। ঘণ্টাখানেক আগে এই পথ দিয়েই একজন সভ্য মানুষকে আমাদের লোকেরা হেলা পর্বতের গুহা থেকে বন্দী করে নিয়ে গেছে গ্রামের দিকে।'

ব্যস্ত হয়ে জানতে চাইল কুয়াশা, 'লোকটার বর্ণনা দিতে পার?'

কোচেন বর্ণনা দিল। ভুরু কুঁচকে উঠল কুয়াশার। সে সন্দেহ করেছিল লোকটা রাসেল হবে। প্রফেসর ওয়াই হয়তো ঢাকা থেকে বন্দী করে নিয়ে এসেছে তাকে ফাঁদ পাতার জন্য। কিন্তু কোচেনের বর্ণনা শুনে মনে হচ্ছে রাসেল নয়, অন্য কেউ।

কুয়াশা বলল, 'ঠিক চিনতে পারছি না। তবে সে যে আমারই পরিচিত কেউ তাতে সন্দেহ নেই। কোচেন, তুমি কি বলতে চাও আমি আমার একজন বন্ধু বিপদে আছে জেনেও প্রফেসর ওয়াইয়ের ভয়ে পালিয়ে যাব?'

'নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্য তোমাকে তাই করতে হবে।'

কুয়াশা হেসে উঠল। বলল, 'আমাকে তুমি এখনও চিনতে পারোনি কোচেন। ফিরে আমি যাই না কখনও কাজ শেষ না করে। বন্ধুকে উদ্ধার করাই এখন আমার একমাত্র কর্তব্য। মিছে বাধা দিয়ো না আমাকে।'

অস্বাভাবিক গম্ভীর হয়ে উঠল কোচেন। কি যেন চিন্তা করছে সে।

'কি ভাবছ?'

কোচেন বলল, 'বেশ। তোমার কথাই থাক। জানি, তোমাকে বললেও তুমি কথা শুনবে না। তবে, একটা অনুরোধ আছে। অনুরোধটা রাখতে হবে, 'আশা।'

'বলো।'

'তুমি এখানেই থাকবে অন্তত আধঘণ্টা। আমি দল নিয়ে ফিরে যাই। যাবার সময় গাছের গায়ে চিহ্ন রেখে যাব আমি। সেই চিহ্ন দেখে, আধঘণ্টা পর, তুমি এগোতে শুরু করবে। পথে কোথাও ফাঁদ থাকলে আমরা টের পাব। টের পেলে একটা না একটা ব্যবস্থা হবেই। যারা ফাঁদ পেতে আছে তাদেরকে হয় বোঝাব আসল ব্যাপার, কিংবা, তারা যদি বুঝতে না চায়, যুদ্ধ করব।'

'খবরদার, কোচেন। নিজেদের মধ্যে লড়াই করা মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ নয়। আমি তোমাকে নিষেধ করছি।'

'ঠিক আছে। লড়াই নয়। বোঝাব। যদি তারা না বোঝে?'

'না বুঝলে নাই বুঝল। তোমরা অপেক্ষা করবে। আধঘণ্টা পরই তো পৌঁছুব আমি। তখন দেখা যাবে কি করা যায়।'

'ঠিক। তবে সেই কথাই রইল। আমরা রওনা হই এখন। তুমি কিন্তু আধঘণ্টার আগে রওনা হবে না।'

কুয়াশা বলল, 'আচ্ছা। একটা কথা, কোচেন, ঘণ্টাখানেক আগে পিছন থেকে পশুদের চিৎকার ভেসে আসছিল…?'

'আমাদের ওই রাজারই কাণ্ড। প্রকাণ্ড একটা উড়োজাহাজ না কি যেন জঙ্গলের মধ্যে নেমেছে। তার ভিতর আছে সভ্য দুনিয়ার লোকজন। তাদেরকে পুড়িয়ে মারার জন্য রাজা একটা দল পাঠিয়েছিল। দলটা বিরাট একটা এলাকার চারদিকে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে।'

'সর্বনাশ! উড়োজাহাজ নয়, কোচেন! ওটা আমারই স্পেসক্রাফট। ওতে আছে আমারই বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়!'

কোচেন জানতে চাইল, 'তারা কি বুদ্ধিমান?'

কুয়াশা বলল, 'খুব বুদ্ধিমান।'

কোচেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল যেন, 'যাক, তাহলে কোন চিন্তা নেই। রাজা বলেছিল, তারা যদি বুদ্ধিমান হয় তাহলে আগুনের হাত থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারবে। তবে, রক্ষা পেলেও, তাদেরকে বিপদের মুখোমুখি হতে হবে আবার। শেষ পর্যন্ত তারা আমাদের লোকের হাতেই বন্দী হবে। বন্দী করে তাদেরকে নিয়ে আসা হবে গ্রামে। গ্রাম থেকে নিয়ে যাওয়া হবে রহস্যপুরীতে। সেখানে তাদেরকে বলি দেয়া হবে।'

দ্রুত চিন্তা করছিল কুয়াশা। আগুনের হাত থেকে কিভাবে বাঁচবে শহীদরা? স্পেসক্রাফট যদি ধ্বংস করে দিয়ে থাকে প্রফেসর ওয়াই?

ছটফট করতে লাগল মন। কিন্তু এখন ফিরে যাবারও তো কোন অর্থ হয় না। আগুনের কাজ, আগুন সেরে ফেলেছে এতক্ষণ। ওরা কি সবাই পুড়ে মরেছে?

মনে হয় না। শহীদ, কামাল, মি. সিম্পসন, রাজকুমারী, ডি.কস্টা—একটা না একটা উপায় বের করে নিজেদেরকে নিশ্চয়ই রক্ষা করেছে ওরা।

'কি ভাবছ, আশা?'

'কিছু না। কোচেন, আর দেরি নয়। তোমরা রওনা হও। সময় দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে। নকল রাজার কবল থেকে আমার পরিচিত লোকটাকে উদ্ধার করে ছুটতে হবে স্পেসক্রাফটের কাছে। খোঁজ নিতে হবে আর সব বন্ধু আর আত্মীয়দের।'

কোচেন জড়িয়ে ধরল দুই হাতে কুয়াশাকে। কুয়াশার দুই গালে সশব্দে চুমু খেয়ে ঘুরে দাঁড়াল সে। চোখ দুটো জলে ভরে গেছে তার।

জংলীর দল নিঃশব্দে ঘুরে দাঁড়াল। দ্রুত রওনা হলো তারা গ্রামের দিকে। গ্রাম এখান থেকে আরও আড়াই মাইল দূরে।

মশালের আলো গাছপালার আড়ালে হারিয়ে গেল। মুখোশটা বের করল কুয়াশা। সেটা লাগিয়ে নিল মুখে। লেজারগানটা তুলে নিল সে মাটি থেকে।

আধঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে তাকে। কিন্তু সময় যে এগোচ্ছে না মোটেই! এক মিনিটকে মনে হচ্ছে একটা যুগ।

অস্থির হয়ে উঠল কুয়াশা। বড় দেরি হয়ে যাচ্ছে কিন্তু!

চার

গভীর বনভূমির ভিতর দিয়ে প্রায় ছুটে চলেছে কুয়াশা। কোচেন এই পথ দিয়ে যাবার সময় গাছের গায়ে চিহ্ন রেখে গেছে। দিকভ্রান্ত হবার কোন আশঙ্কা নেই। দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে কুয়াশা।

আধঘণ্টা পর চিন্তিত দেখাল কুয়াশাকে। গাছের গায়ে আর চিহ্ন নেই। এদিক ওদিক অনেক খোঁজাখুঁজি করল সে। সর্বশেষ যে গাছটায় বর্শার ধারাল ফলা দিয়ে কোচেন চিহ্ন এঁকে রেখে গেছে সেটি দেখে একটু ডানদিক ঘেঁষে এগোবার কথা কুয়াশার। কোচেনের চিহ্ন সেই নির্দেশই দিচ্ছে। কিন্তু ডান দিকে কেন, বাঁ দিকে এবং সামনে এগিয়েও কাছাকাছি গাছগুলোতে কোন রকম চিহ্ন দেখতে পেল না সে।

সন্দেহ নেই বিপদে পড়েছে কোচেন এবং তার দল। কিন্তু সংখ্যায় ওরা অনেক, এমন কি বিপদে পড়ল যে···! বিপদ দেখলে এখানেই অপেক্ষা করার কথা ওদের। আড়াইশো লোককে কেউ বন্দী করে নিয়ে গেছে—ভাবা যায় না।

অন্ধকারের জন্য এতটুকু অসুবিধে হচ্ছে না কুয়াশার। মুখোশটা পরে নিয়েছে সে। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে সব। কই, কোথাও নেই কেউ।

বিস্মিত হলো কুয়াশা। কি করা উচিত চিন্তা করল কয়েক মুহূর্ত। হাতের লেজারগানটার দিকে তাকাল একবার। এটা বোধহয় ব্যবহার করার সময় ঘনিয়ে এসেছে।

পকেট থেকে ইণ্ডিকেটর যন্ত্রটা বের করল সে। দেখল, দূরত্ব কমেছে। যেই হোক জংলীদের গ্রামেই তার ঘনিষ্ঠ একজনকে ছদ্মবেশী প্রফেসর ওয়াই বন্দী করে রেখেছে। গ্রামটা এখান থেকে খুব বেশি দূরে নয় আর।

বড়জোর মাইল দেড়েক হবে। কিন্তু এই দেড় মাইল অতিক্রম করা সম্ভব তো? নাকি তার আগেই প্রফেসর ওয়াইয়ের ফাঁদে ধরা পড়ে যেতে হবে?

প্রফেসর ওয়াই জানে, সে এই পথে যাচ্ছে। ফাঁদ সে ভালভাবেই পেতেছে। কুয়াশার হয়েছে উভয় সংকট। জানে যে সামনে বিপদ, কিন্তু তবু পিছিয়ে যাবার উপায় নেই। বন্ধুকে চিনতে না পারলেও, বাঁচাতেই হবে তাকে প্রফেসরের কবল থেকে।

সতর্ক পায়ে এগোচ্ছে কুয়াশা। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখে নিচ্ছে চারটা দিক। মন বলছে সামনেই বিপদ।

আরও কিছুদূর যাবার পর থামল কুয়াশা। একটা জংলীর নিঃসাড় দেহ ওর পায়ের কাছে। দেহটার সামনে বসার আগে চারটা দিক ভাল করে দেখে নিল সে। ধীরে ধীরে বসল। গায়ে হাত দিল লোকটার। পাল্‌স দেখল।

খানিক আগে খুন হয়েছে জংলীটা। শরীর এখনও গরম। একটা মাত্র ক্ষতচিহ্ন দেখা যাচ্ছে। মাথার খুলি ফুটো করে বেরিয়ে গেছে ক্ষুদ্র আকারের একটা বুলেট।

আশ্চর্য লাগল কুয়াশার। গুলির শব্দ শোনেনি সে। তারমানে সাইলেন্সার লাগানো রিভলভার দিয়ে কেউ গুলি করেছে। প্রফেসর ওয়াই? সম্ভবত। কিংবা

ম্যাটাবর ম্যাটচেক মন্টোগোমারী। প্রফেসর ওয়াইয়ের ডান হাত।

জংলীর লাশটার পাশ থেকে উঠে দাঁড়াল কুয়াশা। আর সবাই কোথায়? এগোতে শুরু করল কুয়াশা। আস্তে আস্তে। চারটা দিক দেখতে দেখতে। ওই যে, লম্বা হয়ে শুয়ে রয়েছে জংলীরা। কিন্তু ওকি!

থমকে দাঁড়াল কুয়াশা। শয়তান! বিড় বিড় করে উচ্চারণ করল শব্দগুলো। শয়তান! বড্ড বেড়ে গেছ তুমি! নিরীহ জংলীগুলোকে তুমি ভ্যানিশিং রে ব্যবহার করে অমানুষিক যন্ত্রণা দিয়ে মেরে ফেলেছ! আচ্ছা, দেখাব তোমাকে এর পরিণতি!

আরও কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল কুয়াশা। লাশের পর লাশ। কারও কোমরের নিচ থেকে নেই। নেই মানে একেবারেই নেই। কেউ যেন নিপুণ ভাবে কেটে নিয়েছে। কারও নেই কোমর থেকে উপরের অংশটা।

বাতাসে কিসের গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে যেন এখনও। সিধে হয়ে দাঁড়াল কুয়াশা। গম্ভীর, থমথমে চেহারা। চিনতে পারল গন্ধটা। এদের যন্ত্রণাক্ত চিৎকার কেন শুনতে পায়নি সে প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল। বাতাসে একটা রাসায়নিক পদার্থ স্প্রে করে ছড়িয়ে দিয়েছিল প্রফেসর ওয়াই বা তার সহকারীরা।

ভয়ঙ্কর জিনিস। প্রফেসর তরল পদার্থটার নাম দিয়েছিল জেড স্কয়ার কম্পাউণ্ড। এই কৃত্রিম গ্যাস কারও ফুসফুসে প্রবেশ করা মাত্র তার শরীরের মাংসপেশী অবশ হয়ে যায়। জংলীদেরও তাই হয়েছিল। মাংসপেশী অবশ হয়ে যাবার জন্যই চিৎকার করার সুযোগ হয়নি কারও।

শিউরে উঠল কুয়াশা। কী মর্মান্তিক দৃশ্য। লোকটা একটা বর্ণ মার্ডারার। জন্ম থেকেই খুনী প্রফেসর ওয়াই।

অধিকাংশ লাশই চেনবার উপায় নেই। শরীরের মাঝখান থেকে হয় নিচের অংশ নয়ত উপরের অংশ গায়েব করে দিয়েছে ভ্যানিশিং রে। কোচেনের লাশটা চিনতে পারল কুয়াশা। নিচের অংশটা নেই। মুখ থুবড়ে পড়ে আছে ঘাসের উপর। হাতের বর্শাটা ছাড়েনি কোচেন। সেটা শক্ত হাতে এখনও ধরে রেখেছে।

দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ত্যাগ করে কোচেনের লাশের কাছ থেকে উঠে দাঁড়িয়ে পা বাড়াল কুয়াশা। সহ্যের মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে প্রফেসর! এর একটা সমাধান না করলেই নয়।

ধীরে ধীরে হাঁটছে কুয়াশা। চোখ কান খোলা তার। হঠাৎ হেসে উঠল প্রফেসর ওয়াই।

'হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!'

কেঁপে উঠল উন্মাদ প্রফেসরের অট্টহাসিতে নিস্তব্ধ রাতের গহীনতম অরণ্য। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।

লাফ দিয়ে সরে গেল কুয়াশা। একটা প্রকাণ্ড গাছের আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল সে। কাউকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। হাসির শব্দটা আসছে বাঁ দিক থেকে। তৈরি হলো কুয়াশা। এটাই হয়তো তার এবং প্রফেসর ওয়াইয়ের মধ্যেকার সর্বশেষ যুদ্ধ। দেখে শুনে মনে হচ্ছে প্রফেসর ওয়াই আজ তাকে হত্যা করার চরম সিদ্ধান্তই গ্রহণ

করেছে।

ঠিক আছে। দেখা যাক যুদ্ধের ফলাফল কি হয়।

'...হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ...!'

কপালে চিন্তার রেখা ফুটল কুয়াশার। প্রফেসর কি শেষ পর্যন্ত পাগল হয়ে গেল? এ কেমন হাসি? থামবে না নাকি তার এই বিকট অট্টহাসি?

সন্দেহটা আরও খানিক পর দৃঢ় হলো কুয়াশার মনে। হাসিটা প্রফেসরের কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সে কি বনভূমিতে সত্যি উপস্থিত? নাকি তার হাসি টেপ করে টেপ রেকর্ডারটা কেউ রেখে গেছে এই জঙ্গলে?

সম্ভবত তাই। কথা বলছে না প্রফেসর, শুধু হাসছে। জংলীদেরকে খুন করে কুয়াশাকে বোঝাবার চেষ্টা করছে, বিজয়ী হয়েছে সে। তাই এই অট্টহাসি।

গাছের আড়াল থেকে বেরুল কুয়াশা। অতি সতর্কতার সাথে পা ফেলছে সে। হাসির শব্দটা এখনও শোনা যাচ্ছে একইভাবে। বিরাম নেই, বিরতি নেই। আরও খানিকটা এগিয়ে থামল কুয়াশা। টেপ-রেকর্ডই। হাসিটা ভেসে আসছে গাছের ডালের সাথে বাঁধা একটা টেপ রেকর্ডার থেকে। গায়ে যেন আগুন ধরে গেল কুয়াশার। অসহ্য। দু'কানে হাত চাপা দিয়ে অট্টহাসির কবল থেকে রক্ষা পেতে চাইছে মন। লেজারগানটা উপর দিকে তুলল কুয়াশা। বোতামে চাপ দিতেই ডালের খানিকটা অংশ নিয়ে বাষ্প হয়ে গেল টেপ রেকর্ডারটা।

থামল সেই অট্টহাসি।

এগোল কুয়াশা। পরমুহূর্তে ধরাশায়ী হলো সে। পায়ের নিচের মাটিতে বিছানো ছিল নমনীয় প্লাস্টিকের জাল। জালের উপর শুকনো পাতার বিছানা। তাই ফাঁদটা দেখতে পায়নি সে।

মাটির উপর পড়লেও, হাতের লেসারগানটা ছাড়েনি কুয়াশা। জালের ভিতর আটকা পড়ে গেছে সে। হাত-পা ছুঁড়ে ছিঁড়তে চেষ্টা করছে কুয়াশা জালটা। পট্ পট্ করে শব্দ হচ্ছে। সাদা ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে চারপাশে। দমবন্ধ করে ফেলল কুয়াশা। কিন্তু ততক্ষণ যা হবার হয়ে গেছে। বিষাক্ত ধোঁয়া ফুসফুসে প্রবেশ করেছে খানিকটা। অবশ হয়ে আসছে কুয়াশার সর্বশরীর। লেজারগান ধরা হাতটা চাপা পড়েছে তার শরীরের নিচে। বের করার চেষ্টা করছে সে, কিন্তু নড়াতে পারছে না দেহটা।

মাত্র কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই অজ্ঞান হয়ে পড়ল কুয়াশা।

প্লাস্টিকের সুতোর সাথেই জালে ছিল কয়েকটা একই আকৃতির প্লাস্টিকের টিউব। টিউবগুলোর ভিতরে ছিল বিষাক্ত সাদা ধোঁয়ার মত গ্যাস। কুয়াশার হাত-পা ছোঁড়ার ফলে টিউবগুলো ছিঁড়ে গেছে।

কুয়াশা নড়াচড়া করছে না আর। চারদিক থেকে বেরিয়ে এল চল্লিশ পঞ্চাশ জন জুজু উপজাতির অসভ্য জংলী। জালে আবদ্ধ কুয়াশার অচেতন দেহটাকে ঘিরে দাঁড়াল তারা। পাঁচজন জংলী এল সবার শেষে। তাদের সাথে একটা খাটিয়া। খাটিয়ার উপর তোলা হলো কুয়াশার অচেতন দেহটাকে। দ্রুত অকুস্থল ত্যাগ করল

জংলীরা খাটিয়া কাঁধে তুলে নিয়ে।

পাঁচ

স্পেসক্রাফটের কন্ট্রোলরুম থেকে শহীদ এবং রাজকুমারী ওমেনা ছুটে বেরিয়ে এসে ঘোষণা করল, মহাশূন্যযান বিকল হয়ে গেছে। এরপর শহীদ যা বলল তা এক কথায় অবিশ্বাস্য। অবিশ্বাস্য হলেও ব্যাপারটা বাস্তব সত্য।

কেউ শত্রুতা করে নষ্ট করে দিয়েছে স্পেসক্রাফট। শহীদ এবং ওমেনার বক্তব্য, ওদের মধ্যেই কেউ কাজটা করেছে।

কে? শহীদ, কামাল, মহুয়া, ডি. কস্টা, মি. সিম্পসন, রাজকুমারী—এদের মধ্যে শত্রু কেউ নয়। অথচ এদের মধ্যে থেকেই কেউ কাজটা করেছে। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি।

সকলের মাথায় যেন বজ্রপাত হলো।

কিন্তু এ ব্যাপারে মাথা ঘামাবার সময় তখন নেই। বনভূমির চারদিকে জ্বলছে আগুন। আগুনের মাঝখানে অবস্থান করছে ওরা ছয়জন মানুষ। আত্মরক্ষার একমাত্র উপায় ছিল স্পেসক্রাফটটা। সেটাও বিকল। তাই বলে চুপচাপ হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকলে তো চলবে না। চেষ্টা করতে হবে।

এলুমিনিয়ামের সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল ওরা নিচে। দাবাগ্নি ক্রমশ এগিয়ে আসছে। গাছপালায় আগুন জ্বলছে দাউদাউ করে। চারদিকের আকাশ হয়ে উঠেছে লাল।

নিচে নেমে পরস্পরের দিকে বোবা দৃষ্টি মেলে তাকাতে লাগল সবাই। কারও মুখে কোন কথা নেই।

নীরবতা ভাঙল কামাল।

'শহীদ, ভাগ্যে যা আছে তা তো হবেই। সেজন্যে চিন্তা বা ভয় করি না। তুই বলছিস, আমাদের মধ্যে কেউ বিশ্বাসঘাতক আছে, সেই নষ্ট করে দিয়েছে স্পেসক্রাফট। অমি চাই, সে যেই হোক, এখুনি তার শাস্তির ব্যবস্থা করা হোক। নিজেদের মধ্যে একটা কেউটে সাপ আছে একথা জানার পর এই দাবাগ্নির কবল থেকে উদ্ধার পাবার চেষ্টা করার মত উৎসাহও হারিয়ে ফেলেছি আমি। কি লাভ! সেই বিশ্বাসঘাতক সুযোগ পেলে আবারও বেঈমানী করবে। আমরা মরি মরব, তাকে আগে খতম করে তারপর মরব।'

শহীদ বলল, 'কামাল, তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে। বিশ্বাসঘাতক একজন আছে সত্যি। কিন্তু তাকে তুই চিনবি কিভাবে? তাকে শাস্তি দেবার একটাই রাস্তা আছে এখন।'

'কি?'

শহীদ বলল, 'বিশ্বাসঘাতক আমরা যে-কেউ হতে পারি। এক কাজ কর, আগে আমাকে খুন করে ফেল। তারপর একে একে মহুয়া, মি. সিম্পসন, ডি. কস্টা, ওমেনা···।'

ডি. কস্টা চেঁচিয়ে উঠল, 'ফর গডস সেক! হামি কেন খুন হইটে যাইবো! হামি টো বিট্রে করি নাই, আপনাদের খোডার কসম বলিটেছি।'

'চুপ করো!'

ধমকে উঠল শহীদ। বলল, 'সবাইকে মেরে ফেল। তারপর আত্মহত্যা কর নিজে। তাহলেই বেঈমানের শাস্তি হয়েছে বলে ধরে নেয়া যাবে।'

মি. সিম্পসনকে অস্বাভাবিক গম্ভীর দেখাচ্ছে। বারবার তাকাচ্ছেন তিনি রাজকুমারী ওমেনার দিকে। মহুয়া এবং ডি. কস্টাও আড়চোখে দেখছে ওমেনাকে।

রাজকুমারীকে কেউই ভাল করে চেনে না। কুয়াশার সাথে অন্য এক গ্রহ থেকে সে পৃথিবীতে এসেছে মাত্র কয়েক দিন আগে।

শহীদ বলে উঠল, 'বেঈমানের শাস্তি পরে দেয়া যাবে, কামাল। এখন আত্মরক্ষার চেষ্টা করতে হবে।'

হঠাৎ একদল নেকড়ে জঙ্গলের আড়াল থেকে তীর বেগে ছুটে আসছে দেখা গেল। খিঁচে দৌড় দিল ডি. কস্টা। মহুয়া লাফ দিয়ে পড়ল শহীদের বুকের উপর।

ঝড়ের বেগে নেকড়ের দল ওদেরকে পাশ কাটিয়ে ডি. কস্টার দুপাশ দিয়ে ছুটে চলে গেল।

'ওরা নিজেদের জান বাঁচাতে ছুটোছুটি করছে। ভয় পেয়ো না।'

আসলেও তাই। অসভ্য জংলীরা ছুটছে দিক-বিদিক। কেউ পশ্চিমে যাচ্ছে, কেউ পুবে, কেউ বা উত্তরে, কেউ বা দক্ষিণে। পথ পাচ্ছে না কেউ আগুনের ঘের থেকে বেরোবার। আগুনের বেড় চারদিকে। ক্রমশ সেটা ছোট হয়ে আসছে।

বনের পশু আর জংলীদের আর্ত রবে কানের পর্দা ছিঁড়ে যাবার উপক্রম হলো। সবাই দিশেহারা। মৃত্যু প্রতি মুহূর্তে কাছাকাছি চলে আসছে।

এর নাম দাবাগ্নি। দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে আগুন। সোঁ সোঁ একটা শব্দ হচ্ছে চারদিক থেকে। আগুনের ডাক। জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিতে দিতে এগিয়ে আসছে চারদিক থেকে সোঁ সোঁ করে উত্তপ্ত নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে।

শহীদ চেঁচিয়ে উঠল, 'কামাল, তুই পুব দিকে যা। দেখ কোন পথ পাওয়া যায় কি না। আমি পশ্চিমে যাই। মি. সিম্পসন আর ডি. কস্টা এখানেই থাকুন। আমরা না ফেরা অবধি কোথাও যাবেন না। আগুনের বাইরে বেরুনো সম্ভব নয়, তবু চেষ্টা করে দেখা যাক। কামাল, দেরি করবি না।'

ছুটল কামাল পশ্চিম মুখো হয়ে।

শহীদও ছুটল। ওমেনা কি মনে করে পিছু নিল শহীদের। পায়ের শব্দ পেয়ে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল শহীদ। কি যেন জিজ্ঞেস করল ওমেনা। শহীদ গম্ভীর নিচু গলায় কিছু বলল তাকে।

ফিরে এল ওমেনা। অস্বস্তি বোধ করছে সে। মি. মিস্পসন, মহুয়া, ডি. কস্টা—এরা তাকে সন্দেহ করছে।

গাছপালার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেছে কামাল এবং শহীদ। ছটফট করছেন মি. সিম্পসন। ডি. কস্টা দুই হাতে মুখ ঢেকে ফোঁপাচ্ছে। কেঁপে কেঁপে উঠছে তার

শরীর। কাঁদছে।

মহুয়া যেন পাথর হয়ে গেছে। এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে সে জঙ্গলের দিকে।

ওদের চারধারে ছুটোছুটি করছে হিংস্র জানোয়ারগুলো। ওদের দিকে ভুলেও তাকাচ্ছে না কেউ। যার-যার জান বাঁচাতে অস্থির সবাই।

একদল উলঙ্গ জংলী হঠাৎ বেরিয়ে এল। ভয়ে কাঁপছে তারা। অসহায় ভঙ্গিতে ওদের সামনে এসে দাঁড়াল সবাই। তারপর শুয়ে পড়ল আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে। দুর্বোধ্য ভাষায় তারা কি সব বলতে লাগল।

মি. সিম্পসন চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আমাদের সাহায্য চেয়ে কোন লাভ নেই। আমরাই বাঁচার পথ দেখছি না। তোমাদের বাঁচাব কিভাবে? যাও, ভাগো।'

জংলীরা মি. সিম্পসনের ভাষা না বুঝলেও তাঁর অগ্নিমূর্তি দেখে বুঝতে পারল—কোন আশা নেই এদের কাছে থেকে সাহায্য পাবার।

পায়চারি করছেন মি. সিম্পসন।

হঠাৎ তড়াক করে উঠে দাঁড়াল ডি. কস্টা। ছুটল সে।

'কোথায় যাচ্ছেন!' মহুয়া সংবিৎ ফিরে পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল।

ডি. কস্টা মহুয়ার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে একটা উঁচু গাছের কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

মি. সিম্পসন ডাকলেন, 'করছেন কি ! আরে শুনুন!'

শুনল না ডি. কস্টা। গাছের উপর চড়ছে সে। বেশ খানিকটা উপরে উঠে ডি. কস্টা বলল, 'হাপনারাও ডেরি করিবেন না, ফর গডস সেক। একটা একটা করিয়া টল গাছ চয়েস করিয়া লিন, উঠিয়া পড়ুন সময় ঠাকিটে।'

মি. সিম্পসন ঠোঁট বাঁকা করে হাসলেন, 'পাগল।'

ওমেনা চেঁচিয়ে উঠল, 'নেমে পড়ুন, মি. ডি. কস্টা। গাছের উপর চড়লে কি বাঁচবেন? আগুন তো গাছেই ধরবে।'

'ঢরিবে, ঠিক। বাট অনেক উঁচুটে ফায়ার নাও পৌঁছাইটে পারে। মিরাকেলি বাঁচিয়াও যাইটে পারি। চান্সটা হাপনারাও নিটে পারেন, যডি বাঁচিটে চান।'

'বড় দেরি করছে ওরা।'

মি. সিম্পসন বলে উঠলেন, 'এভাবে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকার কোন মানে হয় না। আমি বরং উত্তর দিকটা একবার দেখে আসি।'

কেউ আপত্তি প্রকাশ করল না। বিপদ তো একটাই, আগুন। তাছাড়া আর কোন বিপদ এখন নেই। সুতরাং মি. সিম্পসন না থাকলেও ভয়ের কিছু নেই।

দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেলেন মি. সিম্পসন।

মহুয়া চেয়ে আছে যে-পথে শহীদ অদৃশ্য হয়ে গেছে বেশ খানিক আগে সেদিকে। হঠাৎ পাশে তাকিয়ে ছাঁৎ করে উঠল বুক।

রাজকুমারী ওমেনা নেই। গেল কোথায় সে!

আরও প্রায় সাত মিনিট পর ফিরে এল কামাল। শুকনো মুখ। মহুয়ার পাশে নিঃশব্দে, নত মস্তকে এসে দাঁড়াল সে। হাঁপাচ্ছে হাপরের মত।

'কামাল!' মহুয়া অসহায় কণ্ঠে ডেকে উঠল।

মুখ তুলল না কামাল। কথা বলল না।

'মি. সিম্পসন কই?'

শহীদের গলা শুনে ওরা দুজনেই ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল।

'উত্তর দিকটা দেখতে গেছেন তিনি যদি কোন পথ পাওয়া যায় দেখার জন্য।'

'ওমেনা?'

মহুয়া বলল, 'কি জানি। হঠাৎ দেখি যে পাশে নেই। শহীদ, আমার সন্দেহ…।'

'সন্দেহের কথা থাক। কামাল?'

কামাল মৃদু কণ্ঠে বলল, 'আগুনের বেড় থেকে বেরোবার কোন পথ নেই, শহীদ। খামকা আমরা চেষ্টা করছি।'

কথা বলল না শহীদ। হঠাৎ ছুটল ও উত্তর দিকে।

'কোথায় যাচ্ছিস?'

থমকে দাঁড়াল শহীদ। ঘুরে দাঁড়াল। বলল, 'আমার অনুমান কখনও মিথ্যে হয় না, কামাল আমার বিশ্বাস, একটা না একটা পথ আমরা পাবই। পথ আছে। কামাল, ডি. কস্টা কোথায়?'

মহুয়া উত্তর দিল উঁচু একটা গাছের দিকে আঙুল তুলে।

'ওখানে কি করছেন আপনি!'

ডি. কস্টা চেঁচিয়ে উত্তর দিল গাছটার মগ ডাল থেকে, 'আমি বাঁচিটে চাই। টাই…।'

'নেমে আসুন বলছি!' ধমকে উঠল শহীদ। তাকাল কামালের দিকে, 'ওকে যেভাবে পারিস নামিয়ে আন। তোরা তিনজন মিলে স্পেসক্রাফট থেকে একে একে অতি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রগুলো নিচে নামা। আমি আসছি খানিকক্ষণের মধ্যে। হয়তো দেরি করে ফেললাম।'

কথাগুলো বলেই ছুটল শহীদ। অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

ধোঁয়া আর আগুনের আভায় টকটকে লাল হয়ে উঠেছে আকাশ।

ছুটতে ছুটতে থমকে দাঁড়াল শহীদ। কোথায় যাচ্ছে সে? কোন্ দিক গেছেন মি. সিম্পসন, কোন্ দিক গেছে ওমেনা জানা নেই, খামকা ছুটে লাভ কি?

কপালের ঘাম মুছল শহীদ। বুকটা উঠছে নামছে ঘনঘন। পাগলের মত তাকাল সে চারদিকে। ওটা কি? এগিয়ে গেল শহীদ। টর্চের আলোয় চকচক করছে লাল স্কার্ফটা। ওমেনার মাথায় ছিল এটা।

আবার ছুটল শহীদ। এদিকেই এসেছে ওমেনা। হয়তো আরও খানিকটা সামনে গেলে তাকে পাওয়া যাবে।

'শহীদ ভাই!'

চাপা কণ্ঠের ডাক শুনে থমকে দাঁড়াল শহীদ। বাঁ দিকের প্রকাণ্ড একটা গাছের কাছে দাঁড়িয়ে আছে রাজকুমারী ওমেনা।

'এখানে কি করছ তুমি?' হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞেস করল শহীদ। আকাশের চেহারাটা দ্রুত দেখে নিল ও।

'শহীদ ভাই, আপনার পায়ের জুতো কোথায়? দুটো পা-ই যে কেটে গেছে। ইস রক্তে ভেসে যাচ্ছে যে।'

ধমকে উঠল শহীদ, 'যা জিজ্ঞেস করছি তার উত্তর দাও। কি করছিলে তুমি এখানে? মি. সিম্পসন কোথায়?'

'মি. সিম্পসনের পিছু পিছু তো এসেছি আমি। দূর থেকে দেখলাম তিনি এই খানটায় রয়েছেন। কিন্তু এখানে এসে দেখি নেই। কোথায়, কোন দিকে গেলেন বুঝতেই পারলাম না।'

শহীদ বলল, 'হুঁ।'

শহীদ চিৎকার করে ডাকল, 'মি. সিম্পসন! মি. সিম্পসন!'

কোন সাড়া নেই মি. সিম্পসনের।

'তুমি ঠিক দেখেছ মি. সিম্পসনকে এখানে!'

'পরিষ্কার দেখেছি। এই মোটা গাছটার গায়ে গা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি। একটা সাপ দেখে ভয়ে লুকিয়ে পড়েছিলাম আমি। ইয়া বড় একটা অজগর, ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে একেবারে আমার পায়ের কাছে চলে এসেছিল। ভয়ে লাফ দিয়ে সরে যাই। মিনিট দুয়েক পর, সাপটা অদৃশ্য হয়ে যেতে, এগিয়ে আসি আমি। কিন্তু তখন আর মি. সিম্পসনকে দেখতে পাইনি···।'

প্রকাণ্ড গাছটার আপাদমস্তকে চোখ বুলিয়ে নিল শহীদ। এই রকম অশথ গাছ বড় একটা দেখা যায় না। শত বছরের বেশি হবে এর বয়স। কাণ্ডটা অস্বাভাবিক মোটা। পাঁচজন লোক হাতে হাত ধরে দুই হাত দুদিকে প্রসারিত করে গাছটাকে জড়িয়ে ধরলেও বেড় পাবে না।

ওমেনা হাঁ করে শহীদের কাণ্ড দেখছে। শহীদ গাছটার গায়ে রিভলভারের উল্টো পিঠ দিয়ে টোকা মারছে ঘুরে ঘুরে।

'ও কি করছেন?'

উত্তর দিল না শহীদ। খানিক পর নিরাশ হয়ে ওমেনার পাশে এসে দাঁড়াল ও। তাকিয়ে আছে সেই গাছের দিকেই।

একমুহূর্ত পর আবার পা বাড়াল শহীদ। চুপ করেই রইল ওমেনা। লালচে আলোয় বনভূমি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। দ্রুত এগিয়ে আসছে দাবাগ্নি।

'আমাকে সাহায্য করতে হবে,' শহীদ বলল।

এগিয়ে গেল ওমেনা, 'বলুন।'

'তোমার গায়ে তো খুব জোর। দুটো হাত গাছের গায়ে ঠেকিয়ে রাখো। আমি তোমার হাতের ওপর উঠে দাঁড়িয়ে লাফ দিয়ে একটা ডাল ধরে ঝুলে পড়ব। পারবে তো আমার ভার সহ্য করতে!'

'খুব পারব। কিন্তু···।'

'যা বলছি করো।'

উঠে দাঁড়াল শহীদ ওমেনার দুই হাতের উপর। তারপর লাফ দিয়ে ধরল গাছের একটা ডাল। ঝুলতে ঝুলতে, শরীরটাকে দোলাতে শুরু করল শহীদ। তারপর কায়দা করে পা দুটো তুলে দিল ডালের উপর।

উঠে দাঁড়াল শহীদ ডালের উপর। আগুনের লাল আলোয় চারদিক উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

ওমেনা নিচে থেকে অবাক হয়ে দেখছে শহীদের কাণ্ড কারখানা।

গাছটা যেমন মোটা তেমনি মোটা তার ডালপালাগুলো। দুটো প্রধান শাখা দুদিকে বেঁকে গেছে মূল কাণ্ড থেকে বেরিয়ে। দুই শাখার ভিত্তিমূলে প্রশস্ত একটা জায়গা। শহীদ সেই প্রশস্ত জায়গাটার কাছে এসে দাঁড়াল। একটা শাখার গায়ে হেলান দিয়ে হাঁপাতে লাগল ও। তারপর বসে পড়ল প্রশস্ত জায়গাটার উপর। বড় সুন্দর জায়গা। ইচ্ছা করলে একজন মানুষ স্বচ্ছন্দে শুয়ে বিশ্রাম নিতে বা রাত কাটাতে পারে এখানে।

উবু হয়ে বসে শহীদ প্রশস্ত জায়গাটায় রিভলভারের বাট দিয়ে টোকা মারল। ঢব ঢব—শব্দ শুনে বোঝা গেল ভিতরটা যেন ফাঁপা।

উজ্জ্বল হয়ে উঠল শহীদের মুখ।

'কি করছেন আপনি? এদিকে আগুন যে একেবারে কাছে চলে এসেছে চারদিক থেকে।'

চেঁচিয়ে উঠল নিচে থেকে ওমেনা। সাঁ সাঁ শব্দে এখন আর কান পাতা যাচ্ছে না।

জবাব দিল না শহীদ।

শহীদ গাছটার দুই প্রধান শাখার মধ্যবর্তী প্রশস্ত জায়গাটা গভীর মনোযোগের সাথে পরীক্ষা করছে। কিন্তু আশার কোন আলো ফুটছে না তার মুখে। বোঝা যাচ্ছে জায়গাটা ফাঁকা। বোঝা যাচ্ছে গাছের গা তুলে এখানে অন্য কাঠের গোপন দরজার কবাট ফিট করা হয়েছে। কিন্তু কবাট বা পাটাতন সরাবার ব্যবস্থাটা কি জানা যাচ্ছে না। হঠাৎ চাপা কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল ও, 'ইউরেকা!'

'কি হলো? কি পেলেন?'

জবাব দিল না শহীদ। প্রশস্ত জায়গাটায় নয়, একটি প্রধান শাখার গায়ে পাওয়া গেল একটা ইলেকট্রিক সুইচ। সুইচ অর্থাৎ বোতামটার রঙ গাছের রঙের সাথে মিলে গেছে। প্রশস্ত জায়গাটা থেকে একটা সরু ডালে গিয়ে দাঁড়াল শহীদ। তারপর হাত বাড়িয়ে আঙুল দিয়ে চেপে ধরল বোতামটা। মধ্যবর্তী স্থানটা থেকে সরে গেল কাঠের পাটাতন। ঝুলে পড়ল সেটা সশব্দে নিচের দিকে।

ভিতরটা অন্ধকার। টর্চের আলো ফেলতেই একটা লোহার সিঁড়ি দেখা গেল। নেমে গেছে নিচের দিকে।

নেমে পড়ল শহীদ গাছের উপর থেকে।

'এসো,' হাঁটতে লাগল শহীদ হনহন করে।

'কি দেখলেন! ইউরেকা বলে চেঁচিয়ে উঠলেন কেন তখন?'

'মি. সিম্পসন বাঁচিয়েছেন আমাদেরকে। ওই গাছটার উপরে গোপন একটা দরজা আছে। গাছের ভিতর দিয়ে সিঁড়ি নেমে গেছে একটা। সম্ভবত মাটির নিচে দিয়ে একটা সুড়ঙ্গ চলে গেছে।'

'কিন্তু মি. সিম্পসন···!'

মুচকি হাসল শহীদ। বলল, 'হয়তো গোপন সুড়ঙ্গটা নিরাপদ কিনা পরীক্ষা করে দেখছেন তিনি।'

'নিরাপদ বলে মনে করলে তবে বুঝি আমাদেরকে খবর দেবেন!'

শহীদ বলল, 'খবর দেবার আর দরকার নেই। আমরা নিজেরাই নামব ওই সুড়ঙ্গে।'

স্পেসক্রাফটের কাছে ফিরে এসে ওরা দেখল মহুয়া সেই একই জায়গায় পাথরের মূর্তির মত ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। কামাল পায়চারি করছে অধীর উত্তেজনা দমন করতে না পেরে। এবং স্যানন ডি. কস্টা একটা কোদাল দিয়ে মাটি কাটছে।

ইতিমধ্যেই একটা বড়সড় গর্ত করে ফেলেছে সে। গর্তের চারধারে মাটির পাহাড় জমে গেছে। ডি. কস্টা গর্তের ভিতর দাঁড়িয়ে বিরামহীন, বিশ্রামহীন মাটি কেটে চলেছে তখনও।

আগুনের আঁচ লাগছে গায়ে। উড়ে আসছে ছোট ছোট কালো রঙের ছাই-ভস্ম বাতাসের সাথে। মহুয়ার শাড়ি প্রায় কালো হয়ে গেছে ছাই লেগে। কামালের কাপড় চোপড়েরও একই অবস্থা।

ওদেরকে ঘিরে চতুর্দিকে ছুটোছুটি করছে বুনো পশুরা, দিশেহারা ভাবটা আরও বেড়েছে, অবলা পশুদের কাতর ধ্বনিতে আকাশ বাতাস কাঁপছে সারাক্ষণ।

'মি. ডি. কস্টা, কি হচ্ছে শুনি?'

ঘামে ভেজা মুখ তুলে তাকাল ডি. কস্টা, তারপর গর্তের ভিতরই সিধে হয়ে দাঁড়াল।

'বিপডে পড়িলে মানুষ মানুষকে চিনিটে পারে। হাপনারা যে ভীটুর ডিম টা জানিটাম না। মাই গড, হোপ ছাড়িয়া ডিয়া ওয়ান অ্যাণ্ড অল বসিয়া আছেন। দিস ইজ টু ব্যাড। ডেকুন হামাকে ডেকুন। ডেকিয়া অন্টট শিক্ষা লাভ করা উচিট। হামাকে ফলো করিলেও বাঁচিটে পারিবেন। আসুন, মি. শহীড, হামার সাঠে মাটি কাটিয়ে একটা সুড়ঙ্গ টৈরি করুন···।'

হেসে ফেলল শহীদ। কি যেন বলতে যাচ্ছিল ও, কামাল এগিয়ে এসে ওর একটা হাত চেপে ধরল শক্ত করে, 'শহীদ! তুই হাসছিস!'

'হাতটা ছেড়ে দে। ভেঙে ফেলবি নাকি!'

লজ্জা পেয়ে ছেড়ে দিল কামাল হাতটা।

শহীদ বলল, 'উত্তেজিত হোসনে। রাস্তা একটা পেয়েছি।'

'হোয়াট!'

শহীদের কথাটা শুনেই গর্ত থেকে ক্যাঙ্গারুর মত লাফ দিয়ে উঠে এল ডি. কস্টা।

বলল, 'শেম! শেম! গাধার মত পরিশ্রম করিলাম ফর নো বেনিফিট? এই ডেকুন, ডুটো হাটেই ফোসকা পড়িয়া গিয়াছে।'

ঠিকই। ডি. কস্টার দুই হাতেরই চামড়া ফুলে উঠেছে পানি নিয়ে।

মহুয়া হঠাৎ বলে উঠল, 'শহীদ, তুমি ঠাট্টা করছ না তো!'

শহীদ হাসল, 'ঠাট্টা করার সময় এটা নয়, মহুয়া। চলো সবাই। আর দেরি করা উচিত না।'

'মি. সিম্পসন কোথায়?' জিজ্ঞেস করল মহুয়া।

কামাল বলে উঠল, 'আরে তাইত। মি. সিম্পসন কোথায়?'

শহীদ বলল তিনি সুড়ঙ্গে নেমে গেছেন। হয়তো সুড়ঙ্গটা নিরাপদ কিনা পরীক্ষা করে দেখছেন।

'হয়তো! হয়তো মানে কি, শহীদ।'

'একটু পরেই জানতে পারবি, কামাল।'

জিনিসপত্র কাঁধে তুলে নিয়ে দ্রুত রওনা হলো ওরা সেই অশথ গাছটার দিকে।

ছয়

লোহার সিঁড়িটা নেমে গেছে নিচের দিকে। সবার আগে নামল শহীদ। টর্চের আলোয় জায়গাটা দেখে নিল ও। এঁকেবেঁকে চলে গেছে একটা সুড়ঙ্গ পশ্চিম দিকে। সুড়ঙ্গের দুই দিকের দেয়াল পাথরের। মাথার উপর সিলিং এবং মেঝেটাও তাই। ফাঁকা, নির্জন সুড়ঙ্গ।

'নেমে এসো সবাই।'

কথাটা বলে শহীদ সুড়ঙ্গের দেয়ালে টর্চের আলো ফেলল। ছোট্ট একটা সুইচ বোর্ড দেখা যাচ্ছে। তাতে দুটো সুইচ। কিন্তু সেদিকে হাত বাড়াল না শহীদ।

মহুয়া এবং ওমেনা নেমে এল নিচে। তারপর ডি. কস্টা। সবশেষে কামাল।

'গোপন ডরজাটা বন্ধ করিয়া ডিন। টা না হইলে ব্যাটা আগুন নাক গলাইবে।' ডি. কস্টা বলে উঠল।

খিলখিল করে হেসে উঠল মহুয়া তার কথা শুনে। নিরাপদ আশ্রয়ে এসে স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে সে। অবশ্য, সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে মাঝে-মধ্যেই তাকাচ্ছে সে রাজকুমারী ওমেনার দিকে। সাথে সাথে দুশ্চিন্তার রেখা ফুটে উঠছে তার কপালে।

শহীদ ফিসফিস করে কথা বলছে কামালের সাথে।

'আলো জ্বালা যায়। ইলেকট্রিসিটি আছে। কিন্তু আলো জ্বালতে চাই না আমি। আমি চাই তোরা আমার বেশ খানিকটা পিছনে থাক। আগে আগে আমি যাব।'

'কিন্তু…।'

শহীদ বলল, 'সামনে বিপদ থাকার কথাটা ভাবা দরকার, কামাল। সবাই একসাথে এগোলে শত্রুরা শব্দ পেয়ে সাবধান হয়ে যাবে। আমি তা চাই না?'

'তুই বলতে চাইছিস সুড়ঙ্গের সামনের দিকে শত্রুরা আমাদের জন্য ওত পেতে আছে?'

'ঠিক তা বলতে চাই না। তবে সন্দেহটা আমার সেই রকমই।'

'মি. সিম্পসন…?'

শহীদ বলল, 'তিনি হয়তো শত্রুদের হাতে ধরা পড়েছেন।'

কামাল বলল, 'হুঁ। একটা কথা, শহীদ। তুই কিন্তু একটা কথা আমার কাছ থেকে লুকোচ্ছিস।'

'কি কথা?'

'আমাদের মধ্যেই একজন বেঈমান আছে। তুই জানিস সে কে। কিন্তু তার নাম চেপে রেখেছিস। কেন?'

শহীদ বলল, 'অমি যাচ্ছি। তোরা দশমিনিট পর রওনা হবি। তোর প্রশ্নের উত্তরে শুধু একটা কথাই বলবার আছে আমার, কামাল। তা হলো, বেঈমান আমাদের মধ্যে যে-ই হোক, তার নাম বলার সময় এখনও আসেনি। সময় হোক, নিজের চোখেই সব দেখবি।'

রিভলভার এবং টর্চ নিয়ে সুড়ঙ্গ ধরে হাঁটতে শুরু করল শহীদ। কামাল তার গমনপথের দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

'মি. কামাল, ডেরি করিটেছি ফর হোয়াট? বডি অ্যাণ্ড মাইণ্ডের উপর ডিয়া বড্ডই টরচার গিয়াছে। চলুন, ডেকা যাক, সামনে ভাল খানাপিনা এবং সফট বিছানার ব্যাবস্টা পাওয়া যায় কিনা!'

কামাল খেঁকিয়ে উঠল, 'থামুন! এতক্ষণ এই আশ্রয় না পেলে পুড়ে কয়লা হয়ে যেতেন, সে কথা মনে নেই বুঝি? কথায় বলে, বসতে পেলে শুতে চায়—আপনার হয়েছে সেই দশা।'

'ফর নাথিং। হাপনি চটিয়া উঠিটেছেন, মি. কামাল। হামি ইংরাজের, আই মীন, রাজার জাট। হাপনারা টো বিপডের সময় হোপলেস হইয়া পড়িয়া চুপচাপ দাঁড়াইয়া ছিলেন। বাট হামি কট্টো কাজ করিলাম। হামি যডি এখন একটু ভাল খানাপিনা আর নরম একটা বিছানা পাইটে চাই টাহা কি হামার ইললিগ্যাল ডিমাণ্ড বলিয়া হাপনি মনে করিটে পারেন?'

'চুপ করুন!' বিরক্তির সাথে বলে উঠল কামাল। কান পেতে কিছু শোনা যায় কিনা দেখছে সে।

'ইটস নট ফেয়ার,' বিড় বিড় করে বলল ডি. কস্টা।

'কামাল, কি শোনার চেষ্টা করছ বলো তো তুমি?'

মহুয়া কামালের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। হঠাৎ সে প্রশ্নটা করে।

টর্চটা কামালের হাতে। সুড়ঙ্গের যতদূর সম্ভব টর্চের আলো ফেলে সেদিকে তাকিয়ে আছে কামাল। প্রশ্নের উত্তর দেয়ার জন্য ঘাড় ফিরিয়ে পাশে দাঁড়ানো মহুয়ার দিকে তাকাল সে।

উত্তর দেয়া হলো না কামালের। সুড়ঙ্গের ভিতর থেকে ভেসে এল রিভলভারের

শব্দ। ঠাস ঠাস করে পর পর দুটো গুলির শব্দ হলো!

মাই গড! ডাকাটের ডল আসিটেছে মনে হয়!

মহুয়া কামালের একটা হাত চেপে ধরল, 'কামাল!'

ওমেনা দম বন্ধ করে বলে উঠল, 'এখানে দাঁড়িয়ে থাকার আর কোন মানে হয় না। মি. শহীদ হয়তো···।'

অমঙ্গল আশঙ্কাটা পুরোপুরি উচ্চারণ না করলেও কারও বুঝতে বাকি রইল না কি বলতে চায় সে।

কামাল বলল, 'হ্যাঁ। আর দেরি করার মানে হয় না। আমার পিছু পিছু এসো সবাই। খুব সাবধান! কেউ কথা বোলো না। পা টিপে টিপে হাঁটো সবাই, যেন শব্দ না হয়।'

'ইয়েস'। ডম বণ্ড করিবার ডরকার নাই। টবে জোরে নিঃশ্বাস ফেলাটা উচিট হইবে না।'

নিঃশব্দে এগোল ওরা।

এঁকেবেঁকে এগিয়ে গেছে সুড়ঙ্গটা। পা টিপে টিপে এগিয়ে চলেছে শহীদ। সামনে পিছে আলকাতরার মত কালো অন্ধকার। নিজের শরীরও দেখা যায় না। খানিকটা কবে এগোয় শহীদ, একবার করে থামে। তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে ওর শ্রবণেন্দ্রিয়। কোথাও কোন শব্দ নেই। তবু সন্দেহ ঘোচে না মন থেকে। দাঁড়িয়েই থাকে ও।

একসময় একবার এগোতে শুরু করে শহীদ। টর্চটা ওর হাতেই ধরা। কিন্তু সেটা ভুলেও জ্বালে না। ডান হাতে শক্ত করে ধরা লোডেড রিভলভারটা। যে-কোন মুহূর্তে ব্যবহার করার জন্য তৈরি হয়েই আছে ও। ওর মন বলছে, অচিরেই রিভলভারটা ব্যবহার করার দরকার পড়বে।

ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে। অক্সিজেনের পরিমাণ কম সুড়ঙ্গের ভিতর। সারা শরীর ভিজে গেছে ঘামে। বেরুবার পথ নিশ্চয়ই আছে ভাবল ও। কিন্তু পথটা বন্ধ কিনা কে জানে।

এগোতে এগোতে অনেক কথা ভিড় করে আসছে মনে। কুয়াশা কি সত্যি প্রফেসরের ফাঁদে আটকা পড়েছে? কিন্তু সব চিন্তাকে মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিচ্ছে শহীদ নির্মমভাবে। চিন্তা করার অনেক সময় পাওয়া যাবে। এখন চিন্তা করবার সময় নয়। এখন সমস্যা সমাধানের, সমস্যার জড় উপড়ে ফেলার সময়।

কপালের ঘাম মুছে নিল শহীদ হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে। সরিয়ে দিল চুলগুলো কপাল থেকে। সামনের অন্ধকারে একটা হাত বাড়িয়ে দিয়ে হাঁটতে শুরু করল আবার।

দু'পা এগোতেই হাতে ঠেকল দেয়াল। সর্বনাশ! এ যে শক্ত কাঠের প্রকাণ্ড দরজা!

দরজাটার গায়ে হাত বুলিয়ে পরীক্ষা করে নিরাশ হলো শহীদ। এদিক থেকে দরজা খোলা বা বন্ধ করার কোন ব্যবস্থা নেই। দেয়ালে কোন ইলেকট্রিক সুইচ

আছে কিনা দেখার জন্য হাত বাড়াতেই বাঁ দিকটা ফাঁকা ঠেকল। হাত দিয়ে অন্ধের মত হাতড়াতে লাগল ও। আরও একটা দরজা, বোঝা যাচ্ছে। ভরে উঠল বুক আশায়। এ দরজাটা খোলা।

হঠাৎ শক্ত হয়ে গেল শহীদের সর্বশরীর। একটা পদধ্বনি এগিয়ে আসছে। এগিয়ে আসছে খোলা দরজাটার ভিতর দিক থেকে।

নিশ্চল গাছের মত অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইল শহীদ। এগিয়ে আসছে দ্রুত পদশব্দ। যেই হোক লোকটা, ভয়ানক ব্যস্ত সে, কিংবা ভয় পেয়েছে কোন কারণে।

পদশব্দ একেবারে কাছে এসে পড়েছে।

শহীদ প্রশ্ন করল, 'মি. সিম্পসন?'

কোন জবাব এল না।

পরমুহূর্তে গর্জে উঠল একটা রিভলভার। পরপর দু'বার বারুদের গন্ধ এবং ধোঁয়ায় ভরে উঠল জায়গাটা।

সাত

কামাল হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। ফিসফিস করে বলল সে, 'মি. ডি. কস্টা, ভাল হবে না বলে দিচ্ছি। বিড় বিড় করে কথা বলছেন কেন শুনি?'

'কে? তোরা এসেছিস?'

শহীদের গলা শোনা গেল। জ্বলে উঠল কামালের হাতের টর্চ।

আঁতকে উঠল ওরা সবাই।

শহীদ দাঁড়িয়ে আছে। একা। ওর সামনে এবং ডান দিকে দুটো দরজা। ডান দিকেরটা বন্ধ। বাঁ দিকের দরজার চৌকাঠের উপর রক্তাক্ত একটা লাশ পড়ে আছে।

'শহীদ!' কামাল চেঁচিয়ে উঠল।

'মাই গড! হামি স্বপ্ন ডেকিটেছি! হামার জাট ভাই মি. সিম্পসন মার্ডার হইয়াছেন—মাই গড! হু,—কে, কে টাহাকে হট্টা করিয়াছে, মি. শহীড! জাট ভাইয়ের ব্লাড বৃঠা যাইটে ডিবো না, হামি বডলা লইব।'

ডি. কস্টার দু'চোখে পানি জমে উঠল।

শহীদ কামালের দিকে তাকাল, 'তোর প্রশ্নের উত্তর পেয়েছিস এবার, আশা করি?'

'কিন্তু, শহীদ···মি. সিম্পসন বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন আমাদের সাথে—না! অসম্ভব।'

মহুয়াও প্রবলভাবে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, 'হতেই পারে না! মি. সিম্পসন—অসম্ভব! শহীদ, তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি? এ কি কাণ্ড করেছ!'

শহীদ হেসে উঠল। বলল, 'মাথা আমার ঠিকই আছে, মহুয়া। তবে তোমাদের ধারণাও সেন্ট পারসেন্ট ঠিক। মি. সিম্পসন বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারেন না আমাদের সাথে। তিনি তা করেনওনি। আমি কি বলতে চাইছি বুঝতে পারছিস,

কামাল?'

'বলতে চাইছিস···বলতে চাইছিস, মি. সিম্পসন বিশ্বাসঘাতকতা করেননি···তারমানে···তারমানে, বুঝেছি! শহীদ, তোর কথা বুঝে ফেলেছি আমি।' চেঁচিয়ে উঠল কামাল।

'কি বুঝেছিস।'

কামাল বলে উঠল, 'তুই বলতে চাইছিস, যে লোককে আমরা দেখছি সে মি. সিম্পসনের মত দেখতে হলেও আসলে তা নয়!'

'হ্যাঁ। মি. সিম্পসনের ছদ্মবেশে এ অন্য লোক।'

'অন্য লোক! কি বলছ তুমি।'

মহুয়ার গলায় বিস্ময়।

শহীদ বলল, 'ছদ্মবেশটা সত্যি খুব নিখুঁত হয়েছিল। বুঝতে পারছ না, কুয়াশা পর্যন্ত সন্দেহ করতে পারেনি?'

'অন্য লোক বুঝলাম। কিন্তু কে? এর পরিচয় কি? আর, মি. সিম্পসন—তিনি কোথায়?'

শহীদ একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, 'ওরে বাপস্! এক সাথে এতগুলো প্রশ্ন! দাঁড়া একটা একটা করে উত্তর দেবার চেষ্টা করি।'

সবাই সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে আছে শহীদের দিকে। বন্ধ দরজার দিকে একবার তাকাল শহীদ। বলল, 'এখানে দাঁড়িয়ে থাকা উচিত হচ্ছে না। খোলা দরজাটা দিয়ে একটু ভিতরে যাই চল। বসে বসে সব কথা বলা যাবে।'

লাশটা টপকে ভিতরে ঢুকল ডি. কস্টা, কামাল।

'আমি লাশ টপকাব না।'

দেয়ালের দিকে চোখ রেখে প্রতিবাদ করল মহুয়া। শহীদ লাশটা ধরে সরিয়ে দিল এক পাশে। বলল, 'হয়েছে এবার?'

সুড়ঙ্গ ধরে সবাই খানিকটা এগিয়ে গিয়ে বসল দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে।

'মি. সিম্পসনকে প্রফেসর ওয়াই গ্রীনল্যাণ্ডে পাঠিয়ে দিয়েছিল তার ম্যাটার ট্র্যান্সমিট করার মেশিনের মাধ্যমে, একথা আমরা সবাই জানি।'

'জানি।'

শহীদ বলল, 'শুধু মি. সিম্পসনকে কেন, আমাদের সবাইকে পৃথিবী এবং পৃথিবীর বাইরে বিচ্ছিন্নভাবে পাঠিয়ে দিয়েছিল সে। পৃথিবীর বাইরে পাঠিয়েছিল কুয়াশাকে। প্রফেসর ভেবেছিল কুয়াশা পৃথিবীতে ফেরত আসতে পারবে না আর কোন দিন। কিন্তু কুয়াশা টুইন আর্থ থেকে বহাল তবিয়তে ফিরে আসল এবং প্রফেসর ওয়াইয়ের ঢাকার কন্ট্রোলরুম বোমা মেরে ধ্বংস করে দিল।'

'এসব কথা তুই নতুন করে বলছিস কেন? সবই তো আমাদের জানা।'

'সব কথা না বললে তোর প্রশ্নের উত্তর ঠিক দেয়া সম্ভব নয়। শোন্, যা বলছিলাম। বোমা মেরে কন্ট্রোলরুম কুয়াশা ঠিকই ধ্বংস করে দেয়, কিন্তু প্রফেসর ওয়াই বা তার সহকারীরা ঠিকই বেঁচে যায়। প্রফেসর ওয়াই বোমার হাত থেকে

বেঁচে যাবার পর কুয়াশাকে কাবু করার জন্যে উঠে পড়ে লাগে। কুয়াশার স্বভাব ও প্রকৃতি সম্পর্কে ভাল ধারণা আছে তার। সে বুঝতে পারে এরপর কুয়াশা আমাদেরকে উদ্ধার করার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়বে। প্রফেসর ওয়াই মাথা খাটিয়ে সাথে সাথে একটা বুদ্ধি বের করে। কুয়াশা মি. সিম্পসনকে উদ্ধার করার জন্যে গ্রীনল্যাণ্ডে যাবে তা সে বুঝতে পারে। কিন্তু কুয়াশা গ্রীনল্যাণ্ডে পৌঁছবার আগেই সে মি. সিম্পসনের ছদ্মবেশে একজন সহকারীকে সেখানে পাঠায়। এবং তার সাথে স্বয়ং নিজেও গ্রীনল্যাণ্ডে গিয়ে উপস্থিত হয়।'

'নিশ্চয়ই সে তার ম্যাটার ট্র্যান্সমিট করার মেশিন ব্যবহার করে?'

শহীদ বলল, 'তা তো নিশ্চয়ই। মি. সিম্পসনের ছদ্মবেশধারী সহকারীকে গ্রীনল্যাণ্ডে রেখে প্রফেসর ওয়াই আমাদের প্রকৃত মি. সিম্পসনকে বন্দী করে নিয়ে আসে। আমার বিশ্বাস, মি. সিম্পসন এই বনভূমিতেই প্রফেসরের হাতে বন্দী হয়ে আছেন। এবং সেজন্যেই কুয়াশা তার ইণ্ডিকেটার যন্ত্র দেখে বুঝতে পারে তার পরিচিত জনের মধ্যে কেউ এখানে আছে। এক ঢিলে দুই পাখি মেরেছে প্রফেসর ওয়াই। আমাদের দলে নিজের লোককে তো সে ঢুকিয়ে দিয়েই ছিল, মি. সিম্পসনকে বন্দী করে কুয়াশার জন্যে পেতেছে সে মস্ত একটা ফাঁদ।'

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে মহুয়া জানতে চাইল, 'দাদা তাহলে সত্যি খুব বিপদে আছে?'

শহীদ বলল, 'বিপদে সে নিশ্চয়ই পড়েছে। তবে চিন্তার কিছু নেই। বিপদের মোকাবিলা করার মত বুদ্ধি বা শক্তি, কোনটারই অভাব নেই তার। কিন্তু আমাদের উচিত তার খোঁজ খবর সংগ্রহ করা।'

কামাল বলল, 'এই সুড়ঙ্গ থেকে বেরুবার উপায় কি?'

শহীদ বলল, 'উপায় একটা বের করতেই হবে। সুড়ঙ্গের এদিকটা ক্রমশ ঢালু হয়ে গেছে, লক্ষ্য করেছিস?'

'করেছি।'

'এই পথ ধরে গিয়েছিলাম আমি। বেরুবার কোন উপায় নেই। নদীর সাথে গিয়ে মিশেছে সুড়ঙ্গটা।'

'তাহলে উপায়?' শহীদ উত্তর না দিয়ে ভুরু কুঁচকে তাকাল এদিক ওদিক।

'নাক ডাকছে কার? কেউ ঘুমিয়ে পড়েছে নাকি?'

চাপা কণ্ঠে হেসে উঠল মহুয়া। বলল, 'হ্যাঁ। মি. ডি. কস্টা। আমার পাশে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।'

শহীদ বলল, 'কামাল, উপায় একটাই, বুঝলি? গ্রেনেডগুলো আনতে ভুলিসনি তো?'

'ভুলিনি।'

শহীদ বলল, 'দে একটা। গ্রেনেড মেরে ভেঙে ফেলতে হবে বন্ধ দরজাটা। ধাক্কা দিয়ে বা আর কিছু করে কোন লাভ নেই। উড়িয়ে দিতে হবে গ্রেনেড মেরে।'

কামাল জানতে চাইল, 'দরজার ওপাশেও কি আবার সুড়ঙ্গ আছে বলে মনে করিস?'

'সম্ভবত আছে।'

'কিন্তু এই সুড়ঙ্গের শেষ কোথায়?'

শহীদ হাসল, 'শেষ কোথাও না কোথাও নিশ্চয়ই আছে। ব্যস্ত হচ্ছিস কেন, ধৈর্য ধর।'

ভোরবেলা সুড়ঙ্গ থেকে বেরুবার পথ পেয়ে গেল ওরা। সুড়ঙ্গটা যেখানে শেষ সেখানে একটা লোহার সিঁড়ি। দেয়ালের গায়ে একটা সুইচ বোর্ডও দেখা গেল। সাদা সুইচটা আঙুল দিয়ে চেপে ধরতেই কাঠের পাটাতন ঝুলে পড়ল। উপরে দেখা গেল গাছের ডালপালা, ম্লান আকাশ।

সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে দেখল একটা গাছের উপর দাঁড়িয়ে আছে সবাই ওরা। গাছের উপর থেকেই দেখা যাচ্ছে নদীটাকে। চারদিকে কেউ কোথাও নেই। ঠাণ্ডা শীতল বাতাসে গা জুড়িয়ে গেল ওদের।

গাছের উপর থেকে নেমে পড়ল সবাই। ওমেনা কারও সাহায্য নিল না, বরং সাহায্য করল মহুয়াকে নামতে। নদীর তীরে গিয়ে দাঁড়াল ওরা।

'হোয়াট অ্যাবাউট ব্রেকফাস্ট?' জিজ্ঞেস করল ডি. কস্টা।

কামাল বলল, 'চারদিকটা একবার ভাল করে দেখে আসা দরকার। জংলীদের গ্রাম কাছেপিঠে থাকা বিচিত্র নয়। সেক্ষেত্রে ওদের পেটেই চালান হয়ে যাব সবাই ব্রেকফাস্ট হয়ে।'

দাঁত বের করে আপন মনে হাসতে শুরু করল ডি. কস্টা।

'হাসছেন যে বড়?'

ডি. কস্টা বলল, 'হাসিটেছি নাকি? হইটে পারে, একটা কঠা মনে পড়িয়া গেল, টাই।'

'কি কথা আবার মনে পড়ে গেল?'

'গটবার যখন আফ্রিকার এই জঙ্গলে অ্যাডভেঞ্চারে আসিয়াছিলাম, জংলী লেডিসরা হামাকে ডেকিয়া ওয়ান অ্যাণ্ড অল হামার প্রেমে পড়িয়া হাবুডুবু খাইটে লাগিল।'

মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসি লুকিয়ে মহুয়া বলল, 'তারপর?'

'টারপর আর কি করিব বলুন! ওদের টেরোজন, না, সটের জন, ঠিক মনে করিটে পারিটেছি না। বিবাহ করিয়া ফেলিলাম···।'

'কামাল, এখানে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকা কিন্তু উচিত হচ্ছে না।' শহীদ বলে উঠল।

কামাল নদীর দিকে তাকিয়েছিল। বেশ স্রোত নদীর পানিতে। দু'ধারেই গভীর জঙ্গল। হঠাৎ কয়েকটা ভেলার দিকে চোখ পড়ল ওর। নদীর তীর ঘেঁষে ভাসছে, ঢেউয়ের তালে তালে মৃদু দুলছে ভেলাগুলো।

'শহীদ!'

শহীদ বলল, 'দেখেছি। ভেলাগুলোই প্রমাণ দিচ্ছে আশেপাশে জংলীদের গ্রাম

আছে।'

'এখন কি করতে চাস তুই? কুয়াশার সন্ধানে যাবি?'

শহীদ বলল, 'তাই যাওয়া উচিত আমাদের। কিন্তু প্রশ্ন হলো, কুয়াশা কোথায় আছে সে সম্পর্কে কতটুকু ধারণা করতে পারি আমরা?'

কামাল বলল, 'কেন, কুয়াশা পশ্চিম দিকে গেছে আমরাও পশ্চিম দিকে এসেছি।'

'প্রশ্ন হলো, কুয়াশা কতটা দূরত্ব অতিক্রম করেছে। আর আমরা কতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করেছি? আমরা আরও পশ্চিমে যাব, না, পিছু হটব, অর্থাৎ পূবে যাব আবার?'

'সমস্যাই বটে।'

শহীদ বলল, 'আমার যতদূর ধারণা, কুয়াশার চেয়ে বেশি দূরত্ব অতিক্রম করে ফেলেছি আমরা। সুড়ঙ্গটা মোটেই ছোট নয়, মাইল তিনেক তো লম্বায় হবেই।'

কামাল বলে উঠল, 'যাই বলিস শহীদ। এইরকম একটা সুড়ঙ্গ আফ্রিকার জঙ্গলে ভাবাই যায় না। কাদের কীর্তি বল তো এটা?'

শহীদ বলল, 'বলেছি তো একবার, আরও অনেক মজার জিনিস দেখতে পাবি। রহস্যপুরীর কাছাকাছিও তো আসিনি এখনও।'

কামাল বলল, 'রহস্যপুরী সম্ভবত এখান থেকে খুব বেশি দূরেও নয়। বড়জোর মাইল দশেক হবে।'

শহীদ বলল, 'ভেলায় চড়ে আমরা বরং পুব দিকেই এগোই, বুঝলি?'

কামাল বলল, 'তাই চল।'

ব্যাগ-ব্যাগেজ নিয়ে ভেলায় চড়ল ওরা। বৈঠা নেই, বৈঠার কাজ হাত দিয়ে সারতে হচ্ছে।

গান জুড়ে দিয়েছে ডি. কস্টা। পা দুটো ঝুলিয়ে দিয়েছে সে পানিতে। কামাল আর ডি. কস্টা একটা ভেলায় চেপেছে। মহুয়া আর ওমেনা একটায়। শহীদ একটা ভেলায় একা। সকলের পিছনে ওর ভেলাটা। মহুয়াদেরটা মাঝখানে।

'চিকা বুম চিকা বুম
বুম বুম চিকা
দিস ইজ আফ্রিকা॥'

ঘনঘন মাথা দোলাতে দোলাতে গাইছে ডি. কস্টা।'

'এই যে, রাজার জাত, অত জোরে গান গাইবেন না। জংলীরা ভাববে ফাঁদে শিয়াল পড়ে চেঁচাচ্ছে হেঁড়ে গলায়, এক্ষুণি ছুটে আসবে তীর ধনুক নিয়ে।'

বিদ্যুৎ বেগে ঘাড় ফিরিয়ে কামালের দিকে তাকাল ডি. কস্টা। চমকে উঠল কামাল। ডি. কস্টার চোখ দুটো আতঙ্কে বিস্ফারিত হয়ে গেছে। থর থর করে কাঁপছে।

'কি হলো?'

কি যেন বলার চেষ্টা করছে ডি. কস্টা। কিন্তু গলা দিয়ে শব্দ বের হচ্ছে না তার। অনেক কষ্টে সে উচ্চারণ করল, 'মি. কামাল! মাই লেগ···মাই লেগ···মাই

লেগ…!'

ঝুপ্ করে ভেলা থেকে পানিতে পড়ে গেল ডি. কস্টা।

পরমুহূর্তে গর্জে উঠল শহীদের হাতের রিভলভার। পরপর দু'বার গুলি করল শহীদ।

কিন্তু ডি. কস্টাকে দেখা যাচ্ছে না কোথাও। ভেলা থেকে পড়েই পানির নিচে ডুবে গেছে সে। কামাল কিছু বুঝে ওঠার আগেই দেখল, শহীদ ডাইভ দিয়ে পড়ল পানিতে।

দ্রুত সাঁতার কেটে এগিয়ে আসছে শহীদ।

'কুমীর! আমি দেখেছি!'

মহুয়া চিৎকার করে বলছে কথাটা ওমেনাকে, 'মি. ডি. কস্টার পা কামড়ে ধরে পানিতে নামিয়ে নিয়ে চলে গেল!'

শহীদকেও আর দেখা যাচ্ছে না। ডুব দিয়েছে সে।

ঠিক ভেলার কাছেই ভেসে উঠল ডি. কস্টা।

'মি. কামাল! জলডি! হেলপ মি ফর গডস সেক!'

দুহাত দিয়ে ধরে ডি. কস্টাকে ভেলার উপর তুলল কামাল।

'মি. কামাল! প্লীজ মিঠ্যা কঠা বলিবেন না! ডেকুন টো, হামার ডুইটা পা-ই আছে কিনা?'

চোখ বন্ধ করে কাঁপছে ডি. কস্টা।

কামাল বলল, 'সবই তো ঠিক আছে। ডান পায়ে অবশ্য দাঁতের দাগ দেখা যাচ্ছে। ও কিছু না, টিংচার আইডিন লাগালেই ঠিক হয়ে যাবে।'

'ডাঁটের ডাগ আছে কিনা জানিটে চাহি নাই। জানিটে চাহিটেছি ডুইটা লেগই হামার আছে কিনা!'

কামাল হেসে ফেলল, 'চোখ মেলে দেখলেই তো পারেন।'

মহুয়া চিৎকার করে উঠল, 'কামাল, পানি অমন লাল হয়ে উঠেছে কেন? শহীদ…কোথায় সে?…এখনও উঠছে না কেন?'

ডি. কস্টা চোখ মেলে নিজের পা দুটো দেখে আশ্বস্ত হলো। বলে উঠল, 'হামি বলিয়া কুমীরের কবল হইটে নিজেকে ছিনাইয়া আনিয়াছি। মি. শহীদ কি টা পারিবেন? আই ডাউড ইট।'

শহীদ ভেসে উঠল এমন সময়।

'গুড।'

ডি. কস্টা হাততালি দিয়ে বলে উঠল। ধমকে উঠল শহীদ, 'কেমন আক্কেল আপনার শুনি? এই নদীতে শয়ে শয়ে কুমীর আছে। আপনি কি মনে করে পা দুটো ডুবিয়ে রেখেছিলেন পানিতে? গুলি করে যদি কুমীরটার মাথা ফুটো করে দিতে না পারতাম তাহলে তো যেতেন খতম হয়ে।'

'টাই নাকি! কুমীরটাকে গুলি করিয়াছিলেন হাপনি! বাট, হামি কিছু জানিটেই পারি নাই.—জেসাস!'

মহুয়া বলে উঠল, 'তুমি আবার সাঁতার কাটছ কেন? উঠে পড়ো ভেলায়।'

শহীদ হাসল। বলল, 'একটা ওষুধ ছিটিয়ে দিয়ে তারপর পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম। কুয়াশা দিয়েছিল আমাকে। কুমীর ধারে কাছে ঘেঁষে না, যদি···।'

মুখের কথা বন্ধ হয়ে গেল শহীদের।

নদীর দুই তীর থেকে অসংখ্য ভেলায় চড়ে প্রায় শ'তিনেক জংলী এগিয়ে আসছে ওদের দিকে।

নদীর পানিতে গাছপালার ডাল নুয়ে পড়ায় তীর দেখা যায় না। শাখা প্রশাখা এবং পাতাগুলো একটা আড়াল সৃষ্টি করে রেখেছে। সেই আড়ালে লুকিয়ে ছিল জংলীরা ওদের অপেক্ষাতেই।

কামাল রিভলভার তুলে জংলীদের দিকে তাক করতেই চিৎকার করে উঠল শহীদ।

'কামাল! গুলি করিস না!'

পরমুহূর্তে জংলীদের দিক থেকে গর্জে উঠল একটা রাইফেল। কামালের মাথার উপর দিয়ে ছুটে গেল একটা বুলেট।

'ওরা বন্দী করবে, শহীদ! ওদের হাতে একবার বন্দী হলে···।'

'জানি, বাঁচার আশা করা বৃথা। কিন্তু বন্দী হলে আরও কিছুক্ষণ তবু হয়তো বাঁচব। কিন্তু ওদেরকে বাধা দিলে যে এখুনি মরতে হবে। তারচেয়ে বন্দী হওয়া ভাল না?'

চারদিক থেকে শত শত জংলী ঘিরে ফেলেছে ওদেরকে।

শহীদ বলে উঠল, 'ভেলা তিনটে দেখেই তখন কেমন যেন খটকা লেগেছিল আমার। কিন্তু পরিষ্কার বুঝতে পারিনি। এটা একটা ফাঁদ।'

ডি. কস্টা জানতে চাইল, 'মি. কামাল, সত্যিই কি এই জংলীরা হামাদেরকে ব্রেকফাস্ট করিবে?'

আট

আড়াল থেকে শুনলে সন্দেহ হবে একদল জংলীর গায়ে আগুন ধরে গেছে কিংবা দলের ভিতর এক পাল নেকড়ে হামলা চালিয়েছে। চারদিকের আকাশ বাতাস সচকিত হয়ে উঠেছে তাদের একটানা অবিরাম বিকট চিৎকার। উন্মত্ত আবেগে তারা ঘন ঘন মাথা দোলাচ্ছে। দিক-বিদিকে হাত ছুঁড়ছে পা ছুঁড়ছে।

দলটার মাঝখানে একটা খাটিয়া। খাটিয়াটা বয়ে নিয়ে যাচ্ছে চার পাঁচজন অসভ্য। খাটিয়ার উপর কালো আলখাল্লা পরা প্রকাণ্ড একটা দীর্ঘ মানুষের দেহ।

জ্ঞান ফেরেনি এখনও কুয়াশার।

জংলীরা নাচতে নাচতে গাইতে গাইতে এগিয়ে চলেছে সামনের দিকে। মশালের আলোয় আশপাশের বনভূমি কেমন যেন রহস্যময় এবং ছমছমে হয়ে উঠেছে।

অসভ্যদের দলটা থামল হঠাৎ। টুং-টুং, টুং-টাং। সবাই চুপ হয়ে কান পেতে শুনছে শব্দটা। টুং-টাং, টুং-টাং। হাতির গলায় বাঁধা ঘণ্টা বাজছে। রাজার হাতি। এসে গেছে রাজার হাতি!

ছুটল সবাই। খানিক দূর গিয়েই তারা দেখতে পেল হাতি দুটোকে। দুই হাতির পিঠে দুই মাহুত। কিন্তু দুই হাতির উপর প্রকাণ্ড হাওদা একটাই।

রাজা এই হাওদায় চড়ে শিকারে যান। হাতি দুটোকে এমন ভাবেই শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে তারা সমানতালে পা ফেলে, থামতে বললে দু'জন একসাথে থামে, বসতে বললে দু'জন একসাথে বসে।

হাতি দুটো প্রায় দুই মানুষ সমান উঁচু। সিঙ্গেল খাটের মত চওড়া এক একটার পিঠ। দুই হাতির দুই পিঠের উপর স্থাপিত হয়েছে কয়েকটা মজবুত পুরু কাঠের তক্তা। তার উপর দাঁড় করানো হয়েছে কাঠের খুঁটি, চারদিকে দেয়াল হিসেবে অনেকগুলো গাছের পাতাকে ব্যবহার করা হয়েছে সুন্দর ভাবে। পাতার উপর পাতা, পাতার পাশে পাতা বসিয়ে পরিশ্রম এবং মেধা খরচা করে জংলী রাজের নির্দেশে শিল্পীরা এই হাওদাটা তৈরি করেছে। বড়সড় এবং মজবুত একটা কামরা বলা চলে।

রাজা তাঁর নিজস্ব এই হাওদা পাঠিয়ে দিয়েছেন বন্দীকে বহন করে নিয়ে যাবার জন্য। রাজার এমন উদ্ভট সিদ্ধান্তের অর্থ কি তা জংলীরা ভেবে দেখে না। রাজার হুকুম শিরোধার্য। রাজা যা করেন ভালর জন্যই করেন।

খাটিয়া নামানো হলো মাটিতে। কুয়াশার অচেতন দেহটাকে ধরাধরি করে হাতি দুটোর কাছে বয়ে নিয়ে গেল জংলীরা। অতি কসরতের সাথে চেষ্টা করার পর হাওদার উপর তোলা সম্ভব হলো দেহটাকে। হাওদার দরজা বন্ধ করে দেয়া হলো বাইরে থেকে। জংলীরা লাফ দিয়ে নেমে পড়ল নিচে।

আবার এগিয়ে চলল সবাই। সবার আগে দুই হাতি। পিছনে উল্লসিত জংলীরা। আবার শুরু হলো নাচ গান।

ভোরের আলো ফুটে উঠল পুবাকাশে খানিকক্ষণের মধ্যেই। পাখ-পাখালির কলগুঞ্জনে মুখরিত হয়ে উঠল বনভূমি।

জংলীদের নাচগান থেমে গেছে ভোরের আলো ফুটে ওঠার পরপরই। নাচগান করে ওরা নানা কারণে। শরীরটাকে গরম রাখার জন্যে, ক্লান্তিকে দূরে সরিয়ে রাখার প্রয়োজনে নাচে ওরা, হিংস্র পশুদেরকে ভয় দেখানোর জন্য বিকট স্বরে চেঁচিয়ে গান গায়।

হাতির পিছু পিছু জংলীরা দ্রুত হাঁটছে। গ্রাম এখান থেকে খুব বেশি দূরে নয়। বড় জোর মাইলখানেক আর।

কিন্তু গ্রামে পৌঁছবার আগেই থামতে হলো ওদেরকে। রাজার এক দেহরক্ষী পনেরো বিশজন জংলীকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওদের জন্যে। কি ব্যাপার! না, রাজা নতুন আদেশ পাঠিয়েছেন। বন্দীকে গ্রামে নিয়ে যাবার কোন দরকার নেই। তাকে এই জঙ্গলেই হত্যা করতে হবে।

হত্যা করতে হবে?

নেচে উঠল অসভ্য জংলীরা! রক্তের নেশায় উন্মাদ হয়ে উঠল সবাই। শুরু হলো আবার নাচ এবং গান। দেহরক্ষীর সাথের অসভ্যরা ঢাক-ঢোল বাজাতে শুরু করল। মোষের শিঙে ঢালা হতে থাকল কড়া মদ, চুঁচু।

দেহরক্ষীর সাথের জংলীরা বন্দীকে হত্যা করার সব ব্যবস্থা সেরে রেখেছে।

জীবন্ত কবর দেয়া হবে বন্দীকে। রহস্যপুরীর পবিত্রতা নষ্ট করার উদ্দেশ্য নিয়ে বন্দী এই জঙ্গলে প্রবেশ করেছিল। দেবতার নির্দেশেই তাকে জীবন্ত কবর দেয়া হবে। রাজার উদ্ভট খেয়াল না এটা। দেবতার নির্দেশ। অলঙ্ঘ্য নির্দেশ।

দেহরক্ষীর নির্দেশে হাতি দুটো বসল। হাওদার দরজা খোলা হলো বাইরে থেকে। দেখা গেল বন্দীর জ্ঞান ফেরেনি এখনও। মুচকি হাসি ফুটল দেহরক্ষীর ঠোঁটে। বন্দী কুয়াশার শরীরে এখনও জড়িয়ে রয়েছে জাল। জ্ঞান ফেরেনি তার, দেখতেই পাচ্ছে সে।

হাওদার ভিতরে প্রবেশ করল দেহরক্ষী। দরজাটা বন্ধ করে দিল ভিতরে ঢুকে। বন্দীর আলাখাল্লার পকেটগুলোয় মূল্যবান অনেক জিনিস আছে। সেগুলো উদ্ধার করা দরকার।

মিনিট পনেরো পর দেহরক্ষী বেরিয়ে এল হাওদা থেকে। হাতির পিঠ থেকে নেমেই সে নির্দেশ দিল, 'হিরি মা, কিরি মা। আগডু বাগডু ডুলাডু? উলুট ভুলুট খুট টট্‌রা।'

অর্থাৎ, 'পরবর্তী কাজে হাত দিতে হয়। শুভ কর্মে দেরি করে লাভ কি? বন্দীকে জীবন্ত কবর দেয়া হোক।'

জংলীরা সোল্লাসে বলে উঠল একযোগে, 'উলুট ভুলুট খুট টট্‌রা।'

গভীর একটা কূপ খনন করা হয়েছে। হাওদা থেকে কালো আলখেল্লা পরিহিত অচেতন দেহটাকে নামানো হলো। ধরাধরি করে জংলীরা দেহটাকে নিয়ে গেল কূপের কাছে।

দেহরক্ষী মন্ত্র আওড়াতে লাগল, 'উলুন চা বুলুন চা—খচা। হিরি তিরি বামবা। নচা উলুন চা বুলুন চা—খচা। হিরি তিরি বামবা···।'

সবশেষে দেহরক্ষী বিকট স্বরে বলে উঠল, 'খচা! খচা! খচা! উলুন চা!'

কূপটা বেশ গভীর। দুই মানুষ গভীর তো হবেই। অচেতন বন্দীকে ফেলে দিল জংলীরা সেই কূপের ভিতর। সাথে সাথে বিশ পঁচিশজন জংলী কূপের চারপাশে স্তূপীকৃত মাটি ফেলে ভরে দিতে শুরু করল কূপটা।

দেখতে দেখতে ভরে গেল কূপটা। কূপের উপর দাঁড়িয়ে নাচতে লাগল জংলীরা।

দেহরক্ষীকে ঘিরে নাচছে আর একদল জংলী। হাস্যোজ্জ্বল মুখে এগিয়ে গেল দেহরক্ষী হাওদার দিকে।

হাওদার ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল দেহরক্ষী। হাতি দুটো মাহুতদ্বয়ের নির্দেশ

পেয়ে উঠে দাঁড়াল এবার।

গ্রামের দিকে ফিরে চলল সবাই। হাতির উপর হাওদায় দেহরক্ষী। হাতির পিছন পিছন নৃত্যরত অসভ্য জংলীদল। সবার পিছনে বাদক দল। উন্মত্তের মত ঢাক-ঢোল পেটাচ্ছে তারা।

—০—

ভলিউম-১৬

কুয়াশা

৪৬, ৪৭, ৪৮

কাজী আনোয়ার হোসেন

কুয়াশা, শহীদ ও কামাল।
দেশে-বিদেশে অন্যায় অবিচারকে দমন করে
সত্য ও সুন্দরের প্রতিষ্ঠা করাই এদের জীবনের ব্রত।
এদের সঙ্গে পাঠকও অজানার পথে
দুঃসাহসিক অভিযানে বেরিয়ে পড়তে পারবেন,
উপভোগ করতে পারবেন
রহস্য, রোমাঞ্চ ও বিপদের স্বাদ।
শুধু ছোটরাই নয়, ছোট-বড় সবাই এ বই পড়ে
প্রচুর আনন্দ লাভ করবেন।
আজই সংগ্রহ করুন।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০